অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর সাহিত্য

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর সাহিত্য

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর সাহিত্য

সম্পাদনা
অশোককুমার মিত্র

শিশু সাহিত্য সংসদ

ATIN BANDYOPADHYAY : KISHOR SAHITYA
(*Selected Works of Atin Bandyopadhyay*)
ed. Ashokekumar Mitra

ISBN : 978-81-7955-153-0

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নটরাজ অফসেট
১, নিরঞ্জন পল্লি, তেঁতুল তলা
কলকাতা-৭০০ ১৩৬

সূচি

উপন্যাস

হানস ও সাদা জাহাজ

টুপুর অরণ্য-অভিযান

আজব দেশে বুমবাই

প্রকাশকের কথা

শিশু সাহিত্য সংসদের বয়স হল তিন কুড়ি। ছড়ায়-পড়ায়, গদ্যে-পদ্যে, জ্ঞানে-মনোরঞ্জনে এতখানি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুনির্মল বসু, সুখলতা রাও সেই থেকে আজও আছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যের সে ভাঁড়ারে আজও জোগান দিচ্ছেন। এ ছাড়া এখন যাঁরা দিয়ে চলেছেন : ছোটোদের জন্য গৌরী ধর্মপাল, শৈলেন ঘোষ ও বলরাম বসাক, ছড়া-কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শঙ্খ ঘোষ, কিশোর সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেবসেন এবং সদ্যপ্রয়াত মতি নন্দী। শিশু সাহিত্য সংসদের হীরকজয়ন্তী উদযাপন এঁদের নিয়েই, যাঁরা দিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই স্ব-নির্বাচিত লেখার সংকলন নিয়ে। জয়ন্তী উদযাপনের এর চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে!

এ প্রসঙ্গে শ্রীঅশোককুমার মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ। তিনিই অক্লান্ত পরিশ্রমে লেখা জোগাড় থেকে সম্মতি সংগ্রহ পর্যন্ত সব কাজ করে সংকলনগুলিকে সম্ভব করে তুলেছেন। তাঁর উৎসাহের তুলনা নেই। সর্বোপরি তাঁর যোগ্য সম্পাদনাতে সংকলনগুলি আশা করি পাঠকদের মনের মতো হয়ে উঠতে পেরেছে।

মতি নন্দী হঠাৎই চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তাঁর লেখার সম্মতিই নয় শুধু, শুভেচ্ছাও রেখে গেছেন। সবার জন্যে।

দেবজ্যোতি দত্ত

কলকাতা

সেপ্টেম্বর ২০১০

সম্পাদকের কথা

ইংরেজিতে ছোটোদের জন্য রংচঙে কত বাহারি বই, বিদেশি ভাষাতেও। বাংলায় তো তেমন একখানি বই-ও নেই। কেন? বাংলায় কি তেমন লেখক নেই, তেমন ছবি-আঁকিয়ে নেই? এমনই ভাবনা জেগেছিল এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর মনে। এতদিন তো জীবন কেটেছে বিদেশি নাগপাশ ছেঁড়ার লড়াইয়ে। সদ্যস্বাধীন দেশে ছোটোদের জন্য আনন্দ আর শিক্ষাদানের বই প্রকাশে উদ্যোগী স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশ করলেন *ছড়ার ছবি*-১। পুরোনো দিনের ছড়ায় ছবি আঁকলেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৯ সালে বেরোল চার রঙে ছাপা ছোটোদের মন-কাড়া বড়ো মাপের সেই বই, যা এতকাল তিনি চেয়ে এসেছিলেন। পরের বছরে বেরোল *ছড়ার ছবি*-২ আর *ছড়া-ছবিতে অ আ ক খ*। আর তখনই ঠিক হল স্থায়ী প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা। ১৯৫১-র ১ আগস্ট জন্ম নিল নতুন ধারার প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান, ছোটোদের সাহিত্যের জন্য 'শিশু সাহিত্য সংসদ' আর বড়োদের বইয়ের জন্য 'সাহিত্য সংসদ'। এ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য শুধু মুদ্রণ সৌকর্যেই নয়, বিষয় নির্বাচনেও। প্রকাশিত প্রতিটি গ্রন্থের পিছনে থাকে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা, নিখুঁত সম্পাদনা ও অনুপম প্রকাশনা। শুরু থেকে প্রকাশনা মানের যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ, তাকে আজ এই হীরকজয়ন্তী বর্ষেও ধরে রেখে উন্নত করার সাধনায় ব্রতী রয়েছেন তাঁর উত্তরসূরীগণ। এখন বিষয় নির্বাচনে তারা অতি সতর্ক, নিত্য উদ্ভাবক। প্রকাশন সৌষ্ঠবে দরদি ও নিপুণ।

নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে-র লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যজগতে আবির্ভাব লগ্নেই পেয়েছিলেন মানিক স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার। মাটির কাছাকাছি যে মানুষের বাস, সেই প্রান্তিক মানুষেরা তাঁর সাহিত্যের প্রতিমা, গ্রামীন পরিবেশ, তার মাঠ-খেত, ফুল-পাখি, পুকুর-বাগান, হাট-বাজার, নদী-বনস্থলী তার চালচিত্র।

ছোটোদের জন্য অতীন যা লেখেন তাও মূলত গ্রামীন জীবনের কথা। তাঁর গল্পের রাঙা জেঠুর মতো কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর গল্পেরও বুঝি দমবন্ধ হয়ে আসে। উদার আকাশ, বিস্তৃত প্রান্তর না পেলে তারা হাত-পা মেলে ছড়িয়ে বসার আনন্দ পায় না। সেই রাঙাজেঠুর গ্রামে এসেছে বুমবাই। সে তো এক আজব দেশ। সেখানে দেখা হল জেঠুর প্রবাসী ছেলের বিদেশিনী বউ আর তার মেয়ে অরুনিমার সঙ্গে। আর অপরিচয়ের কুয়াশা একটু একটু করে সরিয়ে সে ক্রমে চিনল এদেশের গ্রাম, গাঁয়ের মানুষজন ও তাদের জীবন।

বসির ছিল গুণিন মানুষ-আলিসান সাপ ধরে হাঁড়িতে রাখত। সে বলেছিল গুপ্তধনের কথা। বাড়ির ছোটোরা তাকে তুষ্ট করতে সকলে জেবভরতি চাল-ডাল দেয়। বড়োরা তবু তাকে বলে চোরা বসির। সে একদিন উধাও হয়ে যায়। বহুদিন পরে চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় এক ফকিরের দেখা মেলে। সিদ্ধ পুরুষ। সবাই টাকা-সিকি দিয়ে পুজো করে। তাকে দেখে ছোটোদের মনে হয় এ তাদের সেই হারানো বসির। পরদিন সে ফকিরও উধাও হয়।

গরমের ছুটিতে তপু যাবে গ্রামের বাড়িতে, এবারে বড়ো কেউ তার সঙ্গী হতে পারলে না-তা সে একাই চলল। যাবার সময়ে ঠাকুর ঘরের দরজায় দুবার মাথা ঠুকলো। তার ভয় নিশির ডাককে, গরিপরিদের মাঠের অশত্থ গাছকে। এসব অপদেবতারা ছুঁয়ে দিলেই নাকি ছোটোরা ভেড়া-ছাগল-গোরু-বাছুর হয়ে যায়। তপু পথে হাঁটে। পাটগাছগুলো মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে। আকাশে আবছা মেঘের খেলা। কোথাও দিগন্ত বিস্তৃত আউসের জমি, চাষিরা নিড়েন দিচ্ছে। গান গাইছে। এ গান তপুর খুব ভালো লাগে। ধানের খেত ধরে, তরমুজের খেতের পাশ দিয়ে তপু পথ হাঁটে। হঠাৎ মন ভয়ে শিরশির করে ওঠে-নিশির ডাক কি সে শুনতে

পায়? ওই যে কে যেন ডেকে উঠল-ও তপু কর্তা, কোনখানে যান! ওডা তো পথ না, খাড়ান, আমি আপনাদের নিয়া যামু। তপু কি আর দাঁড়ায়? দৌড়! দৌড়! দৌড়তে দৌড়তে সে কোথায় গেল? সে কি নিশির খপ্পরে পড়ল? না কি পৌঁছে গেল পরম নির্ভরতায়? এমনি সব মানুষেরা ভিড় করে আছে এ সংকলনে। তারা কেউ ভালো, কেউ খিদের জন্য পেশা বদলায়, কারও বুক ভরা দরদ।

এদের ছবি, ছবির পরে ছবি এঁকেছেন অতীন তাঁর সোনার কলমে।

অশোককুমার মিত্র

কলকাতা

ডিসেম্বর ২০১০

বসির যখন ফকির

বসিরের আর পাত্তা নেই। না থাকারই কথা। বসির বোধ হয় এ জীবনে আর আমাদের তল্লাটের দিকে আসবে না। যা গেছে বসিরের। তবে আমাদের আশা ছিল সে ঘুরে-ফিরে একদিন না একদিন আসবেই। বসির আমাদের কথা মনে হলেই নাকি স্থির থাকতে পারে না। টানে চলে আসে। বসির সেই যে গুপ্তধনের খবর দিয়ে তার পরিণাম ভোগ করে চলে গেল-তারপর তার না আসারই কথা। তবু আমাদের আশা ছিল সে আসবে। বাড়ির হুলো বেড়ালের মতো স্বভাব। মার, ধর, বস্তায় বেঁধে নদীর ওপারে ফেলে দিয়ে আস তাতে কিছু আসে যায় না। সে আবার হাজির হবেই। বসিরও সে গোত্রের। সেই বসির এতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকায় আমরা খুবই বিপাকে পড়ে গেছি!

বিপাকে পড়েছি বড়দাকে নিয়ে। একমাত্র গুপ্তধনের সন্ধান পেলে বড়দাকে এ-যাত্রা রক্ষা করা যায়। কোথায় যে বসিরের খোঁজ করি।

বসিরকে অবশ্য পঞ্চুকাকা, চোরা বসির ছাড়া ডাকে না। আমাদের তখন খুব লাগে। নিরীহ গোবেচারা মানুষ। মাথায় একখানা পেতলের হাঁড়ি। লুঙি পরনে। কোমরে গামছা বাঁধা। খালি গা। বসির মাঠের অনেকদূর দিয়ে হেঁটে গেলেও আমরা চিনে ফেলতে পারি। বসির আছে, মাথায় পেতলের হাঁড়ি নেই এমত অবস্থায় বসিরকে আমরা কোনোদিন দেখিনি। ইদানিং কী কারণে পেতলের হাঁড়ি আর মাথায় থাকত না। থাকত একটা মেটে হাঁড়ি মালসায় ঢাকা। হাঁড়ির মধ্যে তাজা দু-দুটো গোখখুর। আমরা বলি, 'ওরে বাপ কী আলিসান সাপ বসির!'

বসিরের এককথা।-'সাপ বলবেন না, সর্প বলুন। আকালুর বাগান থেকে তুলে আনলাম।'

তা সর্পই বটে। সে আমাদের পুকুরপাড়ে তেঁতুল গাছের নীচে বসে সর্প দেখাত। তার কাজ বাড়ি বাড়ি, ঝোপে-জঙ্গলে সর্প খুঁজে বেড়ানো। কালে কারে খায়-জলা জায়গা, বাড়ির আনাচেকানাচে তেনাদের বাস-গৃহীর সুরক্ষার নিমিত্তই নাকি সে এত বড়ো দায় কাঁধে নিয়েছে। আমাদের কাছে বসির খুবই বড়ো ওঝা। সেই ওঝা বসিরকে চোরা বসির বললে কার না রাগ হয়। বসির আমাদের ভালোবাসে বলেই সে এতদূর হেঁটে এসে তার নতুন শিকার দেখিয়ে যায়। আমরা বসিরকে তুষ্ট করার জন্য অবশ্য ঘর থেকে জেব ভরতি চাল-ডাল নিয়ে দিই। বসির এতে খুব খুশি হয়। তুষ্ট হয়। বলে, 'বেঁচে থাকেন কর্তারা, ধনে জনে বাড়ুক।'

সুপরির বাগানে বসির ঢুকে গেলে আমরা পাহারা দিই, পঞ্চুকাকা আবার টের না পায়। পেলেই হুলস্থুল কাণ্ড।-'আবার হারামজাদা। এদিকে ঘোরাঘুরি শুরু করেছিস! ব্যাটা ছিঁচকে চোর, মেরে মাথার খোবড়া খুলে দেব।' আর আশ্চর্য দেখেছি পঞ্চুকাকার গলা পেলেই, মাথায় হাঁড়ি নিয়ে দৌড়।-'ও বসির তোমার গামছা!'

আর গামছা! পারলে সব ফেলে দৌড়োয়।

কেন যে বসির পঞ্চুকাকাকে এত ভয় পায় বুঝি না। শুধু পঞ্চুকাকা কেন, আমার পাগল জ্যাঠামশাইর ভয়েও সে বাড়িতে উঠে আসে না। পুকুরপাড়ে লম্বা গোপাট। মটকিলার ঝোপজঙ্গল। সেখানে সে উবু হয়ে আমাদের আশায় বসে থাকে। আমরা চার ভাই প্রায় সমবয়সি। বড়দা, মেজদা, সেজদা, আমি। বড়দার চার ক্লাস নীচে পড়তাম। সেটা এখন দু-ক্লাসে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বাড়ির গৃহশিক্ষকের হিসাবমতো সেটাও নাকি থাকবে না। সমান হয়ে যাবে। এই গৃহশিক্ষকের উপদ্রবেই বড়দা অতিষ্ঠ। কাঁহাতক আর রোজ মার খাওয়া যায়। প্রহারে জর্জরিত বড়দার এককথা, 'যাব যে দিকে দু-চোখ যায় বের হয়ে।' গৃহশিক্ষকের এককথা, প্রহারেণ ধনঞ্জয়!

অথচ আমাদের কত আশা বড়দাকে নিয়ে। এত বড়ো বংশ বলে কথা! সেই বংশের ছেলে শেষ পর্যন্ত যদি গামছা বিক্রি করে খায় তবে বাপ-ঠাকুরদার ইজ্জত থাকে কী করে।

বড়দাকে আমরা বোঝাচ্ছি, আর দু-একটা মাস দেখো বড়দা! বসির চলে আসবেই। বসিরই তো দুটো সাদা গোখখুর আমাদের বাড়িতে ঠাকুরদার খাটের নীচে হাঁড়িতে চাপা দেওয়া থাকে খবরটা দিয়েছে, ঠিক কি না! ও দুটোই নাকি গুপ্তধনের যখ! আমাদের সাদা চোখে দেখতে পাই না।

তবে গত সালে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমাদের দেশটায় বর্ষা এলেই নদী ভেসে যায়। খাল পুকুর ভেসে যায়। বর্ষা যত জোর নামে নদীর জলে মাঠ ভেসে যায়। তখন চারপাশের গ্রামে মাঠে মাছ মারারও জোয়ার আসে। জোয়ারের জলে ধান খেতে নদীনালা থেকে সরপুঁটি, বোয়াল, শোল, মাগুর উঠে আসে। আমি সেই আশায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায়, আকাশে তখন মেঘের ওড়াউড়ি-গোপনে সরপুঁটি জোয়ারের জলে ধরতে গিয়েই এক মহা বিপাকে। ধান গাছের গুঁড়ি নড়লেই পলোতে ঝাপ। একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কোনদিকে গাছ নড়ে দেখার চেষ্টা করছি। আরে বাস! ওরে বাপস! কত ধান গাছ জল মুচড়ে কী উঠে আসছে। নির্ঘাত আলিসান বোয়াল মাছ হবে। দৌড়ে যেই না লক্ষ্য করে পলো ফেলে চেপে ধরেছি-দেখি অতিকায় এক গোখখুর পলোর ফাঁক দিয়ে আমার মুখের উপর ঝুলছে। 'জ্যাঠামশাই' বলে সেই যে হাঁক মেরে চুপসে গেছিলাম আর জ্ঞান ছিল না। চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়ি থেকে কোলাহল উঠছে। মাঠের মানুষজন দৌড়ে আসছে। পাগল জ্যাঠামশাই সবার সঙ্গে। কেউ এগোতে সাহস করছে না। কিন্তু যা হয়, পাগল মানুষ তার ভাইপোর আত্মরক্ষার্থেই বোধ হয় পেছন থেকে সাপের টুঁটি চেপে ধরলে আর এক মহা হুলস্থুল। আমাকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে আসা, জ্যাঠার হাতে জড়িয়ে আছে সেই কাল ভুজঙ্গ-সবাই জানে পাগল মানুষের কাণ্ডজ্ঞান কম, জেঠিমা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার পাগল জ্যাঠা নির্বিকার। যেন তিনি জোয়ারের জল থেকে মাছ শিকার করে ফিরেছেন। দক্ষিণের বারান্দায় জলচৌকিতে নির্ভাবনায় বসে আছেন, আর বিড়বিড় করে বকছেন। পঞ্চুকাকা আমাদের গৃহভৃত্য, বাবা-কাকারা প্রবাসে, দুদুকাকা আমাদের প্রথম মনিব, তার পরামর্শ মতোই বসিরের খোঁজে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটা। সঙ্গে মেজদা বড়দা। খাল পাড়ে ডেরা বানিয়ে থাকে বসির। দুই বিবি-ডজন খানেক সন্তানাদি। বসির শুনেই নাকি খাপ্পা। সে বলল, 'খাক পাগলঠাকুরকে! এখন বোঝো, বসিরকে পানিতে চোবালে কী হয়। যাব না।' তারপর বলেছিল, 'খা খা ভক্ষিলারে খা।'

পঞ্চুকাকার তখন এককথা, 'দেখ বসির, কর্তার যদি কিছু হয় তোকে দেশছাড়া করব। ব্যাটা ভেবেছিস কী! বাড়ির বাচ্চাগুলিকে ব্যাটা হাত করে ঘরের চাল-ডাল সাফ করে দিচ্ছিস, সুপারির বাগান থেকে সুপারি চুরি করছিস, আমি বুঝি টের পাই না!'

এটা ঠিক পাগল জ্যাঠামশায় বসিরকে ধরে জলে চুবিয়েছিলেন। বসিরের আর্ত চিৎকার শুনে জেঠিমা ছুটে না গেলে বসিরকে হয়তো মেরেই ফেলত। আমরা আর তাকে খুঁজে পেতাম না।

পাগল জ্যাঠার রাগের অবশ্য কারণও আছে। কারণটা আর কিছুই না-বসিরের সেই তাজা সর্প দেখার কৌতূহলে আমরা পড়া-টড়া ফেলে ছুটি বলে! বসিরের নানারকম উপদেশ আছে। তার একটি হল, তাজা নাগিনী দেখলে, সর্পরাজরে তুষ্ট করতে হয়। তার তুষ্টি বিধানে আমাদের কাজ ছিল, ভালো মানুষের মতো ঘরে ঢুকে যাওয়া। আমরা চার ভাই সারবন্দি হয়ে যাচ্ছি-গায়ে গরমকালেও ফুল শার্ট, পরনে প্যান্ট। প্রত্যেকের চারটি করে পকেট। নামতায় পারদর্শী আমরা-চার চারে ষোলো। দুপুরে যখন সবাই দিবানিদ্রায় মগ্ন চার বার এভাবে ঘরের মট থেকে চাল তুলে নিতে পারলে চোষট্টি খেপ। ওর হাঁড়ি অর্ধেক হয়ে যায়। এই করে বরাবর যখন কাজ চলছিল, তখন দক্ষিণের বারান্দায় জ্যাঠামশাই জলচৌকিতে বসে বিড়বিড় করে বকছেন। পাগল মানুষ বলে, তাকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। আমরা তার সামনে দিয়ে যাচ্ছি গোপাটে। জেব পরিষ্কার করে উঠে আসছি। আমরা জানব কী করে সেজদার পকেট ছেঁড়া। বাড়ি থেকেই জেবের ফাঁকে চাল পড়তে পড়তে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাই টের পেয়ে গুটিসুটি উঠে দাঁড়ালেন-ঠিক টের পেয়েছেন, বসির বাড়ির নির্বোধ ছেলেগুলিকে দিয়ে চাল পাচার করাচ্ছে। বুঝেই দৌড়ে গিয়ে খপ করে ঘাড় ধরে তুলে এনেছিলেন! দশাসই বিরাট মানুষ, নিয়ে এসে পুকুরে ফেললেন। জ্যাঠামশায় কোনো কথা বলেন না, কেবল জলে চোবান। আর ত্রাহি চিৎকার, 'ও বড়ো বউঠান আমারে কর্তা মাইরে ফেলল, বাঁচান!' জেঠিমা পুকুরধারে ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়ালে, লক্ষ্মী ছেলেটির মতো জ্যাঠামশায় ঘাড় ছেড়ে আবার দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে বসেছিলেন।

ঊর্ধ্বশ্বাসে তখন বসির ছুটছে, পেতলের হাঁড়ি মাথায় নিয়ে। সেবারেও মনে হয়েছিল জন্মে আর বসির এদিক মাড়াবে না। মাসখানেক দেখাও যায়নি। মেলা থেকে একবার ফেরার পথে সিঙিদের পুকুরপাড়ে দেখি বসির শুয়ে আছে। এটা খুবই ভূতুড়ে জায়গা। দিনের বেলাতেও একা যেতে ভয় লাগে। সে জায়গায় এমন কে সাহসী মানুষ, শুয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। গিয়ে দেখি মাথার কাছে পেতলের হাঁড়িখান রেখে বসির শুয়ে আছে। মুখ গামছায় ঢাকা। কেউ চিনতে না পারে ভেবে গামছায় মুখ ঢেকে রেখেছে। বড়দা গামছাখান ধীরে ধীরে তুলতেই হাঁড়ি মাথায় ঊর্ধ্বশ্বাসে... আমরা ডাকি, 'ও বসির, আমরা। আমি মেজদা বড়দা। সঙ্গে পঞ্চুদাদা কিংবা পাগল জ্যাঠামশায় কেউ নেই।' কে কার কথা কানে নেয়।

সুতরাং এরপর ভেবেছিলাম, বসিরকে আর দেখা যাবে না। কিন্তু মাসখানেকও যায়নি, বসির এসে গোপাটে চুপিচুপি খবর দিয়েছিল, 'কর্তারা আপনাগো বাড়ির পাশে-বোঝলেন না, ওই আপনার ঠাকুরদার বাপের আমলের অট্টালিকায় গুপ্তধন আছে। আপনার ঠাকুরদা গুপ্তধন পাহারায় দু-খান শ্বেত গোখখুর পুষে রেখেছেন। মধ্য রাতে তেনারা ঠাকুরদার খাটের নীচে হাঁড়িতে এসে থাকেন। ওটা খুঁজলে পেয়ে যাবেন। তবে সবটা খবর নিতে পারিনি, রাতের বেলা, এই বোঝলেন না, দ্বিপ্রহর রাতে দরজা খুলে রাখলে সাক্ষাৎ মোলাকাত হতে পারে। আপনাগো ঠাকুরদার খাটের তলায় কী করে ঢোকে বের হয় দেখতে হয়।'

আমরা ঠাকুরদার খাটের তলায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও হাঁড়ি পাইনি। ঠাকুরদা বুড়ো মানুষ। অথর্ব। অন্ধ। পুবের জানালা খুলে দিলে বড়ো কামরাঙা গাছ। কামরাঙা গাছটা পার হলে আমাদের পূর্বপুরুষদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ। ভাঙা জরাজীর্ণ পোড়ো বাড়ি। গুপ্তধন আছে, বাড়িটা দেখলেই সন্দেহ জাগে। তার উপর বসিরের মতো ওস্তাদ গুণিন লোক বলেছে, 'গোপন রাখবেন, কাউকে কবেন না। খাটের তলায় হাঁড়ি খুঁজতে গেলেন ক্যান। ও হাঁড়ি সাপের মাথায় থাকে। রাতে দ্বিপ্রহরে প্রবেশ। ভোর রাতে প্রস্থান। সাদা চোখে দেখা যায় না। প্রস্থানের সময় অনুসরণ-বোঝলেন না, তারপর, কোথায় যায় দেখা। যেখানে যায়, ঢোকে, খোড়াখুঁড়ি-তারপর বোঝলেন না, মণিমানিক্য, প্রাসাদ, ঝি চাকর দাসদাসী, পেল্লাই পাটের আড়ত।' বসির একনিশ্বাসে বলে গেছিল-আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে হাঁ করে শুনছি-বসিরের কথামতো আমরা যে যার ঘর রাতের দ্বিপ্রহরে খুলে

বের হয়ে এসেছিলাম-কিন্তু কোথায় বসির-কারও পাত্তা নেই। বসিরের এই এক দোষ, কথা দিয়ে কথা রাখে না।

কথা রাখে না ঠিক না, কথা ঠিকই রেখেছিল। তবে সেটা কে আমরা জানি না। সব ঘর সাফ করে ধুয়ে মুছে সব তুলে নিয়ে গেছে কারা। মায় পাগল জ্যাঠামশাইয়ের খড়ম জোড়া পর্যন্ত। অবশ্য এটা বসিরেরই কাজ আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। এত বড়ো গুণিন মানুষ এত ছোটো কাজ করতে পারে আমাদের বিশ্বাস হয় না। পঞ্চুকাকা বসিরের খোঁজে গেলেন। পুলিশ আমাদের জেরা করল-আমরা একবাক্যে বলেছি, আমাদের সঙ্গে বসিরের দেখা হয়নি। বসিরের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। আমরা দুপুর রাতে দরজা খুলে বের হইনি। সব বেমালুম অস্বীকার। বাড়ির কী গেল না গেল তার চেয়ে বড়ো কাজ বড়দাকে গুপ্তধন পাইয়ে দেওয়া। ওটা বড়দা পেয়ে গেলে আর গামছা বিক্রি করতে হবে না।

সত্যি তো কার না লাগে! গৃহশিক্ষক যেদিন এলেন সেদিন আমাদের সঙ্গে কী ভালো ভালো কথা! আমরা গলে জল।

'তোমার নাম।'

নাম বললাম।

'পিতার নাম?'

'অভিমূন্য বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'পিতামহের নাম?'

'মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'প্রপিতামহের নাম?'

'কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম?'

'জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম?'

'শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'অতি অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম?'

'মনিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।'

বড়দা খুব খুশি হয়ে বলেছিল, 'জানেন স্যার অতি অতি বৃদ্ধ পিতামহ নবাব ইশা খাঁর দেওয়ান ছিলেন।'

'বংশের মুখ উজ্জ্বল করো।'

আমরা একবাক্যে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, স্যার করব।'

তিনি ভারি তুষ্ট। আমাকে বললেন, 'তুমি কী হবে? মানে হতে চাও। সবারই তো স্বপ্ন থাকে।'

কী হব মাথায় আসছে না। এমন একটা হতে হবে, যেন আর কেউ বংশের হয়নি, হবেও না। বললাম, 'স্যার আমি র্যাংলার হতে চাই।'

'বেশ বেশ, তুমি উমাশঙ্কর?'

উমাশঙ্কর আমার বড়দা। বড়দা মাথা চুলকে বলল, 'আমি জজ হব।'

'তুমি চন্দ্রশেখর?'

মেজদা বলল, 'স্যার আমি উকিল হব।'

এই পর্বের পর বছর তিন তিনি আছেন। সবার ওপরই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তবে সবচেয়ে বেশি বড়দার ওপর। একদিন মারতে মারতে গৃহশিক্ষকেরই মাথা খারাপ হয়ে গেল। বলল, 'বড়ো হয়ে কী করে খাবি তুই? বল খাবি কী করে!'

বড়দাও ওষ্ঠাগত প্রাণ দিয়ে বাঁচার জন্য বলল, 'কিছু না পারি স্যার গামছা বিক্রি করে খাব।'

গৃহশিক্ষক দমে গিয়ে বললেন, 'কী বললি! গামছা বিক্রি করে খাবি!'

সেই থেকে আমরা বেদম উচাটনে আছি। বড়দা গামছা বিক্রি করবে! বসির না এলে যে কী হবে। ওর ডেরায় গিয়ে দেখেছি, দু-ক্রোশ হেঁটে গেলে খালের ধারে ডেরা। সে তো নেই-ই, ডেরাও নেই। থাকবে কী করে! পাগল জ্যাঠামশাইকে বাঁচাতে এসে নিজেই এমন তাড়া খেল যে, প্রাণ থাকতে আর আসে! দৃশ্যটা তো মনে করতে পারি। চ্যাংদোলা করে তুলে আনা হয়েছে-'ব্যাটা ওঝা, গর্ত খুঁড়ে সাপ বের করিস, লোককে বলে বেড়াস নাগিনী তোর বশ মানে-আর শ্বেত গোখখুরের নাম শুনে লুঙ্গি কোমর থেকে খুলে যাচ্ছে! পাগল কর্তার বিষম বিপদ। যা সাপ ধরে হাঁড়িতে তোল!'

আমার পাগল জ্যাঠা পিটপিট করে বসিরকে দেখছে। বোঝাই যাচ্ছে, জ্যাঠার খড়ম জোড়া চুরি করে বসির ভালো কাজ করেনি। গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে। পাগল ঠাকুরকে এক কাল-ভুজঙ্গ পেঁচিয়ে ধরেছে। এমন একটা ভয়াবহ খবর ছড়াতে সময় লাগেনি। কিন্তু আশ্চর্য পাগল জ্যাঠার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সাপের টুঁটি চেপে ধরে আছেন একহাতে। গৌরবর্ণ মানুষ। একেবারে সাক্ষাৎ মহাদেবের সামিল বিশাল শরীর তার। যত বড়ো ভুজঙ্গই হোক তাঁর সঙ্গে পারবে কেন! হাতে কষে প্যাঁচ মারছে। গোটা হাতটা দেখা যায় না। লেজ দিয়ে শরীর জড়াবার চেষ্টা করছে। জ্যাঠার সেদিকে হুঁশই নেই। তাঁর তামাক খাবার সময় বাঁ-হাতে টিকা জ্বালিয়ে ফু দিচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে সাপের দিকে জলন্ত টিকার স্যাঁকা দিচ্ছেন। আর এ সময়েই বসিরের উদয়। সে লুঙি কষে একবার তেড়ে যায় জ্যাঠার কাছে আবার কী ভেবে ছুটে পেছনে এসেই ফাঁক খোঁজে পালাবার। কিন্তু মানুষজন সতর্ক। পালানো চাট্টি কথা নয়। তার উপর মর্যাদার প্রশ্ন। সে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে যেই না জ্যাঠার কাছে গেছে আর অমনি জ্বলন্ত টিকা সাপের মুখের মধ্যে-সঙ্গেসঙ্গে ঝটকা মেরে সাপটা শরীর থেকে ঝুলে পড়তেই জ্যাঠা ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'ধর ব্যাটা!' বসিরও আর কী করে। সাপের টুঁটি চেপে ধরে হাহাকার চিৎকার, 'আমারে বাঁচান কর্তা। আমি চোরা বসির, পেটের দায়ে ওঝাগিরি করি, বাড়ির আশেপাশে ঘুরি, এটা-ওটা হাতড়ে নিয়ে চলে যাই।'

সাপটা তখন বসিরের গোটা শরীর পেঁচিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। জ্যাঠার বোধ হয়, মায়া হল। ব্যাটা মরবে এবার। তিনি ছুটে গিয়ে বসিরের হাত থেকে সাপের গলা টিপে ধরতেই বসির ছাড়া পেয়ে গেল। তারপর সে কী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। জ্যাঠা পরপর আর একটা জ্বলন্ত টিকা সাপের মুখে পুরে দিতেই সোজা ঝুলে পড়ল। জ্যাঠা সাপটাকে তারপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে ভালো করে তামুক সাজতে বসলেন। এই হল বসিরের শেষ পরিণতি। তারপর বছর পার হয়ে গেল তার দেখা নেই। কারও এতে আসে যায় না। আমাদের যায়। সে গুপ্তধন খুঁজে বের করবে কথা দিয়েছে। তার দেখা না পেলে বড়দাকে শেষ পর্যন্ত সত্যি গামছা বিক্রি করে খেতে হবে। বড়দার জেদ। আর পড়াশোনা করবে না।

এখানে সেখানে, যখন যেখানে যাই বসিরকে আমরা খুঁজি। সেবারে ক্রোশ দশেক দূরে আমরা মামার বাড়ি বেড়াতে গেছি। চৈত্র সংক্রান্তির মেলা রথতলায়। পঞ্চুকাকা ধার্মিক মানুষ। পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়েন। মেলায় গিয়ে খবর পেলেন, রথতলার মাঠ পার হয়ে নদীর ধারে পীরের দরগায় এক ফকির বসবাস করে। ফকির কথা কয় না। একটা পা খোঁড়া। ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা দেখতে মেলার সবাই তাকে দর্শন করতে যায়। পঞ্চুকাকা বলল, 'তোরা বাড়ি যা। আমি ফকিরের দোয়া মেঙে আসি।'

আমরা ছাড়ব কেন। বললাম, 'পঞ্চুকাকা, একা তুমি ফকিরের দোয়া মাঙবে। আমরা মাঙব না?'

'তবে চল।'

আমরা গেলাম। দরগার গাছপালার ছায়ায় একটা ছাইয়ের মধ্যে অন্ধকারে বসে থাকেন তিনি। মেহেরবানি হলে বের হন। না হলে বের হন না। লোকজন সবাই নীচে বসে আছে। তিনি দর্শন দেবেন। এবং দিলেনও। সাঁজ লেগে গেছে। রোগা শুকনো, বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি। লম্বা চুল। কালো রঙের আলখেল্লা পরনে। গলায় মালা তাবিজ।

দর্শন দিতেই মেজদা বলল, 'কীরকম লাগছে! একটা ঠ্যাং খোঁড়া!' চুপিচুপি বলল, 'ঠিক বসির। মেরে কারা ওর ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছে।'

কীরকম লাগছে বলতেই পঞ্চুকাকার ধমক, 'চুপ। ফকিরের আগুনে পুড়ে মরবি। একদম বাজে কথা বলবি না।' সবাই টাকাটা সিকিটা ছুড়ে দিচ্ছে। পঞ্চুকাকাও একটা আধুলি মাজারে ছুড়ে দিয়ে দু-কান ধরলেন, হাঁটু গেড়ে বসলেন। আমরা কিছুই করতে পারছি না। ফেরার পথে পঞ্চুকাকা বললেন, 'ফকিরের মুখে আগুন জ্বলে। রাতের বেলা খড়ম পায়ে নদীর জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যান। স্বচক্ষে দেখা। সবাই নাকি দেখেছে।'

বড়দা আমার কানে কানে বলল, 'মনে ধন্দ লাগছে। বসির না হয়ে যায় না। আমাদের দেখেই তাড়াতাড়ি গর্তে ঢুকে গেল। ও বসির তুমি যে নিজে ফকির হয়ে আমাদেরও ফকির করে গেলে!'

আমি বললাম, 'আমারও। ওর চোখ আমাদের চেনা। চোখ দুটো ছাড়া সবই অন্যরকম।'

মেজদা বলল, 'বসির মনে হয়, মানুষের তাড়া খেয়ে ফকির সেজে বসে আছে।'

পরদিন খুব সকালে ফকিরের খোঁজে দেখি ডেরা খালি। ফকির উধাও। বসিরকে আমরা আর খুঁজে পাইনি। এবারে বসিরও গেল, ফকিরও গেল। গামছা বিক্রি করে খাওয়া ছাড়া বড়দার আর কোনো উপায় থাকল না।

তিনুকাকার অন্তর্ধান রহস্য

তিনুকাকাকে নিয়ে আমার বাবা-কাকারা শেষ পর্যন্ত সত্যি ভারি মহাফাঁপরে পড়ে গেলেন। কী যে করা যায়। দুদুকাকার ব্রহ্মতালু জ্বলছে রাগে। ঠাকুমার ভয়ে কিছু বলতে পারছেন না। বললেই এককথা, 'তুই আবার তিনুটার পেছনে লাগলি! দাঁড়া, উপেন বাড়ি আসুক, যদি না বলছি তবে আমার নামে কুকুর পুষিস।' উপেন অর্থাৎ আমার সোনা জ্যাঠামশাই-তিনি এলে নালিশ দিলে দুদুকাকাকে ডেকে শাসন করবেন, 'তোরা কী করলি, মার কথা অবজ্ঞা করিস!' আমাদের সামনে দুদুকাকা চান না, তাঁর দাদা এসে তাঁকে ধমকান। তবু মাথা যে ঠিক রাখতে পারছেন না বুঝতে পারছি। ঠাকুমা এবাড়ি ওবাড়ি গেলেই হুংকার, 'হারামজাদা তোকে ধরে খড়মপেটা না করলে তুই সজুত হবি না! ভেবেছিস কী! সাপের পাঁচ পা দেখেছিস! বাড়িতে কেউ তিষ্ঠোতে পারবে না দেখছি। ছেলেপিলেদের পড়াশোনা পর্যন্ত লাটে তুললি!'

ঠাকুমার এখন এককথা, 'দেখিস তিনুটা যেন আবার ভেগে না যায়।' ভেগে গেলে যে দুদুকাকার রক্ষা থাকবে না, তিনুকাকার সর্বনাশের মূলে দুদুকাকা-এসব সাত-পাঁচ চিন্তায় কাকা আমার সত্যি অস্থির।

দুদুকাকা দেখলেন, তিনুকাকা গোপাটের দিকে যাচ্ছে। আমরা গুপ্তচর বৃত্তিতে আছি। দুদুকাকা খবর পেলেই দৌড়ে হাজির।-'এই কোথায় যাচ্ছিস! এক-পা বাড়ি থেকে নড়লে ঠ্যাং ভেঙে দেব। পাজি হতচ্ছাড়া, ভাগার তালে আছে। যা বাড়ি যা, ঘরে গিয়ে বসে থাক। বউমা না আসা পর্যন্ত তোমার ছুটি নেই।'

'বলছি তো তোমাদের বউমাকে খবর দেবে না। দিলেই ভাগব।'

এদিকে কাকিমাকে খবর না দিয়েও উপায় নেই। কাকা তখন নিরুদ্দেশ। ঠাকুমার সারাদিন বারান্দায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বিলাপ-'আমার দশটা না পাঁচটা না, একটা ভাইপো, বিবাগী হয়ে তুই কোথায় চলে গেলি রে তিনু! তোকে কে আছে রে দেখার! তুই কেন চলে গেলিরে! যাবি তো খবর দিয়ে কেন গেলি না রে! কাকে এখন খুঁজতে পাঠাই রে। বাড়িতে আমার একপাল রাক্ষস কেবল গিলতে জানে রে। তোর খোঁজে আমি কাকে যে পাঠাই রে! আমার বউমার কী হবে রে!'

কাঁহাতক সহ্য করা যায়। বাবা-কাকারা সব প্রবাসে। দুদুকাকা বাড়ি থাকেন। ঠাকুরপূজা, জমি, যজমান সব দেখেন। পঞ্চুকাকা গোরু বাছুর গোয়াল। আসলে দুদুকাকা কেন খুঁজতে বের হচ্ছে না, পঞ্চাটা কী করে দিবানিদ্রা দিতে পারে এত বড়ো দুর্ঘটনার পর, ঠাকুমার মাথায় সেটাই আসছে না। ফলে বসিরের কাছ থেকে খবর পেয়েই আমরা রওনা হয়েছিলাম নিখোঁজ বামালের খোঁজে। পেয়েও গেছিলাম।

বিয়ের আগে ঠাকুমার ভাই বেঁচে থাকতেও কাকা আমার মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। তখন কেশবদাদু চিঠি দিত দিদিকে, তিনুটা আবার উধাও। কী যে করি!

কাজেই তিনুকাকার উধাও হওয়া নিয়ে আমাদের কোনো দুশ্চিন্তা হত না। বেরিয়েছে, আবার ফিরে আসবে। কিন্তু মুশকিল হত ঠাকুমাকে নিয়ে।

ঠাকুমা ভারি উচাটনে পড়ে যেতেন তখন। পঞ্চুকাকাকে পাঠাতেন খবর দিয়ে-বিয়ে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কেশবদাদু আসতেন। একদিনের পথ। তাও চলে আসতেন। এসে বলতেন, 'বিয়ের কথা তুললেই ভাগছে।'

ঠাকুমার এককথা, 'আমি পাত্রী ঠিক করে রেখেছি। এবার এলেই পিঁড়িতে বসিয়ে দিতে হবে।'

'কিন্তু দিদি!'

'আরে কিন্তুটা কী বলবি তো!'

'ও যে বলছে অত ঝক্কি পোহাতে পারবে না।'

'ও বলল, আর তুই শুনলি! অমন বলে থাকে। এবার ফিরে এলেই খবর দিয়ে দিবি। উপে, জলু, অভিমন্যু সবাই চলে যাবে। আমিও যাচ্ছি, উজাড় করে সব তোর ওখানে তুলে নিয়ে যাব। পায়ে পায়ে লোকজন থাকবে। ভাগেটা কী করে দেখব! বিয়ে দিলেই দেখবি দায়িত্বজ্ঞান বাড়বে। বাউন্ডুলেপনা মাথায় উঠবে। বাড়ি থেকে নড়তেই চাইবে না।' এমন মহৌষধ প্রয়োগে কাকা আরোগ্যলাভ করবেন জেনেই গত বৈশেখে বিবাহ।

মাসখানেক বাদে কেশবদাদুর চিঠি, এবারে আর মরতে ভয় পাই না দিদি, শান্তিতে মরতে পারব। তিনুটার সংসারে মন বসেছে। দাদু সত্যি কিছুদিন যেতে না যেতে সজ্ঞানে মারা গেলেন। আর কাকাও তারপর একদিন সজ্ঞানে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লেন।

আগে আসত দাদুর চিঠি, এবারে কাকিমার চিঠি। ঠাকুমাকে লিখেছে, পিসিমা আপনার ভাইপো, আজ ক-দিন হল বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে। এত জমিজমা গাছপালা বাগান দেখি কী করে! ও যে কোথায় গেল-দীর্ঘ চিঠি। কোথাও কোনো রাগ অভিমানের প্রশ্ন নেই।

তিনুকাকার বের হয়ে পড়াটা আমাদের কত বড়ো যে সংকট তখন দুদুকাকার চোখ-মুখ দেখলে টের পেতাম।

'আরে গেলি!'

ঠাকুমার চিৎকার-'যা, বসিরকে খবর দে। পঞ্চারে পাঠা গোপালদি। অচল ভোলা উমাকে পাঠা-এক-একদিকে তোরা বের হয়ে পড়।'

দুদুকাকা না পারলে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত!-'কোথায় খুঁজব। উমা অচলের পড়াশোনা নেই!'

ঠাকুমার এককথা, 'পড়াশোনা করার সময় অনেক পাবে, ওটা ভেসে যাবে না। কিন্তু আমার ভাইপোটা ভেসে গেলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

তারপর খুঁজেও পাওয়া গেল। ধরে আনাও গেল কড়া পাহারায়। আমাদেরই স্কুল-ফিস্কুল মাথায়, পড়াশোনা করলেও হয়, না করলেও হয়। দুদুকাকার মেজাজ সপ্তমে, তিনিই আমাদের অভিভাবক। পড়ায় বসতে বলতে পারেন না, স্কুলে যেতে বলতে পারেন না। কারণ ঠাকুমার কথার উপর কারও কথা নেই। আমাদের জ্যাঠা-কাকারা মিলে ছ-জন, চার পিসি-সবাই বড়ো বেশি মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য-এ-হেন পরিস্থিতিতে দুদুকাকা বড়ো অসহায়। কিছু বললেই বাবা-কাকারা প্রবাস থেকে এলে নালিশ, 'আমাকে তোরা কাশী পাঠিয়ে দে, আমি এখন কে! ডালু আমার কথার মর্যাদা দেয় না। তোমাদের এখন সবার পাখা গজিয়েছে, আমি নিমিত্তমাত্র। কালই বারদী চলে যাব। অপমান আর সহ্য হয় না।'

বারদী থেকে স্টিমারে নারানগঞ্জ, তারপর কলকাতায়। ঠাকুমার বোন কাশীবাসী, সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী না হলে জীবনে এমন হয় না। মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট জায়গা, সংসারের টানে সেই মোক্ষলাভ পর্যন্ত হচ্ছে না। রেগে গেলেই মোক্ষলাভের জন্য অধীর হয়ে ওঠা তাঁর অভ্যাস। বার্ধক্যে বারাণসি মনে করিয়ে দিয়ে বলবে, 'সব থাকল, চললাম।' এই একটা ভয়ে বাবা-জ্যাঠা এবং কাকারা বড়ো জুজু ঠাকুমার কাছে। মার কোনো অভিযোগ শুনতেই তাঁরা রাজি না। দুদুকাকা সবার ছোটো। বাড়ি থাকেন, জমিজমা, গৃহদেবতা, যজমান সব সামলানোর দায় তাঁর। আর আছে পঞ্চুকাকা, গোয়াল-ঘর গোরু-বাছুর, চাষ-আবাদের মালিক। তিনি আমাদের সংসারে, দুদুকাকার পর দ্বিতীয় মনিব। এই মনিবের ঠেলাতেই, তিনুকাকাকে এবারে পাকড়াও করা গেছে। আর আছে একজন, সবাই জানে তাকে, চোরা বসির। সেও নানা অঞ্চলের খবর দিয়ে যায়-বাড়ি ঢুকতে অবশ্য ভয় পায়। ভয় দু-কারণে-এক আমার পাগল জ্যাঠামশাই আর এক পঞ্চুকাকা। সে-ই বলেছিল, আমাদের বাড়িতে এক জোড়া বাস্তু সাপ আছে। দুধগুখরো। ঠাকুরদার খাটের নীচে, মেঝের গর্তে তার নিবাস।

চোরা বসির না থাকলে এবারে আমরা খবর পেতাম না, তিনুকাকা কোথায় ঘাপটি মেরে আছেন। বসিরের মাথায় থাকে মেটে হাঁড়ি, আর এক জোড়া কেউটে। সে আমাদের কেউটে সাপের খেলা দেখিয়ে আকৃষ্ট করে। আমরা ঘর থেকে চাল ডাল সুপারি পান, যা কিছু জেব ভরতি করে নিয়ে যাই গোপাটে। সে কখনো আমাদের কচ্ছপের ডিম দেয়। সেই খবর দিয়েছিল, 'অনুমান হয়।'

'অনুমান!'

'অনুমান হয়, তিনুকর্তা দন্দির শ্মশানে আইসা মচ্ছব দিছেন। এলাহি কাণ্ড।'

কথাটা পাঁচকান না হয়, সে জন্য চুপিচুপি বসির বলেছিল, 'আল্লার মর্জি না হলে হয় না। ফকির দরবেশ। আউলিয়া সব তাঁর মর্জিতে। আপনার আমার সাধ্য কী!' আসলে বসিরের ধারণা, ঈশ্বরের অসীম কৃপা না থাকলে সংসার ছেড়ে বিবাগি হওয়া যায় না।

তখন আমার ঠাকুমার অনশন চলছে। কাকির চিঠি পেয়েই ঠাকুমা নিরামিষ ঘরের বারান্দায় বিলাপ শুরু করে দিয়েছিলেন, 'ওরে তিনু রে, তুই কোথায় গেলি রে বাপ! আমার দাদার কী হবে রে! বউমা জলে ভেসে গেল রে! আমার বাড়িতে কে আছে রে খোঁজখবর নেয়। ছেলেরা বৌদের কথায় ওঠে বসে রে!' এ-হেন অবস্থা যখন চলছে, গাঁয়ের মানুষজন ঠাকুমার বিলাপে বাড়িতে অষ্টপ্রহর হাজির, বোঝ প্রবোধ দিচ্ছে, কে শোনে কার কথা! দুদুকাকা শিরে সংক্রান্তি ভেবে বের হয়ে পড়েছেন-একদিকে পঞ্চুকাকা গেছে, একদিকে দুদুকাকা, কিন্তু দিনের শেষে ঘর্মাক্ত হয়ে ফিরছেন, খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তখনই আমরা চার

ভাই বাড়ি দৌড়ে গিয়ে পঞ্চুকাকার মারফত খবর দিলাম, তিনুকাকা দন্দির শ্মশানে ধুনি জ্বালিয়ে বসে গেছে। খবরটা বসিরই দিয়ে গেছে।

খবর পাওয়ামাত্র ধাওয়া-ঠিক মক্কেল সেখানে। চেনার উপায় নেই, গেরুয়া পরনে, জটাজূটধারী সন্ন্যাসি। গালে লম্বা দাড়ি। বোঝার উপায় নেই, তিনুকাকা। পঞ্চুকাকা ঠিক বুঝতে পেরে যেই না সাধুবাবার কুঁড়েঘরে হাজির, তখনই লম্বা দৌড়। দৌড় দেখেই বুঝেছিলাম, ঠিক আমার তিনুকাকা না হয়ে যায় না। আমাদের সার্কাস দেখাবার জন্য নিয়ে গিয়ে এভাবে একবার দৌড়ে মেলা থেকে পালিয়েছিলেন। যত ডাকি, 'তিনুকাকা, কোনো ভয় নেই, টিকা দিতে এসেছে। পালাচ্ছ কেন?' তিনুকাকা কি একা, মেলাসুদ্ধু লোক দৌড়াচ্ছে। কলেরা বসন্তের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে সরকারি দায়িত্ব নিয়ে এসেছে যারা, তারা তো হতভম্ব। সবাই দৌড়ায়। মুরগির ঝাঁপি ফেলে দৌড়ায়। কাচের চুড়ি চিনেমাটির পুতুল ফেলে দৌড়ায়। জিলিপির কড়াই উলটে দিয়ে দৌড়ায়। মেলা একেবারে ফাঁকা। আমরা দৌড়াই তিনুকাকাকে ধরার জন্য। পৃথিবীর হেন জায়গা নেই, তিনুকাকা না গেছে-ভ্রমণ তার একমাত্র বিলাস। সেই তিনুকাকা কাকিমার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য বোধ হয় আবার ভ্রমণে বের হয়ে পড়েছেন।

পঞ্চুকাকা আমাদের খুবই বলশালী মানুষ। তার সঙ্গে পারবে কেন। দু-লাফে কাকার জটা সাপটে ধরতেই ফসকে গেল। পঞ্চুকাকার হাতে নকল পরচুলা, তিনুকাকা তখনও ছুটছে। দুদুকাকার ধমকে পঞ্চুকাকার চৈতন্য হয়।-'আরে পালাচ্ছে, ধর ধর।' পঞ্চুকাকা এবার দাড়ি সাপটে ঝুলে পড়ল। তিনুকাকা যায় কোথায়! দাড়িটা নকল নয়, পঞ্চুকাকা ঝুলে পড়তেই টের পেয়েছিল।

দুদুকাকার হুমকি, 'আবার তিনু তুই নিরুদ্দেশ। তুই কি আমাদের শান্তিতে বসবাস করতে দিবিনে।'

তিনুকাকা চুপ।

'হাঁট।' তিনুকাকা হাঁটতে থাকল।

বাড়ি এসে তিনুকাকা আমাদের নিয়ে নাপিত বাড়ি গেল। দাড়ি কামিয়ে বলল, 'ওম শান্তি! আর দাড়ি রাখছি না। দাড়িটাই কাল হয়েছে!'

আমরা বললাম, 'ওম শান্তি বলছ কেন তিনুকাকা?'

'বুঝলি না, বাঁধন আলগা হল। দাড়িটাই যত নষ্টের গোড়া।'

সেই থেকে আছেন তিনুকাকা। কাকিমা না আসা পর্যন্ত ছাড়া হবে না। কাকিকে আনতে লোক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা দশ-বারো ক্রোশ পথ। একদিনে যাওয়ার উপায় নেই। খালবিল নদী টিলা ডিঙিয়ে যেতে হয়। কোনো সড়কপথ নেই। কাকিমা ডুলিতে আসবেন। আর গেলেই তো কাকিমা আসতে পারবেন না। সংসারে একা মানুষ। এক বুড়ি মাসি থাকে সঙ্গে। বাড়িতে গৃহদেবতা আছে। চাকর-বাকর আছে। সবাইকে সব বুঝিয়ে তবে না আসা! কাজেই কাকিমা না আসা পর্যন্ত আমাদের কাজ তিনুকাকাকে পাহারা দেওয়া।

তিনুকাকা মাঝে মাঝে খুবই চটে যেতেন-'এই তোরা যা। আমি মাঠে যাব।'

'আমরাও যাব।'

'তোরা কি আমার হাগা-মোতা বন্ধ করে দিবি!'

দুদুকাকা বলেছে, 'ও যাই বলুক সঙ্গে থাকবি।' রাতে পাহারার ভার পঞ্চুকাকার। দক্ষিণের ঘরে আমরা চার ভাই। বড়দা মেজদা একপাশে। তিনুকাকা মাঝখানে। আমি আর শান্তি একপাশে। নীচে দরজার পাশে পঞ্চুকাকার বিছানা। দরজায় তালা দেওয়া।

'অ পঞ্চু শুনছ!' মধ্যরাতে তিনুকাকার গলা।

'আজ্ঞে।'

'কৃপা হোক!'

কৃপা হোক মানে দরজার তালা খুলে দাও।

পঞ্চুকাকা দরজার তালা খুলে হ্যারিকেন উসকে সঙ্গে সঙ্গে আছে।

সারা রাত এই চলে। পঞ্চুকাকা শোয়। ঘুম লেগে আসতে না আসতেই, আবার ডাক, 'পঞ্চু কৃপা হোক!'

এভাবে সারারাত চললে কাঁহাতক সয়। সহসা খেপে গিয়ে পঞ্চুকাকা বলে ফেলল, 'কৃপা করে হাগা-মোতার কাজটা ঘরেই সারুন কর্তা। আর পারি না।'

কাকা জামা তুলে পঞ্চুর হাতখানা পেটে চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, 'বুঝতে পারছ?' কাকার বড়ো কাতর মুখ।

'কী?'

'কান পেতে শোনো!' বলে কাকা দু-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন।

পঞ্চুকাকা কান পেতে শুনতে গিয়ে খটাস করে লাফিয়ে উঠল।-'উরে ব্বাস! আল্লার গজব চলতাছে!'

'হ্যাঁ গজব। সাধে কি বিবাগী হই পঞ্চু। বড়ো কষ্ট! পেটে ঐরাবত ডাকছে।'

আমরাও ঘুমাতে পারছি না! পেটে আল্লার গজব-কী ব্যাপার, তাজ্জব বনে গেছে পঞ্চুকাকা। পেটে এমন দুরমুস চলছে-আর কর্তা এত নির্বিকার! আমরাও হতবাক, পেটে ঐরাবত ডাকে কেন?

বড়দা বলল, 'পঞ্চুকাকা, কী হয়েছে। ঐরাবত ডাকে কেন?'

পঞ্চুকাকা বলল, 'পেটখানা দেখো, ফেঁপে ঢোল। ভুটভাট-খই ফুটছে জালার ভিতর। তোদের তিনুকাকার পেট ফাঁসল বলে!'

আমরা আর কান পাততে সাহস পেলাম না। পেট ফেঁসে গেলে ঊর্ধ্বগতি।

বড়দা বলল, 'দুদুকাকাকে ডাকি!'

সহসা তিনুকাকা ধড়ফড় করে উঠে বসলেন, 'না না, দাদারে ডাকবি না! ঘুমাচ্ছে উঠলেই খেপে যাবে।'

পঞ্চুকাকা বলল, 'হজমের বড়ি খান। দিচ্ছি।'

'হজমের বড়ির কম্ম নয় ওটা পঞ্চু! সাধে কি গৃহছাড়া হই। একখান পুঁটলি আছে আমার জ্যাবে। সর্বক্ষণ পাহারা দেও ভালো। কিন্তু হাগা-মোতা নেশা-ভাঙ দুই মানুষের বড়ো প্রয়োজনীয় বস্তু। তোমাদের বউমার সেটা আদপেই মালুম হয় না। আলসেতে টিকা গুঁজে দাও একখানা পঞ্চু!' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোরা বসে থাকলি কেন! ঘুমা। কলকে জ্বালাও, দেখবে ঐরাবতের ডাকাডাকি সব বন্ধ।'

আমরা একসঙ্গে সটান শুয়ে পড়লাম। ঘুমের ভান করে পড়ে আছি।

পুঁটুলিটা খুলে কী বের করছেন তিনুকাকা। পঞ্চুকাকা খুবই জব্দ। সারারাত জাগিয়ে রাখলে কে না জব্দ হয়। কানে কানে পঞ্চুকাকার কী যেন বললেন আর তখনই পঞ্চুকাকা তাড়াতাড়ি একখানা ছোটো কাঠ এবং ছুরির বন্দোবস্ত করতেই কাকা ব্যোম শংকর বলে আসন পিঁড়ি করে বসে গেলেন। নিবিষ্ট মনে কাঠে কুচি কুচি করে কী কাটলেন। তারপর তালুতে রেখে ঘষলেন অনেকক্ষণ-তারপর ছোটো একখান নাড়ুর মতো বস্তু কলকেয় বসিয়ে জ্বলন্ত টিকা গুঁজে ফুঁ দিতে থাকলেন। হ্যারিকেন জ্বলছে। পঞ্চুকাকা নিবিষ্ট মনে দেখছে। সত্যি আল্লার মেহেরবানি না থাকলে কর্তার চোখ-মুখ এমন অপার্থিব হবার কথা নয়। আসন পিঁড়ি হয়ে ঘাড় নীচু করে ফুস ফুস ফুস-ফটাস। যেন মাথার খোপড়া উড়ে গেল। তারপর কতক্ষণ একভাবে বসেছিলেন আমরা জানি না। কখন এসে আমাদের মাঝখানে শুয়েছেন জানি না, কখন ঘুমিয়েছেন জানি না-আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি, কাকা নাক ডাকাচ্ছেন, কখন ঘুম থেকে উঠবেন তার কোনো লক্ষণ নেই।

পঞ্চুকাকা আর দুদুকাকা বাইরের উঠোনে তিনুকাকাকে নিয়ে কী সব বলাবলি করছেন! দুদুকাকা বললেন, 'তুই গিয়ে মাকে বুঝিয়ে বল।' পঞ্চুকাকা বলল, 'না আপনে কর্তা।'

দুদুকাকা বললেন, 'না, তুই যা। তুই গিয়ে বুঝিয়ে বললে মা বুঝবে।'

পঞ্চুকাকা বলল, 'আমার বুক কাঁপছে কর্তা।'

'কাঁপুক। তবু যা। তুই তো আমার সব কথা রাখিস।'

ঠাকুমা আমার খাণ্ডারনি বোঝা যায়। সবার অবস্থা ত্রাহি মধুসূদন করে ছাড়েন। ঠাকুমা মুড়ির ধান বের করে দিচ্ছিলেন তখন। পঞ্চুকে অসময়ে অন্দরে দেখেই বললেন, 'কী রে এখানে কেন!'

'কর্তা-মা একখান কথা ছিল! বউদিমণি আসছেন। বড়ো সার কথা। বউদিমণিরে ধরিয়ে দেবেন। না দিলে তিনু কর্তা আবার বিবাগি হবে।'

'হতচ্ছাড়া আবার বিবাগি হবে বলছে! কীসের অভাব! দাদা কি কিছু কমতি রেখে গেছে! বউমা আমার লক্ষ্মী প্রতিমার মতো দেখতে।'

'তা কর্তা-মা তবু হয়।'

'হয়। হতে দিচ্ছেটা কে! কোনো কাম কাজ নেই তোর! নিজের কাজে মন দে।'

পঞ্চুকাকা ফিরে যাচ্ছিল।

দুদুকাকা হাত টেনে ধরলেন। 'বললি!'

'শুনতে চাইল না। কাম কাজে ফাঁকি দিচ্ছি ভাবছে।'

'সে ভাবুক। তুই আয়। সঙ্গে নাহয় আমি থাকছি!'

'চলেন তবে।' গোমড়া মুখে পঞ্চুকাকা দুদুকাকার পাশে হাঁটছে।

'মা, পঞ্চু বলছিল...'

'সে তো অনেকক্ষণ থেকেই বলছে।'

হঠাৎ দুদুকাকা খেপে গেল। বলল, 'ঠিক আছে, আমাদের কী! এবার তোমার ভাইপো বিবাগি হলে, আমরা নেই। বাড়াবাড়ি করলে, বিলাপ জুড়লে, আমি পঞ্চু দু-জনেই বিবাগি হয়ে যাব। তখন বুঝবে ঠ্যালা।'

আমরা ঠাকুমার চারপাশে ঘিরে আছি। আমরাই একমাত্র ঠাকুমাকে ভয় পাই না। বললাম, 'কাকারা বিবাগি হয়ে গেলে কী হবে ঠাকুমা! আমরা খুঁজতে যাব কী করে!'

'যা হবার হবে। যার কেউ নেই তার কে দেখে!'

দুদুকাকা পঞ্চুকাকার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তিনুর বউকেই বলে দেব।'

'কী বলবি!'

'তিনুর নেশা ভাঙের অভ্যাস আছে। বউমা নেশা করতে দেয় না। চোখে চোখে রাখে বলে বাড়ি থেকে পলাতক। বউমাকে বলে দিয়ো, যেন একটু আধটু নেশাভাঙ করতে দেয়। না দিলে পেট ফেঁপে বাড়িতেই একদিন টেঁসে যাবে।'

'তিনু নেশা করে? কী নেশা!'

দুদুকাকা মাথা চুলকে বলল, 'নেশা! মানে গাঁজা খায়!'

'হতচ্ছাড়া গাঁজা খায়। ও আমার কী হবে!' তারপরই বলল, 'পালায়নি তো?'

'না। ঘুমাচ্ছে।'

'ঘুমাচ্ছে! ঘুম আমি বের করছি। কখন রোদ উঠে গেছে এখনও ঘুমাচ্ছে!' বলেই ঝাঁটা নিয়ে ভাইপোকে জাগাবার জন্য ছুটতে গেলে, পঞ্চুকাকা যেভাবে তিনুকাকার দাড়ি ধরে ঝুলে পড়েছিল তেমনি আমরা চারভাই সবাই মিলে ঠাকুমার কোমর ধরে ঝুলে পড়লাম। ঠাকুমা আর এতটুকু নড়তে পারল না। তিনুকাকার নাম করে হাওয়ায় ঝাঁটা ঘোরাতে থাকল। আর বিলাপ, 'হায় আমার বউমার কপালে শেষে এই লেখা ছিল রে!'

ফকরা নিশি

বড়োমামা বললেন, 'তপু, তুই ঠিক চিনে যেতে পারবি তো?'

'হ্যাঁ মামা, পারব। আমি তো বড়ো হয়ে গেছি।'

বড়োমামা হাসলেন। তপুর এই স্বভাব। একটু পাকা পাকা কথা বলে।

গরমে কিংবা পুজোর ছুটিতে তপুকে রেখে আসে গোপাল। ছুটি ফুরোলে তপুর কাকা আবার দিয়ে যায়। এবারে গোপালের শরীর ভালো না। বড়োমামা নিজেও যেতে পারতেন। কিন্তু এত বড়ো সংসার জমিজমা গোরু-বাছুর হাট-বাজার বলতে তিনিই সব। অথচ ছুটি পড়ে গেছে। ছেলের আর একদম মন টিকছে না। সঙ্গে লোক দেবারও কোনো সুরাহা করতে পারছেন না-কী যে করেন। তপুকে দেখলেই বুঝতে পারেন মায়ের জন্য তার ভারি কষ্ট হচ্ছে। ওর যাওয়া দরকার। তপু তখনই সাহস করে বলে ফেলেছে, 'এই তো সনকান্দা পার হলে গরিপরদির মঠ। আমি মামা মাঠে নেমে ঠিক মঠ-বরাবর হাটব। তারপর দেখতে পাব সেই বাঁশের লম্বা সাঁকো। সাঁকো পার হলেই তো লাধুরচরের মন্দির। তারপর নদীর পারে পারে হাটখোলা চলে যাব।'

তবু বড়োমামা বললেন, 'পাট খেত সব বড়ো হয়ে গেছে। সাবধানে যাবি। কেউ কিছু দিলে খাবি না। হাটখোলা গেলে গাঁয়ের কেউ-না-কেউ থাকবে। ঠিক বাড়ি চলে যেতে পারবি।'

তপুর মামারা খুব গরিবও না, বড়োলোকও না। গণ্যমান্য করে সবাই। গ্রামের হাইস্কুলে বড়োমামার খুব প্রভাব। স্কুল ছুটি হলে তপু একদণ্ড এখানে আর থাকতে চায় না। মামার অনুমতি পেয়ে সে খুব সকাল সকাল দুটো সেদ্ধভাত, মাছভাজা খেয়ে বের হয়ে পড়ল। হাতে ছোটো টিনের বাক্স, হাফ-হাতা শার্ট গায়ে, খাকি প্যান্ট পরনে। ছোটো ছেলেটা গাঁয়ের পথে মাঠে নেমে যাবার আগে বড়োদের মতো চালে ঠাকুরঘরের দরজায় টিপ টিপ মাথা ঠুকল দু-বার। যা সব ভয়! যেমন, সে ভয় পায় নিশির ডাককে, ভয় পায় গরিপরদির মাঠে বড়ো একটা অশত্থ গাছকে। এবং মানুষের চেয়ে এই সব অদৃশ্য আত্মাদের সম্পর্কেই তার ভয় বেশি। যে-কেউ তাকে ভেড়া ছাগল গোরু বাছুর বানিয়ে ফেলতে পারে। যেমন খুশি তারা বগলে করে কোথাও নিয়ে গিয়ে তাকে জলে ডুবিয়ে মারতে পারে। অথবা সারা জীবন সে একটা গাছের নীচে পাথর হয়ে থাকবে। মা-বাবা টেরও পাবে না, তাদের নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটা বাড়ির পাশেই গাছের নীচে পাথর হয়ে আছে।

এমন সব আজগুবি চিন্তা-ভাবনা মাঠে নামতে-না-নামতেই পেয়ে বসল। কেমন একটা ভয় ভয়, একা একা কখনো সে এতদূর রাস্তা হেঁটে যায়নি। অপরিচিত গ্রামের মাঠে পড়ে সে খুব সতর্ক হয়ে গেল।

গ্রীষ্মের দিন বলে সব পাট গাছ মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। আকাশে আবছা মেঘের ছায়া। কোথাও দূরে দিগন্তবিস্তৃত আউসের জমি। ধান খেতে মাথলা মাথায় নিড়েন দিচ্ছে চাষিরা। তারা সমস্বরে গান গাইছিল। সবুজ মাঠ এবং চাষিদের এই প্রিয় গান তাকে বেশ ভালোই রেখেছে। এখন সে যেন প্রায় পাখা থাকলে মায়ের কাছে উড়ে যেতে পারত। মা বাদে পৃথিবীর মানুষের আর কী থাকে, তা সে তখনও জানে না। ছোটো ভাই পিলু তো ঠিক পুকুরপাড়ে সকাল-বিকেল দাঁড়িয়ে আছে-দাদাকে দূরের মাঠে দেখেই দৌড়োবে বাড়িতে, 'মা, দাদা আসছে, গোপালদা আসছে।' এবারে সঙ্গে গোপালদা নেই। সে একা। বাবা-কাকারা ভীষণ অবাক হয়ে যাবে, এতটুকু ছেলে ঠিক চার ক্রোশ পথ চিনে চলে এসেছে। বলবে, 'তোর সাহস তো কম নয়। ভয় করল না?'

একটুও না। এবং সে যত হাঁটছে, তত নিজের সঙ্গে কথা বলছিল। আম জাম অথবা জামরুল গাছটায় সে গিয়ে ঠিক পেয়ে যাবে থোকা থোকা ফল। গরমের ছুটিটা তার ভারি মনোরম। পুকুরে মাছ ধরা, আম কুড়োনো সারাদিন গাছতলায়। জাম পেকে গেছে সব। না পাকলে সবুজ এবং ম্যাজেন্টা রঙের গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকবে-তপু কখন ফিরবে। বাড়ির বড়ো ছেলেটা গাছের নীচে ঘুরে না বেড়ালে তাদের ভালো লাগবে কেন!

তপু যতটা পারছে পাটের জমি সব এড়িয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে গেলে বড়ো গোলকধাঁধায় পড়ে যেতে হয়। পথ খুঁজে বের করা যায় না। কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। জমির পর জমি কতদূরে চলে গেছে। শুধু পাটের জমি। সবুজ মেঘের মতো অথবা নীল ঢেউয়ের মতো। ওরা আছড়ে পড়ছে আকাশের নীচে। সে যেখানে যত ধানের খেত পাচ্ছে, অথবা তরমুজের খেত, তার পাশে পাশে হাঁটছে। কখনো দূরের মঠ দেখা যাচ্ছে, কখনো দেখা যাচ্ছে না। পাট গাছগুলো সহসা আড়াল করে ফেলছে মঠটাকে।

পাট গাছগুলোর পাশে পাশে সরু সব আল। ঘাস সবুজ। কতরকমের পোকা উড়ছে। গুমোট গরম। তাকে কিছুটা পথ বেশি হাঁটতে হচ্ছে, তবু কিছুতেই খেতের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে না। ঢুকে গেলেই পাট গাছগুলো তাকে ঢেকে ফেলবে। প্রায় নদীর জলে ডুবে যাবার মতো। তখন সুযোগ বুঝে ওরা খুঁজে বেড়াবে তাকে। সে নিশির ডাক শুনতে পাবে। 'তপু নাকি রে! কোথায় যাচ্ছিস, ঠিক যাচ্ছিস না। আমার সঙ্গে আয়। আমি তোকে বাড়ি পৌঁছে দেব।' তাকে লোভ দেখিয়ে কাছে নিয়ে যাবে, সেই যে ছোটো হাত অথবা কঙ্কাল শরীরে ছুঁইয়ে দিলেই ছাগল গোরু ভেড়া। ওকে ভেড়া বানিয়ে হাটে-বাজারে বিক্রি করে দিলেও কিছু করার থাকবে না। কে জানে, তার বাবা-কাকা ভেড়াটা কিনে নিয়ে তারপর... না, তারপর সে আর ভাবতে পারে না, শরীর তার ভয়ে কেমন হিম হয়ে আসছিল। সে লোকজন দেখলে, এমনকী গোরু ছাগল দেখলেও, বিশ্বাস করছে না। বেশ ঘাস খাচ্ছে, আসলে ওগুলোর রূপ হয়তো অন্যরকম। সব চর এরা। হ্যাঁ, যাচ্ছে তপু, তোমরা সব নজর রাখো। আর তখনই সে দেখতে পেল, দূরে কোনো মঠ নেই, আকাশের প্রান্তে কোনো ত্রিশূল ভেসে নেই-কেবল জমি আর জমি, পাটের জমি। যেন পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক টপকে না যেতে পারলে সে আর মঠের চুড়ো দেখতে পাবে না। আর তখনই দূরে অনেক দূরে কে যেন তার নাম ধরে ডেকে উঠল। 'অঃ তপু কর্তা, কোনখানে যান! ওডা তো পথ না। খাড়ন। আমি আপনেরে নিয়া যামু।'

সে পেছন ফিরে দেখল, হোগলার জঙ্গল থেকে অতিকায় দানবের মতো ভয়ংকর কিছু একটা বার হয়ে তাকে ধরবার জন্য ছুটে আসছে। মানুষ না, অথচ মানুষের মতো কথাবার্তা। সারা শরীর কালো পোশাকে ঢাকা। দাড়িতে মুখ দেখা যায় না আর সেই কটর কটর মালা-তাবিজের শব্দ। যেন হুড়মুড় করে তার দিকে ধেয়ে আসছে। আতঙ্কে তার গলা-বুক শুকিয়ে আসছে। ভয়ের সময় আর কে আছে! না, কেউ না। খানিক দূরে সেই যে ফেলে এসেছিল তরমুজের জমি, লঙ্কার গাছ আর মাথলা মাথায় চাষিরা, কেউ নেই। কেবল

মাঠ ভেঙে ধেয়ে আসছে লম্বা তাল গাছের মতো একটা ফকির। রাত হলে ওর চোখ ঠিক জ্বলে উঠত দপ করে। দিনের বেলা বলে নিশির সেই প্রবল চোখের আগুন সে দেখতে পাচ্ছে না।

আর যায় কোথায়, সামনে কোনো পথ না পেয়ে পাট গাছের সেই ঘন জঙ্গলের ভেতর তপু সেঁদিয়ে গেল। যত দৌড়োয়, তত পেছনে কে যেন ডাকে, 'খাড়ন, আমি আইতাছি। দৌড়ান ক্যান!'

লম্বা লম্বা পাট, যেন শেষ নেই। আলের ওপর দিয়ে সে দৌড়োচ্ছে। গাছ থেকে সব পাতা ঝরছে, হাওয়ায় উড়ছে। গাছের নীচে কোনো আগাছা নেই। শুধু পচা পাট পাতা, আর বৃষ্টির জলে পচা পাট পাতার গন্ধ। সে কোনোরকমে পাটের জমি পার হয়ে গেলে ধান খেত পাবে, এবং দূরের মঠ দেখতে পেলে সে আবার তার সব সাহস ফিরে পাবে। অথচ সে সোজা দৌড়োতে পারছে না। সে কেবল ঘুরে ঘুরে মরছে। সে গাছের নীচে নদীর ঢেউয়ের মতো ভেসে যাচ্ছিল। হাঁসফাঁস করছিল গরমে। সবুজ ঘন অন্ধকারে তার চোখ ঘোলা হয়ে উঠছে। তখনও দূরে কেউ যেন ডেকে যাচ্ছে, 'কই গ্যালেন, আমি আইতাছি।' সে এবার এলোপাথাড়ি ছুটছে। গাছের জন্য ছুটতে পারছে না। কেমন আটকে যাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে কখনো তারপর যখন বুঝতে পারছিল, এভাবে ছুটলে সে আর জীবনও মঠের চুড়ো দেখতে পাবে না, তখন সে বসে পড়ল। এখন আর কোনো ডাক শুনতে পাচ্ছে না, কেবল কীটপতঙ্গের আওয়াজ, বাতাসে পাট গাছ দুলছে। তার কান্না পাচ্ছিল। এক আশ্চর্য গোলকধাঁধায় সে পড়ে গেছে। তার ওপরে ভ্যাপসা গরমে মরে যাচ্ছিল। জামা খুলে ফেলল, পায়ের কেডস জুতোও। হাঁটতে গেলে লাগছে। সারা শরীর ছিঁড়ে ফুঁড়ে গেছে। কোথায় সে চলে এসেছে, তা ঠিক বুঝতে পারল না।

কখনো সে বসে থাকল গাছের নীচে, কখনো ঘাসের আলে শুয়ে থাকল। আর সে পারছিল না। সে বুঝতে পারছিল, নিশির হাত থেকে তার আর নিস্তার নেই। সবই নিশির খেলা। তখন কপাল ঠুকে সোজা একমুখো হাঁটতে থাকল। মাথা ঠান্ডা রেখে সে কিছুটা হেঁটে এসেই অবাক। সে এসে গেছে সেই বড়ো সাঁকোর নীচে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত এখন শুধু ধানের জমি, অনেক পিছনে পড়ে আছে মঠের চুড়ো। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আর তখনই সাঁকোর নীচে সেই হাঁক-

'কর্তা তবে আইলেন। যাইবেন কই। জানি ঠিক শেষতক আইসা পড়বেন। বইস্যা আছি।' ভূতুড়ে লোকটা সাঁকোর নীচে বসে খুশিতে ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে।

তপুর সারা শরীর ঠান্ডা মেরে যাচ্ছে। তবু শেষবারের মতো রক্ষা পাবার জন্য সে উলটোমুখে ছুটতে গিয়ে দেখল সাদা ফ্যাকাশে দুটো হাত ক্রমে এগিয়ে আসছে। 'কই যান!' ঠিক সাঁকোর মতো লম্বা হয়ে যাচ্ছে হাত দুটো।

শরীরে আর তার বিন্দুমাত্র সাহস নেই। টিনের বাক্সটা হাত থেকে পড়ে গেল। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ। পা অসাড় হয়ে গেল। চোখে সর্ষেফুল দেখছে কেবল। বুঝতে পারছিল, সে মূর্ছা যাচ্ছে।

'তপু কর্তা! অঃ তপু কর্তা!'

কতকাল পরে যেন ও টের পাচ্ছে, কেউ তাকে ডাকছে জলের ঝাপটা দিচ্ছে চোখে-মুখে। আবার ডাকছে, 'অঃ তপু কর্তা, আমি ফকরা। ওঠেন। চোখ খুলেন। আল্লা, এইডা কী হইল।'

তপু পিটপিট করে তাকাচ্ছে।

'আমি ফকরা। আপনের মামায় কইল, ফকরা কই যাস?'

তপু সেই কিম্ভূতকিমাকার মানুষটাকে দেখে ফের ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছে।

'কইলাম যামু হাটখোলায়।'

তপু মনে মনে বলল, 'বুঝি, তোমার শয়তানিটা বুঝি। ভালোমানুষ সাজতে চাও।'

'কইলেন, যাস তো তপুরে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবি। তাড়াতাড়ি যা। হাতে টিনের সুটকেস। রাস্তায় পাইয়া যাবি। ওঠেন। আপনের মায় আমারে চিনে। ডর নাই।'

তপু মার কথা শুনে কেমন সাহস পেয়ে গেল। বলল, 'আমি তোমাকে ঠিক ধরে ফেলেছি। তুমি নিশি।'
ওর কথা শুনে ভয়ংকর লোকটা কেমন হাসতে চেষ্টা করল। পারল না। বলল, 'মাইনসে কত কথা কয়। বাদ দেন অগো কথা। আমি ফকিরা। ফকরা। আপনার মামার বান্দা লোক।'
তপু এবার আরও জোর পেয়ে গেছে। মামার বান্দা লোক, মামদো ভাই। বড়ো মামার ভূতের কারবার-টারবার আছে সে জানত না। সে বলল, 'তুমি আমার পিছু নিয়েছ কেন?'
'চলেন, বাড়ি দিয়া আসি।'
'তুমি যাও। আমি একা যেতে পারব। আমার পিছু নেবে না।'
'রাইত বিরাইতে একা ডরাইবেন।'
তপু বুঝতে পারল, সূর্য অস্ত গেছে। শুধু চারপাশে সবুজ মাঠ। বাঁশের সাঁকোটা উটের মতো মুখ তুলে আছে আকাশের গায়ে। লোকজন সে একটা দেখতে পাচ্ছে না। দুটো-একটা নক্ষত্র আকাশে সে ফুটে উঠছে দেখতে পেল। সারা মাঠে আশ্চর্য কীটপতঙ্গের আওয়াজ। মাঠ ভেঙে ক্রোশখানেক পথ হেঁটে গেলে হাটখোলা। সে তবু বলল, 'তুমি যাও। তোমার সঙ্গে যাব না।'
'এই দ্যাখেন,' বলে সে তার লম্বা কালো আলখেল্লা খুলে ফেলল। গলার সাদা লাল নীল পাথরের মালা খুলে ফেলল। পরনে শুধু লুঙি, খালি গা। বলল, 'আমি ফকরা। ডর নাই, চলেন।'
সে তবু বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রায় কঙ্কালসার ভূতের মতো চেহারা। বুকের হাড় গোনা যায়। সাদা ফ্যাকাশে। একগাল দাড়ি। সুরমা টেনেছে বুড়ো চোখে। জবা ফুলের মতো ড্যাবড্যাব করছে ঘোলা চোখ দুটো।
ভয়ংকর লোকটা বলল, 'মুড়ি খাইবেন? চোখ-মুখ কই গ্যাছে গিয়া। খান।'
তপু সরে দাঁড়াল। ছুঁয়ে দিলেই সে কিছু একটা হয়ে যাবে। নুড়ি পাথর। বগলের থলেতে পুরে নিতে একটুও অসুবিধা হবে না।
এবারে হি-হি করে হাসল ফকরা নিশি। গালে মুড়ি ফেলে মুড়মুড় করে খেল। ছোট্ট নেকড়ায় বাঁধা মুড়ি। হাঁ করে খাচ্ছিল। দু-চারটে দাঁত আছে। বাকি নেই। জিভ নেড়ে নেড়ে খাচ্ছে।
তপুর মনে হল, ফকরার ঠিক আলজিভ নেই। নিশি হলে থাকবে না। সে বলল, 'হাঁ করো।'
ফকরা হাঁ করে থাকল।
'তোমার আলজিভ কোথায়?'
'দ্যাখেন।'
তপু দেখল। খুব সতর্ক থাকছে সে। সে আঙুলে দেখল লোহার আংটি। লোহা ধারণ করলে ভূত-টুতের উপদ্রব কম থাকে। কিছুটা সে যেন ফকরাকে বিশ্বাস করতে পারছে।
তখন প্রায় ফোকলা দাঁতে হেসে ফকরা বলল, 'পাটালি গুড় আছে। খাইবেন?'
মুড়ি-পাটালিগুড়ের কথায় তপুর জিভে প্রায় জল এসে গেল। কখন সেই সকালে বের হয়েছে। এতক্ষণ খিদে তেষ্টা কিছু ছিল না। এখন আবার সব পাচ্ছে। খিদেয় পেট জ্বালা করছে। সে তবু বলল, 'না খাব না।'
'খান, খাইলে বল পাইবেন।'
সে চিৎকার করে বলল, 'না, খাব না।'
ফকরা হাত জোড় করে বলল, 'ঠিক আছে, আর কমু না।'
তপু এবার গলা উঁচিয়ে বলল, 'তোমার থলেতে কী?'
ফকরা বলল, 'মুশকিলাসান আছে, চুমরি গাইয়ের ঝাড়ন আছে। দ্যাখবেন!' বলে সে একটা কালো রঙের মাটির তিনমুখো কুপি বের করল। দু-দিকের দুটো মুখে নেকড়ার সলতে, একটা মুখে কাজল। ভেতরে তেল রাখার আধার। ফকরা সলতে জ্বালিয়ে বলল, 'মুশকিলাসান। ভিক্ষা করতে বাইরে হৈছি।'
তপু বলল, 'থলেতে কী আছে?'

মুশকিল আসানের আলোতে থলে উপুড় করে দেখাল। আবছামতো সারা মাঠে এখন অন্ধকার। আকাশে আরও সব নক্ষত্র। বাতাস শস্যক্ষেত্রে ঢেউ দিচ্ছে। ফকরা এক-এক করে সব দেখাচ্ছে। কাগজের মোড়কে পাটালিগুড়, মুড়ির পুঁটুলি, দুটো বঁড়শির হুক, ছেঁড়া গামছা। সে গামছা ঝেড়ে বলল, 'দ্যাখেন, আর কিছু নাই।'

তপুর সব সংশয় কমে আসছিল। কিন্তু ফকরা নিশি বসে রয়েছে। ওর নীচে কিছু থাকতে পারে। মানুষের হাড়, কঙ্কাল, বাচ্চা ছেলের মুণ্ডু যদি লুকিয়ে রাখে। সে বলল, 'তুমি ওঠো।'

ফকরা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'দ্যাখেন কিছু নাই।'

তপু বলল, 'তুমি বসো।'

ফকরা বসলে আবার বলল তপু, 'তুমি ওঠো বসো।'

ফকরা ওঠবোস করতে থাকল। তপু আর কিছু বলছে না। সে একবার ওপরে একবার নীচে তাকাচ্ছে। ভয়ংকর মানুষটা এখন হাঁপাচ্ছে। তাকে ভারি নির্জীব এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে। নিশিরা হাঁপায় না। ক্লান্ত হয় না।

সে এবার বলল, 'হাঁটো।'

ফকরা হাঁটতে থাকল।

'থলে-টলে নাও।'

সে তার থলে-টলে নিয়ে নিল।

তপু বলল, 'মুড়ি দাও খাই।'

ফকরা মুড়ি আর পাটালিগুড় দিল।

মুড়ি খেতে খেতে তপু বলল, 'তুমি আগে, আমি পেছনে।'

ফকরা ঠিক আগে আগে কুপির আলোতে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। পোকামাকড় কাটতে কতক্ষণ। সময় ভালো না। মুড়ি-গুড় খেয়ে তপুর জলতেষ্টা পেল। বলল, 'জল খাব।'

ফকরা বলল, 'গাঁয়ে গেলে পানি মিলব। নালার পানি খাইলে মন্দ হইতে কতক্ষণ।' তপু বুঝল, লোকটা তবে সত্যি ভালো।

ফকরা নিশি আগে। তপু পেছনে। আর ভয়ডর নেই। ফকরা নিশি এখন সব নানা বায়নাক্কা করছে। বলছে, 'বইনদিরে কমু, কী ওঠবোস করাইছে আপনের পোলায়। খাওয়ান দিতে হইব। পেট ভইরা খামু। কতদিন পেট ভইরা খাই না।'

তপু বলল, 'দেখব তুমি কত খেতে পার।'

'কর্তাগো, অনেক খাই।'

এবং অনেক খায় বলে, অথবা পেট ভরে খেতে পাবে জেনে মনের সুখে অন্ধকার মাঠে সে গান জুড়ে দিল।

ফকরা নিশির মুশকিলাসানের কুপি দুলছিল। আলো দিচ্ছিল পথে। ওরা দু-জন হেঁটে যাচ্ছিল। লোকটা পেট ভরে শুধু খেতে পাবে বলে গলা ছেড়ে কী জোরে গান গাইছে। তপু বুঝতে পারছিল না, কী এক অজ্ঞাত কারণে মানুষটার জন্য তার কষ্ট হচ্ছিল। চোখ দুটো জলে চিকচিক করছে। সে মানুষটার গা ঘেঁষে এখন হাঁটছে। হাঁটতে ভালো লাগছে।

ভূতুড়ে কাণ্ড

সুদামকাকাকে পুজোর সময় মাতঙ্গিনীপিসির মা একটি নতুন কোড়া কাপড় দিয়ে গেল। সুদামকাকা ওঝা মানুষ-পূজা পার্বণে দিলে পুণ্য হয় আমরা এমনই ভেবেছিলাম, পরে বড়ো খটকা দেখা দিল আমাদের। বুড়ি তো হাড়কিপটে, একটা পয়সা গলে না। ব্যাপারখানা কী? বড়দা-মেজদাকে খবরটা দিতে হয়।

'জানিস, বড়দা বুড়ি না চুপিচুপি সুদামকাকাকে একটা নতুন কাপড় দিয়ে গেছে।'

আমরা সমস্বরে পড়ছিলাম। পেনাকাকা আমাদের গার্জিয়ান। বাবা-কাকারা সবাই প্রবাসে থাকেন। বাড়িতে আমর ক-ভাইবোন পিসি ঠাকুমা আর সুদামকাকা মিলে সংসার। সুদামকাকা জমির চাষ-আবাদ দেখেন, গোরু-বাছুর আগলান, এবং আমাদের কোনো কুকর্মের খবর পেলে পেনাকাকার কানে তুলে দেন। আমরা পেনাকাকাকে যত না ভয় পাই, সুদামকাকা তার চেয়ে বেশি।

বড়দার এজন্যে সুদামকাকার উপর ভীষণ রাগ। পালের গোদা সে, আমাদের অপমান হলে তার অপমান।

বড়দা বলল, 'নে পড়। পরে কথা হবে, বসে আছেন।'

আমরা পড়ছি। বড়দা ঠিক টের পেয়েছে, উঠানে সুদামকাকা বসে গামছায় হাওয়া খাচ্ছেন। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্যের গরম। গোয়ালঘরে গোরু-বাছুর তুলে, উঠানে এসে এখন হাওয়া খাচ্ছেন। পেনাকাকা বাড়ি নেই, কবিরাজবাড়ি তাস খেলতে গেছেন। সন্ধ্যা হলেই তাসের আড্ডায় যান, রাত দশটায় ফিরে ঠাকুর বৈকালি দেন। তখন আমাদের পড়তেই হয়। তিনি এসে ঠাকুর বৈকালি দেবার পর একসঙ্গে রান্নাঘরে খেতে বসা।

আমাদের বাড়িটা অনেকটা এলাকা জুড়ে। চার ভিটিতে চারটে টিন-কাঠের ঘর। দক্ষিণ এবং পশ্চিম ঘরের মাঝখানে একটা বড়ো আমলকি গাছ! সেই গাছটার পাশে মুলি-বাঁশের আতা বেড়া, ওটা পার হয়ে আর একটা উঠোন, সেখানে ঢেঁকিঘর নিরামিষ আর আমিষঘর, কটা পেয়ারা গাছ, তার পেছনে জাম-জামরুলের বাগান, খাল এবং তারপর ঘন মোত্রাঘাসের জঙ্গল, বলতে গেলে আমাদের গ্রামের চারপাশটাই কেমন গভীর বনজঙ্গলে ঢাকা, সঙ্গে আছে বড়ো বড়ো ছাড়া ছাড়া বাড়ি, সেখানে সব প্রাচীন গাছ।

ফলে রাতে আমরা একটু বেশি সুবোধ বালক হয়ে থাকি। কী জ্যোৎস্নায়, কী অন্ধকারে আমরা রাতে কেউ একা বের হতে সাহস পাই না। বড়দা সঙ্গে থাকে। কিংবা সুদামকাকা। পড়ার ঘরেই আমাদের শয়ন।

আমরা তিনজনই পানাম স্কুলের ছাত্র। আমরা বড়ো হয়ে গেছি। মা-কাকিদের কাছ থেকে আমরা আলাদা হয়ে গেছি। আলাদা ঘরে সুদামকাকার সঙ্গে আমাদের বসবাস।

তাই আমাদের একটাই পড়ার ঘর এবং শয়নগৃহ। নীচে মাদুর পেতে সুদামকাকা শোন। বড়দা যতই সাহসী হোক, আমাদের দু-জনকে নিয়ে শোয়ার সাহস নেই। সুদামকাকা তার দেশের বাড়ি গেলে ঠাকুমা আমাদের সঙ্গে রাতে থাকেন অর্থাৎ আমরা বড়ো হয়েছি, আমি সিকস, বড়দা নাইন, মেজদা এইট, কিন্তু ভূতের ভয়টি আছে ষোলোআনা।

জানালা দিয়ে কুয়োতলা দেখা যায়, আর একটু দূরে গোয়ালঘর, পাশে একটা অতিকায় গাব গাছ, নীচে তার বিশাল পুকুর। রাতের বেলায় সবই কেমন আধিভৌতিক হয়ে থাকে। অথচ সকাল বেলায় এরাই আমাদের কত আপনার। পুকুর সাঁতরে এপার-ওপার হওয়া, গাছের ডাল থেকে পুকুরের জলে ডাইভ দেওয়া সে কী আনন্দ! তখন মনেই হয় না, গাছের ডালে পাতায় ভূতের বাসা কখনো থাকতে পারে। আমরাই তখন বাড়িতে সবার কাছে এক-একটি জলজ্যান্ত ভূতের সামিল।

সুদামকাকাই তো আমাদের সাড়া না পেলেই বলবেন, 'ভূতগুলো গেল কোথায়? একদণ্ডও বাড়ি থাকে না। পড়া হলেই মাথায় যত রাজ্যের এসে ভূত চাপে।'

পেনাকাকার তখন কড়া হুকুম, 'যা খুঁজে আনগে। যেখানে পাবি ভূতগুলোকে, কান হিঁচড়ে টেনে আনবি।'

কিছুদিন আগেও এরকম রেওয়াজ ছিল আমাদের এমন ভাবে ধরে আনার। তবে বড়দা ক্লাস নাইনে উঠে যাওয়ায় তার আত্মমর্যাদার বিকাশ ঘটেছে। সঙ্গে আমাদেরও। এখন যিনি অর্ডার কেরি আউট করবেন তিনিই বড়দার কান ধরতে লজ্জা পান। শত হলেও মনিবের পুত্রসন্তান। সেই রণহুংকারও আর শোনা যায় না-'এই উমা, অচল, ভুলু, বেশি বাড়বি তো মাথার খোবড়া খুলে নেব।'

অথবা হয়তো খুঁজেই পাচ্ছেন না। কবিরাজবাড়ির গাছে আমরা ওয়া ওয়া খেলছি। আমরা এক-দু-জন নয়। গাঁয়ের যারা পানাম স্কুলের ছাত্র সবাই। গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে যাচ্ছি, ওয়ারে ওয়া বলছি, নীচ থেকে একজন বলছে, 'কীরে ওয়া পড়বি নাকি ধরবি নাকি-'

তখনই হাঁক-'উমা অচল!' হাঁক শুনলেই টের পাই কখন সাঁজ লেগে গেছে, বাড়ি ফিরিনি।

কাছে এলেই ডাল থেকে ঝুপঝাপ নেমে ছুট, কিন্তু নাগাল পেয়ে যান সুদামকাকা, 'কাছে আয়। ছুটবি না। পেনাকত্তা রেগে আগুন। ওর কোচের কালি কে ভেঙেছে? পিঠে পড়বে, আয়। আমার সঙ্গে চল। কর্তা কত কষ্ট করে কোচটা তুলেছেন উদ্ধবগঞ্জের হাট থেকে-কে ধরেছিল বল!'

আমরা তখন এ-ওর দিকে তাকাই, যে ধরেছে তার নাম জানি। শোল মাছ মারতে গিয়ে কোচটা একটা মরা গাছের গুড়িতে জলের মধ্যে আটকে গেছিল। টানাটানিতে একটা কালি খসে গেছে। কিন্তু আমরা কেউ কারও অপরাধ বাড়িতে প্রকাশ করি না। বড়দার হুকুম। সুতরাং পিঠে বেত পড়বে, চামড়া তুলে নেবে এসব সত্ত্বেও চুপ।

তখন সুদামকাকা খুব ভালো মানুষ হয়ে যান। বলেন, 'কান ধর।'

আমরা কান ধরি।

'কাছে আয়।'

কান ধরেই কাছে যাই।

তখন তাঁর হুকুম, 'হাত নামা।'

আমরা হাত নামাই।

তখন তিনি নিজে আমাদের দু-জনের কান দু-হাতে টেনে হাঁটতে থাকেন। তারপরই মনে পড়ে যায় পেছনের জনটি বেশ নির্বিকারভাবে হেঁটে আসছে। বড়দা লাফাতে থাকে 'শুধু আমাদের দোষ?' অগত্যা সুদামকাকা আমার কান ধরার ভার ওদের দু-জনের উপর ছেড়ে দেন। বলে, 'যে কেউ ওর কান ধরে নাও।'

বড়দা হাত বাড়িয়ে দেয়।

সুতরাং সুদামকাকা বড়দা-মেজদার কান ধরে বাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমার কান বড়দার জিম্মায়।

মেজদা সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মাঝ রাস্তায় এসে।

সুদামকাকা ঠিক টের পায় সব। হাজার হোক ওঝা মানুষ। পাড়াগাঁয়ে টোকা ভূতের উপদ্রব খুব। ওরা কচিকাচা খেতে ভালোবাসে। সুদামকাকার তখন ডাক পড়ে। কেউ কেউ বেঁচে যায়। টোকা ভূত নাকি, তার মন্ত্রেতন্ত্রে, সূতিকা ঘরের ত্রী-সীমানায় ঢুকতে সাহস পায় না।

এমন যে মানুষ, তাঁর পক্ষে মেজদার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার কারণ অনুমান করা আদৌ কঠিন না। তেনার তখন হুকুম, 'এই উমা, তুই তো ভুলুর কান ধরে অনেকটা টেনে এনেছিস, এবার অচলকে দে, সে ধরুক।'

অর্থাৎ বাকি পথটা মেজদার পালা। মেজদা আমার কান ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

মুশকিল, বড়দা-মেজদাকে সুদামকাকা যতটা না জোরে কান টেনে নিয়ে যায় তারা আমাকে তার চেয়ে বেশি জোরে টানে। কানে এত লাগে যে, না বলে পারি না, 'দাঁড়াও, বলে দেব।'

'কী বলে দিবি?'

'বুড়ির বাতাবি লেবুর গাছ থেকে যে লেবু চুরি করি বলে দেব।'

দু-জনে এবার ঘাবড়ে যায়। বছর বছর একই নালিশ! বৈশাখ-জৈষ্ঠ্যে কচি বাতাবি লেবুর ফুটবল খেলা হয় আমাদের কাছারিবাড়িতে। বড়দা দলের ক্যাপ্টেন। ফি বছরই বুড়ির গাছের শেষ লেবুটা পর্যন্ত চুরি করা হয়। ধরতে পারে না।

গাছ কিন্তু শুধু বুড়ির বাড়িতেই নেই। প্রায় সবার না হলেও বেশির ভাগ বাড়িতে বাতাবি লেবুর গাছ আছেই,-সব ঠিকঠাক থাকে। কেবল বুড়ির গাছেই লেবু থাকে না। আর দিনরাত বড়ির শাপমন্যি,-'সব ওলা-ওঠা হয়ে মর। বংশে নির্বংশ হবি। এই সব গালাগালে আমাদের কিছু হয় না, ওসব হজম করতে শিখে গেছি।'

পেনাকাকাকে বুড়ি তাই নালিশ দিয়েছে। পেনাকাকা সবাইকে ডেকে বলেছে, 'তোরা নিস।'

ঘোষেদের বাড়ির নন্দর এককথা, 'আমরা নেব কেন? আমাদের গাছ আছে না। দাদু নিজে নামিয়ে দেয়।'

তা নন্দ হলগে প্যারি ঘোষের নাতি। সে যদি বলে তার গাছের, কার সাহস আছে বলে, না মিছে কথা। বুড়ি কিছুতেই বের করতে পারে না কে নেয়। পেনাকাকা একসময় রেগে গিয়ে বলেন, 'পিসি, ওদের কী দরকার তোমার গাছের লেবু নেবার? ওদেরই তো মেলা গাছ আছে।'

ফলে বাতাবি লেবু চুরির বিষয়টি বুড়িকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করতে বাধ্য করিয়েছে। এবারে সারাদিনমান গাছের নীচে বসে থাকে।

কাজটি যে বড়দা-মেজদার, সেদিনই বোধ হয় সুদামকাকা টের পেয়েছিলেন। শত হলেও ওঝা মানুষ আমার ওই কথাটুকু থেকেই ধরে নিয়েছিলেন, এই তিন হনুমান ছাড়া আর কারও কাজ নয়।

বড়দার অঙ্ক মিলছে না। পড়ার ইচ্ছা না থাকলে বড়দা অঙ্কের খাতা নিয়ে বসে।

তখনই উঠোন থেকে হাঁক আসে, 'এই উমা তোর গলা পাচ্ছি না কেন?'

বড়দার সাফ জবাব, 'অঙ্ক করছি।'

বড়দার দেখাদেখি আমিও অঙ্ক খাতা বের করে অঙ্ক করতে শুরু করলাম।

আবার হাঁক, 'এই ভোলা গলা পাচ্ছি নে কেন?'

'অঙ্ক করছি।'

মেজদাও বাদ যায় কেন। তাকে জিজ্ঞেস করলে, সেও বলে, 'অঙ্ক করছি।'

অঙ্কের প্রতি এত আগ্রহ ভালো লক্ষণ না। সুদামকাকা বোধ হয় বারান্দায় উঠে এলেন বলে। তাড়াতাড়ি কথা সারতে হয়।

বড়দা বলল, 'তুই দেখেছিস?'

'আমি শুধু! মা কাকিমা সবাই।'

'বুড়ি এত সদয়!'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মেজদা বলল, 'বুড়ির কুমতলব আছে।'

এবারেও বুড়ির গাছ প্রায় সাফ করে এনেছি। গাছটাতে বাতাবি লেবু প্রায় ঝেপে আসে। এই একটা গাছই আমাদের শিশু মঙ্গল সমিতির সম্বল। দুপুর থেকেই কাছারিবাড়িতে জামবুরা টুর্নামন্টে শুরু হয়। শুধু আমাদের গাঁয়েই নয়, আশপাশের গাঁয়েও। এই টুর্নামেন্টের প্রাথমিক শর্ত খেলতে যাবার সময় ব্যাগ-ভরতি জামবুরা নিয়ে যেতে হবে। না নিলে প্রতিপক্ষকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। কাছারিবাড়িতে খেলি, পঞ্চমীঘাটের টুর্নামেন্টে নাম দিতে হলে প্রাথমিক শর্ত রক্ষা করতেই হয়।

এসব কারণে গাছ একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবারই কথা। বাতাবি লেবুর গাছটিতে এখন যে চল্লিশ-পঞ্চাশটা বাতাবি লেবু আছে, টুর্নামেন্ট শেষ হতে তাও থাকবে না। বুড়ির গাছের জন্য, ফলের জন্যে আমাদের এমনিতেই দয়ামায়া কম। বুড়ির একমাত্র মেয়ে মাতঙ্গিনী থাকে নদীর ওপারে। কালেভদ্রে আসে। কে যে খাবে, বুঝি না। আমরা নিলেই শাপমণ্যি। অথচ হাটে বিক্রি করারও লোক নেই।

পঞ্চমীঘাটের টুর্নামেন্টের আর দুটো খেলা বাকি। এ-দুটো হয়ে গেলে এ বছরের মতো জামবুরা টুর্নামেন্ট খতম। পরে যে দু-চারটে ঝুলে থাকবে তা কাগেবগে খাবে। তবু বুড়ির এমনি হাড়কিপটে স্বভাব, আমাদের হাতে ধরে একটা দেবে না।

বাড়ির নিয়মশৃঙ্খলা খুবই কড়া। সকালে পড়তে বসা। পড়া হলে পুকুরে ঝোপাঝুপ ডুব। তারপর গরম ভাত, ডাল, মাছ ভাজা এই আহার। তারপরই বই বগলে স্কুলের রাস্তা। মাইলখানেক যেতে হয়, ঘোষপাড়া পার হলেই মাঠ। মাঠের দু-দিকে সব ভিটে জমি, তেঁতুল গাছের বন। তার নীচ দিয়ে পথ। আস্তানা পীরের দরগা, নয়া পাড়া পার হলে আবার মাঠ। মাঠের মধ্যেই স্কুল। নানান গাঁ থেকে সব দল বেঁধে আসে। ওইটুকু সময়ই আমরা মুক্ত। বাড়ি এসে দুটো অন্নভোজন, তারপর খেলার মাঠ। সাঁঝ লাগলেই বাড়ি ফেরার নিয়ম। কেবল কোনো টুর্নামেন্ট খেলতে গেলে অনুমতি নিতে হয়।

তাই বাতাবি লেবু অর্থাৎ আমাদের ভাষায় জামবুরা চুরি করার প্রশস্ত সময় যে ঠিক কখন, সুদামকাকার মাথায় আসছে না। ছুটির দিনেও কড়া পাহারা।

কিন্তু একখানা কোরা কাপড় হাড়কিপটে বুড়ির এভাবে আমাদের বাড়ির দ্বিতীয় মনিবকে উপহার দেওয়ায় বড়দা বেশ ঘাবড়ে গেছে। ফিসফিস গলায় বলল, 'কী না কী করবে বুঝতে পারছি না।'

মেজদা বলল, 'কেন?'

'আরে, সুদামকাকার সঙ্গে ভূতেরা কথা কয় জানিস!'

সেটা অবশ্য জানি। সুদামকাকা নীচে শুয়ে রাজ্যের ভূতের গল্প করেন। কত প্রকারের ভূত আছে তার বর্ণনা দেন। কার কি আহার জীবনযাপন সব বিস্তারিত বলেন। আমাদের গাঁয়ের কোন গাছে ব্রহ্মদত্যি থাকে, কোন গাছে গলায় দড়ি দেওয়া কেষ্ট পাল থাকে সব তাঁর জানা। কী কী কারণে মানুষ মরলে ভূত হয় তারও ব্যাখ্যা তিনি আমাদের দিয়েছেন। মরে গিয়ে সবাই ভূত হয় না, কেউ কেউ হয়। এর ফলে সুদামকাকার বিশ্বাসমতো আমরা সেই সব ভূতুরে গাছগুলোকে এড়িয়ে চলি। সাঁঝবেলায় কিংবা রাতে ফেরার সময় গাছটার নীচে এলেই আমাদের গাঁয়ের রোঁয়া ফুলে ওঠে।

বুড়ির গাছটা তার ঠিক বাড়ির মধ্যে নয়। গাছটা কাছারি বাড়ির বাঁশঝাড় পার হলে একটা জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলটা বুড়ি ইচ্ছে করেই গজিয়ে রেখেছে। বুড়ির বাড়ির উপর দিয়ে গাছটার নীচে একটা সোজা পথ চলে গেছে। ওই পথটা দিয়েই বুড়ি গাছের নীচে যাতায়াত করে।

বড়দা বলল, 'নন্দকে কাল বলে দিতে হবে আপাতত জামবুরা টুর্নামেন্ট বন্ধ। উনি টের পেয়ে গেছেন।'

মেজদা বলল, 'কী করে বুঝলি?'

'ক-রাত সুদামকাকা জেগে থাকবে দেখিস।'

'কেন?'

'সন্দেহ জন্মেছে। তার উপর বুড়ির এই দান।'

রাতের খাওয়ার তখনই ডাক পড়ল। আমরা ভাই-বোনেরা কাকা মিলে একপাতে দশ জন লোক, বাইরে সুদামকাকা ঢেকিঘরের বারান্দায় খাচ্ছে। কাল থেকে খেলা বন্ধ।

সাধারণত ভোর রাতে আমরা তিন মূর্তিমান কাজটা সারি। সকালে উঠে সুদামকাকা দেখতে পান ঘরের দরজা খোলা। তখন তিনি ভাবেন আমরা সকাল সকাল উঠে মাঠে চলে গেছি, তারপর হাত-মুখ ধুয়ে মটকিলার ডালে দাঁত মাজতে মাজতে ঘরে ফিরছি। সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। আজ হয়তো ঠিক দুপুর রাত থেকেই জেগে বসে থাকবে। মনটা আমাদের বেশ দমে গেল!

রাতের বেলা শুয়ে আছি। সুদামকাকা বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছেন। তিনিও এবারে শোবেন। শোবার আগে বাড়িটা প্রদক্ষিণ করে মন্ত্র পড়বেন। এতে করে নাকি চোর-ছ্যাঁচোড়ের উৎপাত কমে। বাড়িতে অশুভ প্রভাব ঢুকতে পারে না। বড়দা যে জানলার পাশে শুতে ভয় পায় না, সে শুধু সুদামকাকার ভরসায়। এই একটি জায়গায় কাকাটি সম্পর্কে আমাদের অকাট্য বিশ্বাস গড়ে উঠেছে।

সুদামকাকা শোবার আগে হাই তোলেন। মুখে তুড়ি মারন। গলায় তুলসির মালা, মাথায় লম্বা টিকি, তাতে জবা ফুল বাঁধা থাকে। ওতেই নাকি মনে জোর উৎপত্তি হয়। সুদামকাকা ভূতদের এ-ভাবেই কব্জায় করে রেখেছেন।

সুদামকাকা বালিশে তিন বার চাপড় মারেন শোবার আগে। এটা তাঁর নিত্যকার অভ্যাস। আর বিড়বিড় করেন। রাতে ভূতদের নিয়ে মশকরা করতে গেলে কিছু নিয়মকানুন মানতেই হয়। বালিশে তিন বার চাপড় এবং বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ তারই লক্ষণ।

সুদামকাকা লণ্ঠনটা এবার নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাইরের অন্ধকারে ঝিঁঝিপোকা ডাকছে। জোনাকি জ্বলছে। পেনাকাকার ঘরে দরজা বন্ধের শব্দ পাওয়া গেল। মা-কাকিরা বাসন ধুয়ে ঘরে ফিরছে। কেমন সুনসান হয়ে যেতে থাকল। বিছানায় আমরা উসখুস করছি। ভোর রাতে আজ আর ওঠা যাবে না, খেলা বন্ধ। মেজাজ যেন তিন জনেরই তিরিক্ষি হয়ে আছে।

তখন সুদামকাকার গলা পেলাম, 'উমা ঘুমালি?'

'না ঘুমাইনি কাকা।'

'অচল? ভুলু?'

'না ঘুমাইনি কাকা!'

'ঘুম আসছে না কেন? এসব তো ভালো লক্ষণ নয়। সকালে স্নান করিসনি?'

'করেছি।'

'মাথায় দুর্বুদ্ধি গজায়নি তো?'

'বারে দুর্বুদ্ধির কী আছে!'

'না, এমনি বললাম। তোদের নিয়ে আমরাও কী কম শঙ্কা। বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াস তো। সাপখোপের উপদ্রব বাড়ছে। জানিস শচী ধরকে কালে খেয়েছে।

'আমাদের সঙ্গে টর্চ থাকে।'

'টর্চ কেন?'

এইরে! দেখলাম বড়দা হাত বাড়িয়ে চিমটি কাটছে। মাঝখানে শুই আমি। বড়দা-মেজদা দু-পাশে। জানলা খোলা। মশারির ভিতর থেকে জ্যোৎস্না রাতে দূরের গাব গাছটা ঝুপড়ির মতো দেখায়। গাব গাছে ভূতদের থাকবার প্রশস্ত জায়গা, এটা আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। তবে শোবার সময় সুদামকাকা অনেকবারই আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'দত্তের মার খুব ইচ্ছে এই গাব গাছে এসে থাকে। আমি বলেছি খবরদার না। অন্য কোথাও জায়গা দেখো। বাড়িতে ছেলেপুলে আছে। দত্তরা শ্মশানে মায়ের নামে মন্দির করবে ঠিক করেছে। আর মন্দিরটা যতদিন না হচ্ছে ততদিন একটু আশ্রয় চাইছে কোথাও!' সুদামকাকা বলে দিয়েছেন, 'আস্তানা পীরের দরগার বড়ো রসুই গাছটায় গিয়ে থাকো এখন।'

সুদামকাকার আবার গলা খাকারি।
আমরা পাশ ফিরে শুলাম।
সুদামকাকা গলা ছেড়ে বললেন, 'মাতির বাপটার আত্মার সদগতি হল না!'
'কেন হল না?'
'হবে কী করে! মা শীতলার দয়ায় গেছেন। তোরা তখন হসনি। পচে গলে গেছিল। তা পচা গলা মানুষ নদীর পাড়ে কে নিয়ে যায়। তা ছাড়া মার দয়ায় গেলে পোড়াতে নেই। কবর দিতে হয়।'
'ও! তাই বুঝি?'
'তা আমায় এসে বুড়ি বলল, সুদাম তুই একটা বিহিত কর বাবা। তোর জ্যাঠাকে সদগতি করে দে।'
'দিয়েছ?'
'বললেই কী দেওয়া যায়।'
'কেন একটা যে নতুন কাপড় দিয়ে গেল!'
'তা দিয়েছে। কাপড়খান ভালোই, মিলের ধুতি। এদিকে বুড়ি রাতে স্বপন দেখে।'
আমরা তিন জন মশারির নীচে উঠে বসলাম।
'স্বপ্নটা ভালো না, দুঃস্বপ্ন বলতে পারিস। জামবুরা গাছটার নীচে থেকে উঠে এসে মাতির বাপ ডাকে, কই গো আর কতকাল, চলো।'
'বলে!'
'হ্যাঁ বলে। গাছের নীচে শুয়ে অছেন তো।'
'গাছের নীচে মানে?'
'ওই যে জামবুরা গাছটা, তার নীচেই তো আছেন। মাটি চাপা দেবার পর গাছটা বুড়িই লাগিয়েছিল। গাছটা দেখতে দেখতে কেমন বড়ো হয়ে গেল। আর দেখিস তো কী ঝেপে জামবুরা আসে। পাতা দেখা যায় না। গাছটার নীচে মাতির বাবার কঙ্কাল। স্বপ্নটা আশ্চর্য, বুঝলি। প্রায়ই দেখে। গাছটার গোড়া থেকে কঙ্কালটা উঠে আসে।'
সহসা বড়দা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সুদামকাকা উনি এখানে চলে আসবেন না তো!'
'এখানে আসবে না, আমি আছি না। নির্ভয়ে ঘুমো।'
কিন্তু বড়দা কিছুতেই আর জানলার পাশে শুতে রাজি না। আমাকে টেনে হিঁচড়ে ওদিকটায় দিতে চাচ্ছে।
ঠেলাঠেলি মারামারি শুরু হতেই সুদামকাকা বললেন, 'ঠিক আছে। তোরাই আজ নীচে শো। আমি উপরে শুচ্ছি।'
আমরা সুড়সুড় করে সুদামকাকার বিছানায় চলে গেলাম। আর সুদামকাকা আমাদের বিছানায়।
দীর্ঘদিন আর আমরা জানলার পাশে শুতে সাহস পাইনি!
সে বছর কেউ আর গাছ থেকে একটা বাতাবি লেবুও তুলে নিতে সাহস পায়নি। যার যতই বীরত্ব থাক-একটা কঙ্কাল গাছের নীচে আছে, ভাবলে গায়ের লোম কার আর স্বাভাবিক থাকে!
মাতঙ্গিনী বা মাতির মা বুড়ি এলে সুদামকাকা বলল, 'ওসব ভূতুড়ে কাণ্ড! ভূতগুলোকে মন্ত্র পড়ে বেঁধে রেখেছি। গাছের ফল গাছেই থাকবে, আর হাওয়ায় ভেসে যাবে না।'

জেঠুর বাড়ি অনেক দূর

বুমবাই কাল রাত থেকে মহাখাপ্পা। এবারেও রাঙাজেঠুর বাড়ি যাওয়া হবে না। মার শরীর খারাপ। কাল রাতেই বাবা খাবার টেবিলে বলেছিল, 'তাহলে রাঙাদাকে লিখে দি, যাচ্ছি না। তোমার বউমার শরীর খারাপ। আশায় থাকবে বুমবাইকে নিয়ে আমরা যাচ্ছি। কত করে বলে যায়, তোরা যাস। শহরের খাবারদাবারে ভেজাল, বাতাসে অক্সিজেন কম, কলকারখানায় ধোঁয়া। গেলে বুমবাইয়ের শরীরটা ভালো হবে। গাঁয়ের খাঁটি দুধ, মাছ খেলেই বুঝবে স্বাদ আলাদা।'

বুমবাই খাওয়ার পাত থেকে তড়াং করে লাফিয়ে উঠে গেছিল, 'তোমরা না যাও, আমি একা যাব।'

বোনটা হাত ধরে টেনে না আনলে সে আর হয়তো খেতই না। রাঙাজেঠুকে মা দেখতে পারেনা। এককথা-তাঁর কী, ছেলেরা কৃতী, একা মানুষ, নিজের মর্জি ছাড়া কিছু বোঝে না।

না হলে কলকাতার অত বড়ো বাড়ি ফেলে বাপ জ্যাঠার ভিটে মাটিতে গিয়ে কেউ পড়ে থাকে। সেখানে জমিজমা কিনে, পুকুর কাটিয়ে তিনি এখন লাট। এসেই খালি-'এই নাও, বউমা, আমার বাবার লাগানো এটা বড়ো সিঁদুরে গাছের, ঘণ্টাখানেক জলে ভিজিয়ে রেখে কাটবে। এই ন্যাশপতি, চার-পাঁচটা নারকেল নিয়ে এলাম, ছেলে-মেয়েকে নাড়ু বানিয়ে দেবে। থোড় এনেছি, কী করে রাঁধতে হয় শিখিয়ে দিয়ে যাব। সকালে উঠেই পাঁউরুটি, ডিম, ভেজাল মাখন। ও কী মাখন! যত সব চর্বি, কী করে যে হাতে ধরে দাও বুঝি না! কেন, দুধ রাখবে। বেশি করে সকালে দুধ কলা মুড়ি, দই পেতে রাখবে, দুপুরে খাবার পাতে টক দই খেলে শরীর ঠান্ডা থাকে। দেখতে হবে কার রক্ত গায়ে। ওদের বাবা-ঠাকুরদারা কবে সকালে উঠে একটা করে আস্ত সেদ্ধ ডিম খেয়েছে। গরমের দেশ-আমাদের বাপ-ঠাকুরদারা জানতেন, কখন কী খেতে হয়। আমরা তো ফেনা ভাত খেতাম, মাছভাজা, সামান্য গাওয়া ঘি। দুপুরে তিতো দিয়ে শুকতনি। হয় উচ্ছে, নয় পলতা পাতা দিয়ে। ডাল, তরকারি, মাছের হালকা ঝোল-শেষ পাতে টক দই। এসব খাওয়া সহ্য হবে কেন! বারোমাস অসুখ-কী চেহারা হয়েছে এক-একটার।'

মা তখন রান্নাঘরে গজগজ শুরু করছে, 'এই আরম্ভ হল!' জেঠু বসার ঘরে- সেখান থেকেই সব কথাবার্তা।

জেঠু এলে, বসার ঘরেই থাকেন। শয়ন করেন। ভিতরে ঢুকলে, গলা খাঁকারি। একটা ক্যাম্পখাট পেতে, যে ক-দিন থাকেন তাঁকে নিয়ে হাজার রকমের গল্পে মেতে থাকেন। সেবারে কী সুন্দর একটা গল্প বলে গেছেন।

জেঠু নাবিক ছিলেন। জাহাজে পৃথিবীর সব দেশ ঘুরেছেন-কোথায় সেই একটি শহর, শহরের গায়ে পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে থাকে। সুন্দর সুন্দর সব লাল নীল কাঠের বাড়ি। পাইনের বন, আপেলের বাগান। সেখানে ম্যান্ডেলা বলে বুমবাইয়ের বয়সি একটা মেয়ের সঙ্গে জেঠুর ছবি আছে। ছবিটাতে ম্যান্ডেলা, জাদুকর বসন্তনিবাস আর রাঙাজেঠু। রাঙাজেঠু ছবিটা গেলবারে দেখিয়ে নিয়ে গেছে। জেঠুর বয়স তখন আর কত! টাই কোট প্যান্ট পরা সাহেব। কী সুন্দর দেখতে!

সে ছবিটা মাকে নিয়ে দেখিয়েছিল, 'জান, এই হল জেঠু। আর পাশে আলখেল্লা পরে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় তালপাতার টুপি, এ হল জাদুকর বসন্তনিবাস। আর মাঝখানে সাদা ফ্রক গায়ে ছোট্ট মেয়েটা পরির মতো দেখতে, ওর নাম ম্যান্ডেলা। জান, জেঠু বলেছে, ম্যান্ডেলার বাবা জাহাজ ডুবিতে নিখোঁজ। ওঁর মা সারাদিন নাকি জানালায় দাঁড়িয়ে থাকত। সমুদ্রে সাদা জাহাজ ভেসে এলেই, ম্যান্ডেলাকে দেখে আসতে বলত, জাহাজে ওর বাবা ফিরে এল কি না!'

মা বলেছিল, 'ফিরে এসেছিল?'

বুমবাই একলাফে বসার ঘরে ঢুকে জেঠুর গায়ে মুখ লুকিয়ে বলেছিল, 'ম্যান্ডেলার বাবা ফিরে এসেছিল?'

জেঠু বুমবাইয়ের মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, 'আসেনি। কত বছর পার হয়ে গেছে, কোথায় জাহাজডুবিতে যে হারিয়ে গেল মানুষটা! তবে আমাদের মৈত্রদা, মৈত্রদা মানে জাদুকর বসন্তনিবাস, ওকে একটা পালক দিয়ে এসেছিল আর একটা রুপোলি ঘণ্টা।'

'পালক কেন জেঠু?'

'ওই যে পালকের টুপিটা পরলেই ম্যান্ডেলা উড়তে পারবে। যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে! সমুদ্র পার হয়ে কোনো দ্বীপে, অথবা আফ্রিকার উপকূলে, অনেক বনজঙ্গল আছে, ইচ্ছে করলে সেখানেও চলে যেতে পারবে। গভীর অরণ্যে বাঘ, সিংহ, গোরিলা সব সে দেখতে পাবে; কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাবে না। এমন একটা পালক না হলে সে বাবাকে খুঁজতে যাবে কী করে? খুশিমতো উড়তে পারবে, বাতাসে ভেসে যেতে পারবে-কী মজা না?'

'রুপোলি ঘণ্টা কেন জেঠু?'

'ও, তাও জানিস না। জানবি কি করে! আমার তো বলাই হয়নি। ম্যান্ডেলার বাবা ম্যান্ডেলাকে, সেই অস্ট্রেলিয়া বলে একটা দেশ আছে না-'

বুমবাই গম্ভীরচালে বলে, 'আমি জানি। সেবারে গ্রেগ চ্যাপেল, লিলি, ইয়ান চ্যাপেল, সব খেলতে এল না!'

'ও তালে তো কথাই নেই। তুই সবই জানিস দেখছি। ম্যান্ডেলার বাবা সেখান থেকে ওর জন্যে একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা নিয়ে এসেছিল। বাচ্চাটা ভারি শয়তান। কারও কথা শনুত না। কিন্তু ম্যান্ডেলা ধমক দিলেই গুটিয়ে পায়ের কাছে কুঁই কুঁই করত। ওদের বাড়ির সামনে একটা সিলভার ওক গাছ আছে, বুঝলি। ক্যাঙারুটা ওই গাছের নীচেই বাঁধা থাকত।

'বুঝলি বুমবাই, সমুদ্রে শুধু জল আর জল। দিন যায় মাস যায়, জাহাজ চলে, কিন্তু সমুদ্র আর শেষ হয় না। মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো দ্বীপ। দ্বীপে একটা ফণী মনসার গাছ। ভেবে দেখ, হাজার হাজার মাইল জুড়ে শুধু নীল জলরাশি-কেমন ভাবতে লাগে, একটা দ্বীপে একটা মাত্র ফণী মনসার গাছ। আকাশের নীচে তার বেঁচে থাকার কী আগ্রহ। একা নিঃসঙ্গ, কোনো ভয়ডর নেই। গাছের প্রাণ আছে জানিস, গাছ সব বুঝতে পারে। ম্যান্ডেলাকে বলতেই সে বলল, আমার বাবা নয়তো! কোনো জাদুকর যদি তাকে ওখানে একটা গাছ বানিয়ে পুঁতে রাখে!'

'কিন্তু জেঠু, রুপোলি ঘণ্টাটা কেন ম্যান্ডেলাকে দিয়েছিলেন জাদুকর বসন্তনিবাস, সেটা তো বললে না?'

'বারে, ক্যাঙারুর বাচ্চাটা তো ম্যান্ডেলার সঙ্গী। ম্যান্ডেলা একা যাবে কী করে! ওর ভয় করবে না? তাই মৈত্রদা ওকে একটা রুপোলি ঘণ্টা দিয়েছিল। কী বলেছিল জানিস?'

'কী বলছিল জেঠু?'-বুমবাই জেঠুকে জড়িয়ে শুনতে শুনতে সেই অজানা রহস্যময় পৃথিবীতে চলে গেছিল।

'বসন্তনিবাস বলেছিল, ঘণ্টাটা তোমার সঙ্গীর গলায় পরিয়ে দেবে। তখন দেখবে সেও উড়তে পারছে তোমার সঙ্গে। দু-জন পাশাপাশি উড়ে যেতে পারবে। কী মজা বল!'

'অমনি বুমবাই দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে বলেছিল, 'জান মা, ম্যান্ডেলার বাবা আর ফিরে আসেনি।'

মার চোখ কেমন তখন জলে চিকচিক করছিল। বলেছিল, 'আহা বেচারা!'

'জান মা, ম্যান্ডেলাকে না ছবিতে যে জাদুকর দেখলে, একটা পালক আর রুপোলি ঘণ্টা দিয়েছিল।'

'ও দিয়ে কী হবে?'

'ম্যান্ডেলা উড়ে যেতে পারবে। বাতাসে ভেসে যদ্দুর খুশি চলে যেতে পারবে। কেউ দেখতে পাবে না। ক্যাঙারুর বাচ্চাটা পাশে পাশে ভেসে যাবে। কেউ দেখতে পাবে না। কেবল সবাই শুনতে পাবে নীল আকাশে দমকলের ঘণ্টা বাজিয়ে কারা যায়। তারা তো জানে না, ম্যান্ডেলা যায়। ম্যান্ডেলা তার বাবাকে খুঁজতে যায়।'

মা শুনে বলেছিল, 'ধুৎ! তা আবার হয় নাকি। তোর জেঠুর যত আজগুবি গল্প। কাজ নেই, কম্ম নেই, খাওয়া পরার ভাবনা নেই, আজ এই আত্মীয়ের বাড়ি, কাল সেই আত্মীয়ের বাড়ি-বছরের বেশিটা সময় ওই করে কাটান! কোনদিন দেখবি, তোর জেঠু বলছে, তিনিই সেই জাদুকর। ইচ্ছা করলে তিনিও ছোটোদের পালক দিতে পারেন, রুপোলি ঘণ্টা দিতে পারেন।'

বুমবাইয়ের সত্যি কেন জানি সেই থেকে মনে হত জেঠু সত্যি পারে। সে তার ক্লাসের বন্ধুদের বলেছে, 'জেঠু নাবিক ছিল জানিস।' ম্যান্ডেলার গল্পও করেছে। জেঠু চলে যাবর পর সে কতদিন সবাই ঘুমিয়ে পড়লে জানলা খুলে আকাশের দিকে চেয়ে থাকত। যদি রুপোলি ঘণ্টার শব্দ শুনতে পায়। জেঠু বলেছে, বড়োরা শুনতে পায় না, কেবল সে-ঘণ্টার শব্দ ছোটোরাই শুনতে পায়। সে ভেবেছিল, এবারে গেলে জেঠুকে ধরবে, জেঠু তুমিই সেই জাদুকর। তুমিই পার পালক আর রুপোলি ঘণ্টা দিতে। কিন্তু তার তো ক্যাঙারুর বাচ্চা নেই। সে এজন্য বাবাকে বলে সাদা ধবধবে ছোট্ট একটা কুকুর নিয়ে এসেছে। সে নামও দিয়েছে-রাজা। রাজাকে নিয়ে সে তবে খুশিমতো আকাশের নীচে বাতাসে ভেসে চলে যেতে পারবে। ওঃ, কী মজা!

সব মাটি! কাল থেকেই মা বিগড়েছে। বলেছে, 'না বাপু, যেতে হয় তোমরা যাও। আমি যাব না। স্টেশন থেকে দু-ক্রোশ পথ রিক্সায়। হেঁটে আবার কতটা যেতে হবে। রাস্তা নেই, আলো নেই। অন্ধকারে আমি ভয়েই মরে যাব।'

বুমবাই বলেছে, 'বারে, লণ্ঠনের আলো আছে না! অন্ধকার হবে কেন! জেঠু রাতের বেলা লণ্ঠন জ্বেলে গাছের নীচে ইজিচেয়ারে বসে থাকে।'

নাঃ! তবুও না, কিছুতেই রাজি না।

রাতে সে ঘুমোতে পারেনি। ক্লাস সেভেনে উঠেছে বলে সে আলাদা বিছানায়, আলাদা ঘরে বোনকে নিয়ে শোয়। সারারাত তার ঘুম হয়নি। সকালে উঠে সে দাঁত মাজেনি। আজ ঠিক করেছে, কিছু খাবে না। গরমের ছুটিতেই যাবার কথা। জেঠু লিখেছিলেন বাবাকে, 'তোরা চিঠি দিলে আমি ইস্টিশনে থাকব। বাড়ি আসতে তোদের অসুবিধা হবে না। বউমাকে বলবি, এই বনজঙ্গলের আলাদা সৌন্দর্য আছে। এত বড়ো আকাশ তোরা শহরে কোথায় পাবি! সামনে দিগন্তবিস্তৃত শুধু ধানের খেত। সব সবুজ। কত রকমের ফড়িং উড়ে বেড়ায়-বুমবাই অন্য এক পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে যাবে কিছুদিনের জন্য।'

সকালে বাবা ডেকে বললেন, 'দাঁত মাজছ না কেন বুমবাই?'

'না মাজব না। আজ আমি কিছু খাব না।'

বাবা ওর ব্যথাটা বুঝতে পেরেছেন। বলেছেন, 'ঠিক আছে, আমি একবার তোমাকে নিয়ে জেঠুর বাড়ি ঘুরে আসব।'

রান্নাঘর থেকে মায়ের গলা, 'হ্যাঁ তাই যাও। যা দুরন্ত তোমার ছেলে, পোকা-মাকড়ে কামড়ালে, আমি কিছু জানি না। আমার হয়েছে মরণ। কই, কলকাতার এত বড়ো বাড়ি দারোয়ানের জিম্মায় আছে, বলতে তো পারেন, ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকো। বলেছেন কখনো!

বাবা বললেন, 'ঠিক আছে। আবার রাঙাদা এলে বলব।'

বুমবাই বলল, 'না, আমি ও বাড়িতে যাবই না। মামাবাড়ি তো সেখানেই। আমার একদম ভাল্লাগে না।'

মা বের হয়ে এসে বলল, 'তা ভালো লাগবে কেন! সেখানে তো ছোটাছুটি চলে না, দস্যিপনা করতে দেয় না দাদারা। কান মলে দেয় দুষ্টুমি করলে।'

বুমবাইকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। সে তার ঘরে শুয়ে রইল। মা বলেছে, 'খাবে না, খাবে না। অত সাধাসাধি কীসের! খিদে পেলে আপনিই খাবে। তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

বোনটা এসে বলল, 'আয় না দাদা, খাবি।'

'না। যা আমার কাছ থেকে। জেঠু গেলে কত খুশি হত!'

বোনকে তখন মা শাসন করছে, 'এদিকে চলে আয়। জেঠুর পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাচ্ছে! এ কী রে বাবা, যত আজগুবি সব গল্প বলে হাওয়া। আমার হয়েছে মরণ। তেনার পালকের টুপি চাই। রুপোলি ঘণ্টা চাই। জেঠুর কাছ থেকে তিনি চেয়ে নেবেন। তিনি হাওয়ায় উড়বেন। মাথাটা খাচ্ছে একেবারে।'

বুমবাইয়ের বড়ো অভিমান হয়। জেঠু কত আশা নিয়ে বসে আছে, তারা যাবে। বাবা জেঠুকে চিঠি দিয়েছিল, 'বুমবাইয়ের গরমের ছুটি হলে তোমার বউমাকে নিয়ে যাব! বুমবাই যাবার জন্য পাগল হয়ে আছে। সবাইকে বলেছে, 'আমরা গরমের ছুটিতে এবার জেঠুর বাড়ি যাব।'

ভাবতেই বুমবাইয়ের কেমন কান্না পায়। জেঠুকে মনে হয়, পৃথিবীতে বড়ো একা। তাঁর এত থেকেও কিছু নেই। কীসের যেন অভাব, যা তিনি খুঁজে বেড়ান। না হলে দু-তিনজন চাকরবাকর নিয়ে এমন একটা জঙ্গলের মধ্যে একা কেন থাকবেন? কাঠবিড়ালিরা তাঁর সঙ্গী। পাখিরা তার সঙ্গী। গাছেরা তাঁর সঙ্গী। সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে।

জেঠু বুঝতে পেরেছেন, এরা কখনো তাঁকে ছেড়ে যাবে না। বড়ো একটা কাঠের বাক্সে নাকি জেঠুর কত বয়সের সব ছবি, সব তিনি বড়ো যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। কেউ গেলেই ছবিগুলি দেখান।

জেঠিমা নাকি প্রতিমার মতো দেখতে ছিলেন! ছেলেরা কত বড়ো বড়ো কাজ করে-কোথায় কোন মুল্লুকে তারা সব থাকে। তার মনে হয়, জেঠুর এখন গাছপালা ছাড়া আর কোনো সম্বল নেই। জেঠু হয়তো রোজ তাদের আশায় লণ্ঠন নিয়ে ইষ্টিশনে এসে বসে থাকেন। ট্রেনটা চলে গেলে একা একা বাড়ি ফেরেন।

বুমবাই পরিষ্কার দেখতে পায়, মাঠ পার হয়ে সত্যি জেঠু চলে যাচ্ছে। হাতে লণ্ঠন। গাছপালার ছায়ার একজন বড়ো মাপের মানুষ মাটির রাস্তায় গভীর রাতে অন্ধকারে পথ হাঁটছেন।

জেঠুর কথা ভাবতে ভাবতে চোখে জল ভরে এল বুমবাইয়ের। বুকের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা। সে পাশ ফিরে শুয়ে বিড়বিড় করে উঠল, 'আমি বড়ো হলে তোমার কাছে চলে যাব। তোমার সঙ্গে থাকব। কেউ আমাকে আটকে রাখতে পারবে না। জেঠু জান, তোমাকে কেউ ভালোবাসে না। তুমি কিন্তু বাসো-গাছপালা, পাখি, মানুষ সব্বাইকে, আমিও বাসব।'

মনসাচরণ

'এই আয়! দৌড়ে আয়।'

'আর কতদূর দাদাই।'

'দূর, অনেকদূর। সেখানে গেলে নিজের ঘরবাড়ি, নদীতট সব দেখতে পাবি। সেখানে গেলে সোনার পায়রা উড়িয়ে দিবি।'

'দাদাই!' দূর থেকে ভেটকি ডাকছে।

এই হল মরণ! ভেটকি রেগে গেলে নিয়ে যাওয়াই মুশকিল। রেগে গেলে পালাতেও পারে। বাপ-মা মরা ছেলে। তারও দোষ নেই। বড়ো হয়ে সে কাউকে নিজের বলে চেনে না। থাকত মামার কাছে। মামি মুখরা। সুখ সইতে না পেরে পালিয়েছিল ভেটকি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে মনসাচরণ এক চায়ের দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তার নাতিকে।

মনসাচরণ বোঝে, ভেটকিরও দোষ নেই। এই বয়সে মানুষজন, গাছপালা, পাখি, দূরের মাঠ অথবা নদী জলে ভেসে গেলে ডুব সাঁতার চিত সাঁতার। ভেটকির কপালে নদীও নেই, গাছে উঠে নদীর জলে লাফঝাঁপও নেই। এক উরাট দেশ থেকে ভেটকিকে ধরে নিয়ে এসেছে মনসাচরণ।

'আরে আয়! দাঁড়িয়ে থাকলি কেন। কী দেখছিস হতবাক হয়ে?'

'ওই দূরে গোরু-বাছুর। ওই দূরে কত বড়ো গাছ, গাছের ছায়া। আরও দূরে ধোঁয়া। দাদাই ধোঁয়া হয় কেন রে!'

'ওটা রেলগাড়ির ধোঁয়া। সোনার পায়রা খুঁজে পাই, তখন কত টাকা, কত সোনাদানা, তুই আর আমি, তোর একটা টুকটুকে বউ।'

'দাদাই মারব তোকে।'

বউ-এর কথা বললেই ভেটকি রেগে যায়। মনসাচরণ হাসে।

'ঠিক আছে ভেটকি, টুকটুকে বউ-এর কথা আর বলছিনে। তুই আয়। হাঁট জোরে। বেলা পড়ে আসছে। সেই সকালে বাজারে মুড়ি গুড় খেয়েছি, তোর তো খিদা পাবেই। নিজের ঘরবাড়ি, নিজের জমিজমা, কত

কিছু ছেল, সব গেল নদীর জলে ভেসে। ঘরবাড়ি না থাকুক, পাঁচিল থাকলেও চলবে, সেই পিটকিলা গাছটা থাকলেও চলবে।'

মনসাচরণ কখনোই বলে না, সে একটা খুনে ডাকাত। কখনো বলে না, দিঘাপতিয়ার রাজবাড়ি থেকে পেটি পেটি সোনাদানা, রাজমহিষীর সোনার পায়রা লুঠ করতে গিয়ে, দারোয়ানের পেটে শলা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কখনো বলে না, খুনের দায়ে তার জেল-হাজত কারাবাস। যাবৎজীবন।

কেউ মনসাচরণের খোঁজ রাখত না। জেলে বসে সেও কারও খোঁজ পেত না। খুনি আসামিকে সবাই ভয়ও পায়। কেবল জেলার সাহেবের বাড়ির বাগান কুপিয়ে দিলে, তিনি তাকে ভালোমন্দ খাওয়াতেন।

'কে বলবে তুমি ডাকাত ছিলে মনসাচরণ, খাও পেট ভরে খাও।' জেলার সাহেব সামনে বসিয়ে তাকে খাওয়াতেন।

'দেশ থেকে কেউ আসেনি হুজুর?'

'না।'

'ভুষিচরণ?'

'সে কে তোমার মনসাচরণ?'

'আমার ছেইলে। তার কী হাল কিছু জানি না। পরিবারের কী হাল তাও জানি না সাহেব।'

'ছুটি তো হয়ে যাবে। ছাড়া পেয়ে যাবে। দেশে যাও। সবার ঠিক খোঁজখবর পেয়ে যাবে। আর ক-টা মাস।'

মনসাচরণ ছাড়া পেল ঠিক, দেশেও ফিরে এল, তবে কারও খোঁজখবর পেল না। পেল না বললে মিছে কথা হবে। মণিমোহনের সঙ্গে রেলগাড়িতে দেখা।

'আরে তুমি মনসাচরণ!'

'হা, হুজুর।'

'পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, সেই কবে, তারপর জেল-হাজত খাটলে, ফিরেও এলে শেষে! অবাক।'

'দিন যায় হুজুর। দিন তো থেমে থাকে না। আমার ভুষিচরণের খোঁজে আছি।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'কেন দেশে বাবু।'

'তোমার ঘরবাড়ি-পরিবার বানের জলে ভেসে গেছে, জান না!'

মনসাচরণ হাউমাউ করে কাঁদতে থাকল।

'কেউ নেই হুজুর?'

'তোমার এক নাতি আছে, সে নাকি তার মামার দেশে গহরপুরে চলে গেছে। মামারা নিয়ে গেছে।'

রেলগাড়ি থেকে নেমে মনসাচরণ অতি দুঃখে আর তার ঘরবাড়িতে ফেরেনি। গাঁয়ের কেউ নেই, সবই জলের তলায়। নাতির খোঁজে গহরপুর, তারপর নাতির খোঁজে ফের শহরে। চায়ের দোকানি বলল, 'তোমার নাতি?'

'হ্যাঁ, আমার নাতি।'

ভেটকি কী বলে! সে বোকার মতো মনসাচরণ দিকে তাকিয়ে আছে।

'তোর নাম ভেটকি? ভুষিচরণের ছেইলে!' মনসাচরণ না বলে পারল না।

'তুমি বাপের নাম জান কী করে!'

'জানি, তোর মামি নারায়ণী বলেছে, ভেটকি পালিয়ে কোথায় চলে গেছে!'

ভেটকিও অবাক। বুড়ো লোকটা তার নাম জানে, মামির নাম জানে, বাপের নাম জানে।

সে বলল, 'তোমার নাম কি মনসাচরণ? আমার দাদাই, খুনে ডাকাত তুমি।'

'তুই আয়। চল আমার সাথে। তোর জমি বাড়ি, সোনার পায়রা সব খুঁজে বের করতে হবে।'

চায়ের দোকানি খুনে ডাকাত মনসাচরণের নাম শুনেই দৌড়, দৌড়।

'আরে আমি মনসাচরণ, এখন আর চোরও নই, খুনে ডাকাতও নই। ভেটকির আমি দাদাই। ভেটকির জমি বাড়ি না হলে সে থাকবে কোথায়, বাঁচবে কী করে!'

আর তারপরই নদী পার হয়ে, বড়ো সড়ক ধরে সোজাসুজি হাঁটে দাদাইয়ের হাত ধরে।

বেলা পড়ে আসছে।

দূর থেকেই বোঝে, নদী আরও বড়ো খুনি। তার বাড়িঘর সব গিলে খেয়েছে। মনসাচরণ দেখতে পায়, নদীর পাড়ে শুধু পিটকিলা গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। আর পাঁচিলটাও আছে। সে তার সোনাদানার পেটি, সোনার পায়রা দূরের জমিতে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছে। হায় কাপল! সেই মাঠও নেই-সব কাশের বন হয়ে গেছে। সামনে যতদূর চোখ যায় শুধু কাশের বন। আর সাদা ফুলে ছেয়ে আছে চরাচর। কোথায় যে মাটির তলায় পুঁতল সোনাদানার পেটি। যতদূর চোখ যায় সে কেমন হতাশ।

কী আর করা। দাদাই আর নাতি মিলে পিটকিলা গাছের নীচের একটা ঝুপড়িও তুলে ফেলে। সেখানেই তারা থাকে খায়। আর রাত হলে কোদাল খোনতা নিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে যায়।

খোঁজে।

তারা কাঠের পেটি খোঁজে। যার ভিতর সোনাদানা, সোনার পায়রা। পায় না। কোথায় যে সেই জায়গাটা! মনসাচরণের তখন হুঁশও ছিল না। পুলিশ তাকে তাড়া করছে, সে কোনোরকমে মাটি চাপা দিয়ে ঘরে ফিরতেই শুনেছিল, পরিবার বলছে, 'শিগগির পালাও-পুলিশ ঘিরে ফেলেছে।' কোদালের মাটিও তখন শুকায়নি।

সে পালাচ্ছিল।

এক দেশ থেকে আর এক দেশ।

শেষে সে ঝালকাঠিতে ধরা পড়ল।

আদালতে তার এককথা-'আমার কোনো দোষ নাই হুজুর। গরিব মানুষ, চুরি-ডাকাতি করতাম ঠিক, তবে ভাগের ভাগ কিছুই থাকত না। বাবুরা সব খেয়ে নিত। সাথে লোকজন থাকত, তারাও নিত।'

'ব্যাটা তুই দারোয়ানকে খুন করেছিস।'

'হা হুজুর করেছি। খুন না করলে গুলিতে বুক আমার ঝাঁজরা করে দিত। জীবন বলে কথা। সব ফেলা যায়, জীবনকে কোথায় ফেলি বলেন।'

'সোনার পায়রা কোথায়?'

'তা জানি না বাবু।'

'সোনাদানা কোথায়?'

'তাও জানি না বাবু।'

থানার বড়োবাবু কিছুতেই সোনাদানা, সোনার পায়রার হদিস জানতে পারেনি।

সেই সোনাদানা এখন যে সবটি নদীই গিলে ফেলল।

'এই ভেটকি তুই কী করছিস!'

'গাছ লাগাচ্ছি।'

'গাছ কেন রে!'

'এত বড়ো কাশের বনে কোদাল মেরে কোথায় খুঁজে বেড়াবি সোনাদানা দাদাই। দিন নাই, রাত নাই, খাওয়াদাওয়ার কথাও ভুলে কেবল কোদালে মাটি তুলছিস, তারপর হতাশ গলায়, না নেই বলছিস। আবার গর্ত খুঁড়ছিস-বুঝতেই পারছিস না কোথায় মাটির তলায় পুঁতে রেখেছিলি! তোর তখন বুঝি হুঁশই ছিল না।'

হবে হয়তো। মনসাচরণ কোদাল পাশে রেখে হাঁপাতে থাকে, সারা মাঠ জুড়ে সে গর্ত করে খুঁজছে। তারপর কী ভেবে কথা নাতির সাথে।

'কী গাছ লাগালি?'

'শাল-সেগুন-শিরিষ-ভাটির নাও নদীতে আটকা পড়েছে, সেই নাও থেকে তুলে এনেছি।'

তার দাদাই তখন রাগ করে।

'ধুস তোর গাছ। রাখ ফেলে। হাত লাগা।'

ভেটকি হাত লাগায় ঠিক, কোদালের মাটি সেও সরায়, তবে পেটি তো দূরের কথা একটা কাঠও উঠে আসে না।

একটাই দুঃখ মনসাচরণের, নাতিটার কিছু থাকল না। জমিজমা সরকার দখল করে নিয়েছে। মনসাচরণ ভাবে, সে না থাকলে নাতিটাও একদিন জলে ভেসে যাবে।

এত ধনসম্পত্তির খোঁজ না পেয়ে মনসাচরণ খুবই মনমরা।

ভাবে নিজের ভিটাই নেই, সোনাদানা থেকে আর কী হবে।

ভেটকির দিকে তাকালে তার শরীর আরও যেন জল হয়ে যায়।

'এই ভেটকি।' মনসাচরণ ডাকে।

ভেটকি তখন ভাটির নাও থেকে বাকি গাছপালার চারা তুলে আনছে। দাদাই তো জানে না, গাছ লাগালে বাঁচে। গাছ বড়ো হলে ছায়া দেয়। সেও গাছের মতো এই নদীর পাড়ে বড়ো হবে। কত আশা তার।

মনসাচরণের মন মানবে কেন-তার যে সোনার পায়রা নিখোঁজ হয়ে গেছে। মনের দুঃখে সে বনে চলে যাবে ভাবছে। কারণ নদীর পাড়ে থাকলেই তার যত শোক, পরিবারের কথা মনে হয়-ভেটকির বাপের কথা মনে হয়, ভেটকির মা, আরও সব নাতিপুতি, সব জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নদী জমি গিলে নিলে যা হয়। এই নদীর পাড়ে থাকলে ভেটকিও বানে ভেসে যেতে পারে।

বছর দুই-তিন চুপ থাকার পর আবার নদী মাতাল। মেঘমালা উড়ে আসছে-নদীর পাড়ের মানুষজনের হুকুম হয়েছে, পালাও পালাও, বান আসছে, নদীর পাড় সাফ করে নিয়ে যাবে।

কী যে করে ভেটকি। দাদুর সঙ্গে পালাতে থাকে। যায় আর যায়। দিন যায় মাস যায়-এক উরাট জায়গায় তারা উঠে আসে। গতর খাটালে পয়সার অভাব নেই। দাদাই আর ভেটকি ঘর বানায়, দাদাই ভেটকির জন্য টুকটুকে বউ নিয়ে আসে। নাতির ঘরে পুতি হয়। মনসাচরণ আরও বুড়ো হয়। শেষ বয়সে, সেই যে বিশ-পঁচিশ বছর আগে সে নদীর পাড় ছেড়ে চলে এসেছে-তার কথা মনে হয়। নিজের ভিটার কথা মনে হয়-কত বড়ো নদী দু-পাড় দেখা যায় না, গরমে নদী ফুঁসতে থাকে, আকাশ থেকে অঝোরে জল নামে, শীতে নদী-পার হয় গোরু, পার হয় গাড়ি-নদীতে জল থাকে না, চৈতে নদী শুকনো, আষাঢ়ে নদী ফের জলে ভাসতে থাকে-যত এ-সব মনে হয় মনসাচরণের তত সে রাস্তায় গিয়ে বসে থাকে।

তার পুতিরা তখন হইচই লাগিয়ে দেয়।

'বাড়ি চল বড়োবাবা। স্নান করবি, খাবি।'

মনসাচরণ মনের দুঃখে বসেই থাকে।

ভেটকি খুবই রেগে যায়-'বুড়া বয়সে কী যে বায়না করছ বোঝো না। কাছের পথ নয়, লিয়ে যাব তোমাকে। সে দেশটা কি আর আছে! কাশের বন কি আর আছে! সেখানে গিয়ে হবেটা কী!'

মনসাচরণ বুঝল, কেউ তাকে নিয়ে যেতে চাইছে না।

তারপর আর কী করে-সে একাই পালিয়ে রওনা দিল। দিন যায়, মাস যায়- হাঁটতেও পারে না-তবু সে যাবেই।

তারপর এক সকালে নদী দেখতে পায়। পাড়ে পাড়ে হেঁটে গেলে ঠিক সে ফের ভিটের খোঁজ পাবে। শেষ ক-টা দিন ভিটের মাটিতে পড়ে থাকবে। যেটুকুই নদী ফেলে যাক, তাতেই তার থাকার জায়গা হয়ে যাবে।

আরে সে এটা কী দেখছে-শাল-সেগুন-শিরিষের বিশাল বনরাজিলীলা। তার পাঁচিল পার হয়ে যতদূর চোখ যায়-ঘোর মেঘমালার মতো আকাশের কিনারে ভেসে আছে। সামনে নদী। নদী আর এগোতে সাহস পায়নি-সে তার খাত বদল করেছে- সে কেমন মোহিনীমায়ায় জড়িয়ে পড়ল।

গাঁয়ে এখন মানুষজনও মেলা। তারাই বলল, 'তুমি মনসাচরণ, থাকতে থাকতে কোথায় ফের যে পালালে?'

তারপর খেতে দেয়, তারাই রোগ বালাই হলে ওষুধ এনে দেয়, আর তারা মনসাচরণের কাছে বসে পুরোনো দিনের গল্প শোনে-সে কী করে বলে সোনার পায়রা খুঁজতে এসেই যত কাণ্ড। সে তখন শুধু নদীর দিকে চেয়ে থাকে। মানুষজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। হায়রে মানুষ!
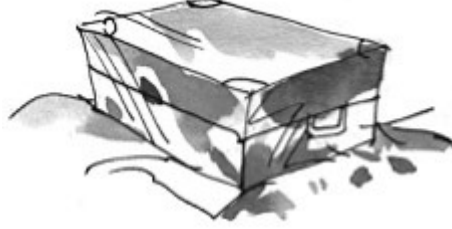
বনবাসিনী

'কী নাম বললে?'

'আজ্ঞে বনবাসিনী গুছাইত।'

'অধী তোমার কে হয়?'

'আজ্ঞে সম্পর্কে দাদা হয়।'

'বনবাসিনী তো খুবই লম্বা নাম!'

'দেশ গাঁয়ে আমাকে সবাই বনো বলেই ডাকে।'

'ভালো।' তারপর অখিল বললেন, 'আমিও বনো বলেই ডাকব। অধীরকে একজন চব্বিশ ঘণ্টার কাজের লোক জোগাড় করে দিতে বলেছিলাম। চিনে আসতে কষ্ট হয়নি তো!'

'আজ্ঞে না। এত বড়ো পেল্লাই প্রাসাদের মতো বাড়ি বাবু, নামডাকওয়ালাও আছেন, এক ডাকে চেনে, অসুবিধে হয়নি।'

'কোনো পিছুটান নেই তো!' তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন অখিল। 'শোনো যা বলছিলাম, যখন-তখন মন খারাপ হলে আমার কিন্তু কিছু করার থাকবে না। বাড়িটায় তোমার কাজ বলতে কিছু নেই। পার্ট-টাইম রান্নার লোক আসে-অধীর নিশ্চয়ই সব বলেছে। ঠিকা কাজের লোকও আছে। ফুট ফরমাস খাটার লোকের বড়ো দরকার। আমরা খুবই ব্যস্ত, তোমার বউদিমণির অফিস, আমার সারাদিন জনসংযোগ থেকে ব্যবসাপত্র-একদণ্ড বাড়ি থাকি না। লিলিকে স্কুলে দিয়ে আসা, নিয়ে আসা। এই লিলি, এদিকে আয়। তোর মাকে আসতে বল।'

ভিতর থেকেই সাড়া পাওয়া গেল।

'তোর বাবাকেই কথা বলতে বল। আমি বের হচ্ছি।'

অগত্যা অখিলই কথা বলতে বাধ্য। বনো কিন্তু কথা বলছে না। চুপচাপ বাবুর দিকে তাকিয়ে আছে।

'পিছুটান নেইতো! জবাব দিচ্ছ না কেন!'

পেল্লাই বসার ঘর, সোফা সেট বাতিদান, ডিমের খোসার মতো দেওয়ালের রং, বড়ো বড়ো দেওয়ালে, বাবুদের ঠাকুরদেবতার ফটো।

জোড় হাতে মাথা ঠেকাল বনো।-খ্যাতাকে দেখো ঠাকুর। ডাহা মিছে কথা বলছি। শেষে বলল, 'না বাবু নেই। পিছুটান নেই।'

আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভেসে উঠল দেওয়ালে-

'মা তুই কোথায় যাবি? আমিও যাব।'

দাদাও খেকিয়ে উঠছে 'তুই কোথায় যাবি! পইপই করে কী বোঝালাম, হ্যাঁ খাবার সময়ে যত ব্যাগড়া-যা, এই যে গোদাবরী'-অধীর তার পরিবারকে ডাকছে। পরিবার যে পয়মাল, বুঝতে অসুবিধা হয় না। হাত ধরে টানছে ক্ষ্যাতাকে। অধীরের ছেলে-মেয়েরাও ছুটে এসে বলছে, 'এই খ্যাতা, আয়। আমরা রেলপাড়ে যাব। পিসিকে ছাড়। পিসি কাজে যাচ্ছে।'

খ্যাতার এককথা, 'আমি যাব মা। তোকে ছেড়ে থাকতে আমার কষ্ট হবে মা।'

'ধুস কষ্ট! চল তো।'-অধীর বলল, 'শেষে ট্রেন না ফেল হয়!' বনোর কোমর জড়িয়ে সে যায় কী করে! কোথাও সে যায়নি একা। সব কাপল, খ্যাতার বাপ না মরলে তার এই দশা হয় না। শোকতাপেরও শেষ নেই। শোক উথলে উঠলে যা হয়, বনো খ্যাতাকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদেও নিল একচোট 'অরে আমার পোড়া কপাইল্যা খ্যাতারে, তর দু-মুঠো অন্নের কথা ভাইবা যাইতাছিরে! তুই ধইরা রাখলে যাই কী কইরা!' শোক করার সময় তার ভাষাজ্ঞান থাকে না। মাতৃভাষা বের হয়ে যায়।

অগত্যা অধীর বলেছিল, 'ছাড় খ্যাতা। কলকাতা থেকে ফেরার সময় তোর মা ঝুমঝুমি বাঁশি কিনে আনবে।'

সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতা লাফিয়ে উঠল।

'কবে?'

'আরে আগে ছাড়তো। তোর মাকে বেষ্টন করে রাখলে যায় কী করে!'

আর বেষ্টন আলগা হলেই অধীরের পরিবার গোদাবরী ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল খ্যাতাকে! মাস গেলে এতগুলি টাকা-

'তাহলে বলছ পিছুটান নেই!' অখিলের হাই উঠছে।

পিছুটান আছে বলেইতো কাজে আসা-পিছুটান না থাকলে কে এই ধাপধারা গোবিন্দপুরে ট্রেন বাস ঠেঙিয়ে আসে! গাড়ি, ট্রাম, বাস, অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ-এ এক ভয়ংকর হট্টমালার দেশ যেন! যখন-তখন বেওয়ারিশ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই যে এক কড়ারে কাজ-পিছুটান বিন্দুমাত্র থাকলে কাজের আশা কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে যাবে। বুকের ভেতর থেকে আবার ঢেউ উঠে আসছে-কতবার বলা যায় পিছুটান নেই-আরে আমার খ্যাতারে তোর বাপের দেওয়া নাম ক্ষিতীনারায়ণ, দেশগাঁয়ে, খ্যাতা হয়ে গেলিরে-সে যে কী বলে!

'বললাম তো বাবু পিছুটান নেই।'

'মিছে কথা বলবে না! অধীর দিয়ে গেল, না একাই এলে! অধীরকে বলেছিলাম বিশ্বাসী হওয়া চাই।' :

কেন যে দাদা তাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে বলে গেল, 'ওই যে বাড়ি বাগান দেখছিস, ওটাতেই অখিলবাবু থাকেন।'

বনো বলেছিল, 'কী সুন্দর স্বপ্নের বাড়ি, না দাদা!'

'এখানকার সব বাড়িই সুন্দর স্বপ্নের বাড়ি। গুলিয়ে ফেলিস না বনো। তুই থাকতে থাকতে বুঝতে পারবি, স্বপ্নের বাড়ি করতে কত মিছে কথার বেসাতি করতে হয়। নম্বরটা রাখ। নম্বর মিলিয়ে ঢুকবি। নম্বর না মিলিয়ে ঢুকলেই তুই কেপমারি। চুরির অজুহাতে হাজত বাস।'

'দাদা তুমি যাবে না!'

'না।'

'কেন?'

'বাবু মেলা টাকা পাবে। অগ্রিম নিয়েছিলাম। লোকজন দিতে পারিনি। বাবুর প্রমোটিঙের ব্যাবসা। বিশ-বাইশ বছর আগে লোকটা খালের জলে পুঁটি মাছ ধরত। সুতাকলে কাজ করত। ইউনিয়নের মাতব্বর। সুতাকলের দফা রফা, বাবু স্বপ্নের বাড়িতে হাজির। দেখ থাকতে থাকতে, তোর ক্ষিতীনারায়ণের যদি কোনো হিল্লে হয়। বলা যায় না তোর খ্যাতাও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যেতে পারে। বড়োই আজব জায়গা, কার কপালে কী লেখা থাকে কওয়ন যায় না।'

'তুমি যাবে না দাদা।'

'না। নিজের দাদা বলবি না, খবরদার।'

'বলব না।'

প্রথমে পিছুটান দিয়ে বাবুর শুরু, তারপর-বিশ্বাসী, শেষে কী বলবেন কে জানে।

সে তো সদ্য বিধবা যুবতী, দাদার নিজের সংসারই চলে না। কাজ-কাম নাই, নানা ধান্দাবাজি-এই ধাপধারা গোবিন্দপুরে প্রায়ই যাওয়া-আসা আছে-ফল-পাকুড়ের ব্যাবসাও আছে, মাথায় করে ডাঁসা পেয়ারা নিয়ে স্বপ্নের এই বাড়িঘরে, চাই ডাঁসা পেয়ারা বলে হাঁকে এবং এই করে নানা ফন্দিফিকির এবং এই করে, দেশের মানুষজন বাড়ি বাড়ি ঠেলেও দিচ্ছে-স্বামীর মৃত্যুর পর, তা বলে রাখা ভালো বিনা চিকিৎসায় সামান্য জ্বরে মানুষটা চোখ বুজে ফেলল-কী আর করা, দাদা খবর পেয়ে ছুটে গেছে, কোথাও কিছুতে যদি লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে যত নষ্টের গোড়া এই খ্যাতা-'না কী করে যাই, আমার দুধের শিশুকে ফেলে কোথায় যাব দাদা।' অধীর খেপে গিয়েছিল, 'দুধের শিশু আর আছে! যত সব অশ্বডিম্ব।'

সকালে উঠে অধীর দেখল, খ্যাতা নেই। নেই তো নেই। কোথায় গেল! কোথায় গেল। কেউ খবর দিতে পারল না কোথায় গেছে। কেবল ইস্টিশনের পানিপাড়ে খবর দিল, খ্যাতাকে সে ট্রেনে উঠতে দেখেছে।

তারপরই একজন বলল, 'খ্যাতা তার মায়ের খোঁজে চলে গেছে।'

সর্বনাশ, এখন উপায়! বনোর পিছুটান নেই, এই কড়ারে কাজ। অধীর খুবই বিচলিত বোধ করল।

বিচলিত হওয়ারই কথা। সারাদিন খ্যাতার এককথা, 'মা আসে না কেন। মার কাছে যাব। আমার ঝুমঝুমি বাঁশি কই!' তারপরই চোখে জল, অধীরের কষ্ট হত। 'আসবে, কাঁদিস না। নে পয়সা, আখ কিনে খাগে।' এই এক বাতিক, খ্যাতার খাবার লোভ প্রকট। বাড়িতেও খ্যাতা যে সুখে নেই অধীর বোঝে। নিজেদেরই খাওয়া জোটে না তার উপর এই গলগ্রহ খ্যাতা। গোদাবরী দুরছাই করে সারাদিন, কাজে কামে তাড়িয়ে বেড়ায়, হাত নিশপিশ করলে বেধরক পেটয়াও। গোদাবরী বোঝে না, খ্যাতার বিনিময়ে তার অর্থলাভ হয়। খ্যাতা আর কত খায়! উচ্ছিষ্ট খাবার ছাড়া তাকে বেশি কিছু দেওয়া হয় না।

কাজেই খ্যাতা মায়ের খোঁজে চলে যেতেই পারে। সাত-আট বছরের বালকের পক্ষে রেলগাড়িতে উঠে যাওয়াই স্বাভাবিক। তার উপর মা বলে কথা। পালিয়ে তার মা বাবুদের বাড়িতে যে কাজ নিয়েছে, সে তাও বোঝে। খ্যাতা তার মায়েরও কম গলগ্রহ নয়, এখন ট্রেনে নিখোঁজ, কোথায় কখন, লাইনে কাটা পড়বে, গাড়ি চাপা পড়ে মরবে তারই বা ঠিক কী। বাঁচা যায়।

খ্যাতা শহর চেনে না। লেখাপড়া জানে না-কলকাতা নামক মহানগরীর গ্রাস থেকে সে তার মাকে উদ্ধার করবে যদি ভেবে থাকে, তবেই গেছে। কোনো ঠিকানা জানে না, জানে শুধু অখিল দাসের নাম। কলকাতার এক ভারী মহাজন, নামে সবাই তাকে চেনে।

না আরও জানে খ্যাতা। উলটোডাঙার কাছে। কারণ যতই গোপনে সে তার বোনকে লোপাট করে দিক না, বনো ভবি ভোলাবার নয়। টাকা-পয়সা কী দেবে, সে তার দুধের শিশুর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে বাবুর বাড়ি কাজ করবে, পিছুটান নেই বলবে, বিশ্বাসী বলবে, সব কাজ জানে বলবে, এত মিছে কথার পর, টাকা-পয়সার পড়তা হবে কিনা, না জানলে চলে! আড়ালে কান পেতে খ্যাতা সব জানতেই পারে। তবে যতই

মহাজন হোক অখিল দাস, শহরে আর কে কাকে চেনে! মন্ত্রী হলেও কথা ছিল, নেতা হলেও নাহয় কথা ছিল।

অখিল দাস মন্ত্রীও নয়, নেতাও নয়, জয়বাবা ফেলুনাথও নয়। সে একজন গুপ্তধন শিকারি মানুষ। অখিল দাসের মতো মস্ত কারবারি মানুষের চেয়ে, বোনের কাছে নেতা মন্ত্রী অনেক বেশি দামি। তবে বনো বাড়িতে ঢুকে মানুষজনের ময়ফেল দেখে ঠিক টের পাবে দাদা তাকে অজায়গায় কু-জায়গায় পাঠায়নি। খুবই ধর্মবিশ্বাসী মানুষ। হাতে পাঁচ আঙুলের দশটি আংটি, ভাগ্যরেখায় বিশ্বাসী, পুজো-আর্চায় বিশ্বাসী-শ্মশানকালীর সেবা দেয়-গ্রহশান্তির বিধানে মা কালীর কাছে পাঁঠাবলিও দেয়। বনো আবার ঠাকুরদেবতার নামে খুবই কাহিল। অখিলের সঙ্গে বনোর এই জায়গাটায় খুব মিল।

অখিলবাবু তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'অধীর তোমার ভূতপ্রেতে বিশ্বাস আছে?'

'আজ্ঞে আছে। তবে কোথাও সাক্ষাৎ হয়নি।

'আত্মায় বিশ্বাস আছে।'

'আছে বাবু। ওই পর্যন্ত, তেনার সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি।'

'আত্মা থাকলে ভূতপ্রেতও থাকে জান?'

'তা হবে। আত্মা অতৃপ্ত থাকলে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

বনোরও ভূতপ্রেতে চরম বিশ্বাস আছে।

সুতরাং বনোর সঙ্গে অখিল দাসের এত মিলের পর, খ্যাতা তাকে কিছুতেই কাজ ছেড়ে চলে আসতে রাজি করাতে পারবে না। তা ছাড়া লাইনে কাটা পড়লে কিংবা চাপা পড়লে তো কথাই নেই। খ্যাতাও ভূত হয়ে যাবে।

খ্যাতাকে বোকা ভাবা ঠিক হবে না। আবার নেতা-মন্ত্রীদের মতো কিংবা জয় বাবা ফেলুনাথের মতো বুদ্ধিমান ভাবাও ঠিক হবে না। সে গোদাবরীর সঞ্চিত কিছু রেজকি, ভাঁড় ভেঙে রেলগাড়িতে উঠে পড়েছে। আর কামরায় জানালার কাছে বসে আখ কামড়ে খাচ্ছে। সে আখ খেতে ভালোবাসে, কারণ আখ অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া যায়। খাওয়া ছাড়া সে এখনও বেশি কিছু বোঝে না। বেশি সময় নিয়ে খেতে পারার আনন্দই আলাদা।

মায়ের কাছে যাচ্ছে, এই খুশি খুশি ভাবটুকু মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়।

গ্রামগঞ্জ, ইটখোলা এবং সবুজ ধানে ভরে আছে চরাচর-তার চোখ বিস্ফারিত-এত ফসল আর তার ছোট্ট একটা পেটের ভাত জোটে না!

খ্যাতা ভারী অবাক।

ইস্টিশনে নেমে একেবারে ভ্যাবলু।

কোনদিকে যে যায়!

তবে যে দিকেই হোক তাকে যেতে হবে।

উলটোডাঙা তো বেশি দূর নয়। খিদেয় পেট জ্বলছে। দুপুরের গনগনে রোদে পাকা রাস্তায় কিংবা ট্রাম লাইন ধরে হাঁটা যায়। মেলা বাসও যায়।

বাস যায়। সে দেখে। রেজকি পয়সায় ছোলা-ছাতু খায়। কাঁচালঙ্কা খায়। হুসহাস করে। রাতও কাবার হয়ে যায় ফুটপাথে। একটা গলিতে ঝুপড়ি ঘরও সে খুঁজে পেল। গাছের ছায়ায় তারই মতো মায়ে-তাড়ানো, বাপে-খেদানো ছেলে ছোকরাও কম না।

কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তাও জানে না।

তারই বয়সি কেউ একেজন বলল, 'এই ব্যাটা ওঠ। কখন সকাল হয়ে গেছে টের পাস না।'

ঠিক হুবহু সেই যেন। নোংরা জামা, হাতে মুখে কালি, ছেঁড়া প্যান্ট পরে সব পয়মাল এসে কোত্থেকে হাজির।
প্রথমে আতঙ্ক, তারপর খিলখিল হাসি, খ্যাতার কেন যে মনে হল, এরা সবাই যেন তার আপনার জন।
'কোথায় থাকিস?'
খ্যাতা বলল, 'কোথাও না।'
'তবে যাবি কোথায়?'
'উলটোডাঙা।'
'খাবি কী।'
পকেট থেকে রেজকি বের করে দেখাল।
শাবাশ। সঙ্গে সঙ্গে আপনারজনেরা তার সবকটা রেজকি পয়সা কেড়ে নিয়ে বলল, 'খবরদার চেঁচামেচি করবি না। তোকে আমরা উলটোডাঙায় দিয়ে আসব। তারপর সেই রেজকি পয়সায় আলুর দম, পাউরুটি।'
'খা।'
খ্যাতাকেও শালপাতায় আলুর দম, পাউরুটি খেতে দিল। খাওয়া হলে জল খেল কল থেকে তারপর হইহই করে দৌড় শুরু।
'এই খ্যাতা, দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? আয়।'
'কোথায় যাব!'
'আয় না!'
'না না যাব না। আমি মা-র কাছে যাব। উলটোডাঙার কাছে স্বপ্নের বাড়িতে আমার মা থাকে।'
'অরে ওখড়া, খ্যাতার মা আছে। কী মজা!'
'তোর মা কী করে!' ওখড়া বলল।
'বাবুদের বাড়ি কাজ করে।'
ওখড়া বলল, 'শাবাশ। আমরাও তোর মা-র কাছে যাব।'
'আয় তো।' ধমক লাগাল ওখড়া।
ওখড়া যে দলপতি, এও টের পেল খ্যাতা। এবং হপ্তাখানেক পার না হতেই সে তাদের সঙ্গে দৌড়াতেও শিখে গেল। গলি, গুজি, গাছতলা এবং তাস খেলা, গুলি তারপর বৃষ্টি নামলে হইহই করে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচা। যে যা আনে, আলু, পটল ভাজা, মাছ ভাজা, রুটি, আস্তাকুঁড় থেকে তুলে আনে, খায়, ওখড়ার এককথা সবার সমান ভাগ। পেটের খিদে সবার সমান। কেউ চুরি করে খেলে গর্দান।
ওখড়া যে ভদ্রজনের পকেট খালি করে দিতেও ওস্তাদ তাও টের পেল খ্যাতা। কিছু জোগাড় না হলেই ওখড়ার এককথা, 'কোথাও যাবি না। আমি আসছি।' বলেই দৌড়।
বেলা যায়, আসে না।
সন্ধ্যা হয় আসে না।
আর রাতে যখন আসে একেবারে কেলেঙ্কারি করে ছাড়ে।
'বসে যা। যা, শালপাতা আন, মাটির খুঁড়িতে জল নে। মিঠাই মণ্ডা, লুচি।'
খায় আর খায়।
তবে সব দিন তো সমান যায় না।
ওখড়া না বলে পারে না, 'চল খ্যাতা তোর মাকে খুঁজি। কী নাম বললি! অখিল দাস!'

বিশাল প্রাসাদ বাড়িটায় সত্যনারায়ণের পূজা। বনো উপোস করেছে। অখিল দাসেরও উপোস। বউদিমণি উপোস করতে পারে না। বউদিমণির হয়ে বনো উপোস করেছে। বনো এখন ধর্মে কর্মে এই বাড়ির প্রকৃতই

বিশ্বাসী। তাকে রান্নাঘর সংলগ্ন একটি ঘরও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির আর সব চাকরবাকরদেরও সে সামলায়। ড্রাইভারকে খেতে দেয়, মালিককে খেতে দেয়। বাবু কখন কী খেতে পছন্দ করে তাও সে জানে। অখিল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এবং কন্যাটিকে নিয়ে ভ্রমণেও বের হয়ে যান। বনোর ওপরই বাড়িটার দেখাশোনার ভার থাকে। খালি সফর আলি একটু বেশি ভালো মন্দ খাবার জন্য দিদি দিদি করে।

তবু কেন যে মন মানে না। দাদা মাস মাইনে নিতে আসে। দাদা আজকাল সবসময় খ্যাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছে। মাস্টারমশাইরা তকে খুব ভালোবাসে। খ্যাতা যে কিছু দিনের মধ্যেই ক্ষিতীনারায়ণ গুছাইত নামে খ্যাতি লাভ করবে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কারোর।

বনো ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে, খ্যাতা স্কুলে যাচ্ছে, স্কুলের হাজিরাখাতায় নাম, মাস্টার নাম ডাকছে-ক্ষিতীনারায়ণ গুছাইত-এও দেখে-ক্ষিতীনারায়ণ মনোযোগ সহকারে শ্লেটে অঙ্ক কষছে।

আর তখনই 'মা' ডাকে ঘুমটা চটকে গেল।

মা ডাকছে কে!

দিবানিদ্রা চটকে গেলে আজকাল বনোর মাথা ঘোরে। তবু তো মা বলে কেউ ডাকে!

আর তখুনি লম্বা হাত, 'মা রুটি দে। সারাদিন খাইনি।'

'ক্যারে!'

'আমি মা খ্যাতা।'

সর্বনাশ। এ কী চেহারা হয়েছে। দরজা খুলে দিতেই নোংরা জামা প্যান্টে বনোকে জড়িয়ে ধরেছে খ্যাতা। কী হবে! ভাগ্যিস বাবুরা কেউ নেই। বউদিমণি অফিসে। লিলিদি স্কুলে। বাবু, জ্যোতিষার্ণব বিরাজিত মহর্ষির কাছে গেছেন-শনি সত্যানারায়ণ পূজা, পাঁঠাবলি এবং গ্রহশান্তি সত্ত্বেও রাহুর কোপ লাঘব হয়নি।

'ছাড় ছাড় খ্যাতা, কী করে এলি? ওরে আমার কী হবেরে!'

'রুটি দে মা। ওখড়া আমাকে মেরেছে। কেবল বলছে, যা মা-র কাছে যা। রুটি নিয়ে আয়-খুঁজেপেতে মাকে যখন পাওয়াই গেল, তখন বসে আছিস কেন। যা!'

সে রাজি হয়নি।

বাড়িটায় কে না কে থাকে। ওখড়া খবর এনেছে তার মা-ই থাকে। এই সময়ে বাড়িটায় কেউ নেই। শুধু ক্ষিতীনারায়ণের জননী বনবাসিনী আছে। এমন সুসময়ে বসে থাকলে চলে! আরে যা খ্যাতা।

'হু, যাই আর ধরা পড়ি, কে না কে!'

'তোকে বলছি যেতে। যা না। পাঁচিল টপকে যাবি। চল তুলে দিয়ে আসি। একটা জামরুল গাছ পাবি। বাড়িটার পেছন দিকে তোর মা থাকে। মাথার কাছে জানালা খোলা থাকে। দিবানিদ্রায় মগ্ন। পেছনের দিকটায় কলা গাছ, পেঁপে গাছও আছে। লতাপাতায় বনজঙ্গলও আছে। দরকারে লুকিয়ে পড়তে পারবি।'

তার সাহস হয়নি। ওখড়া আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ মিলে পিঠের ওপর পিঠ দিয়ে তাকে পাঁচিল টপকে ফেলে দিয়ে গেছে। একবার যোগাযোগ হয়ে গেলে সুস্বাদু সব খাবার অনায়াসে পাচার করা যাবে।

বনোর এখন মাথা খারাপ অবস্থা। কে কখন দেখে ফেলবে-সে তাড়াতাড়ি পাথরের বাটিতে এক বাটি সিন্নি দিল খেতে। তারপর লুচি মালপোয়া। কলাপাতায় নিয়ে সামনের করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ এদিকটায় বড়ো আসে না, এলেও অসুবিধা নেই। সে তার কম্বল রেডি করে রেখেছে। যদি আসেই, খ্যাতার উপর ছুড়ে দিলেই হবে। কম্বলে ঢাকা পড়ে গেলে কার আর দায় পড়েছে কম্বল নিয়ে মাথাব্যথার।

খ্যাতার গবাগব খাওয়া শেষ।

'মা রে!' বলে এক লাফ।

'মা রে, কত বড়ো বাড়িরে!'

তারপরই দৌড়। সে লাফায়। এত বড়ো বাড়ি দেখে এত সব জীবনধারণের সমারোহ দেখে খ্যাতার উল্লাসের অন্ত নেই। বনো তাকে ধরতে যায়, ছুটে পালায়। আর এটা কী, ওটা কী-করে।

'ওরে খ্যাতা, তুই পালা। বাবু জানতে পারলে তোকে আমাকে দু-জনকেই হাজতে পাঠাবে রে।'

কে শোনে কার কথা!

সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বনোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে শুরু করেছে। এত সুস্বাদু খাদ্য পেটে চালান হওয়ায় খ্যাতা তার মাথাও ঠিক রাখতে পারছে না। এমন পরিপাটি সাজানো-গোছানো, ধবধবে সাদা বিছানা, বড়ো বড়ো সেগুন কাঠের খাট-কত ঘর সব, এটায় দিদিমণি থাকে, এটায় বউদিমণি থাকে, এটায় দাদাবাবু থাকে, আরে খ্যাতা কী করছিস?

খ্যাতা খাটে উঠে লাফায়, খ্যাতা মেঝেতে লাফায় আর বনোর মাথা ঘুরতে থাকে।

দেওয়ালে মানুষের কালো ছোপ, সাদা চাদরে পায়ের কালো ছোপ-কী করে আর বনো! হাত ধরে টানতে টানতে বনো খ্যাতাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়।

তারপরই বেল বেজে উঠল-ক্রিং ক্রিং।

শিগগির পালা খ্যাতা। পলিথিনের ব্যাগে লুচি আলুরদম আছে। শিগগির পালা।

খ্যাতা দরজা পার হয়ে এক লাফে জামরুল গাছে। তারপর পাঁচিল বেয়ে নামতেই দেখল ওখড়া দাঁড়িয়ে আছে।

শাবাশ ক্ষ্যাতা-সবার জয়ধ্বনি।

অখিল দাস যেন কোনোরকমে বসার ঘরে ঢুকে সোফায় বসলেন।

বনো ছুটে গেছে।

'বাবু আপনার শরীর খারাপ।'

'এক গ্লাস জল।'

মিনা করা গ্লাসে জল দিলে, বললেন, 'খুব খারাপ খবর বনো। ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন উড়ে আসছে।'

'শকুন! কোথায় শকুন!'

'হ্যাঁ বনো। গুরুদেব বললেন, তুমি নিজেই টের পাবে-শুধু একা খেলে শকুনের উপদ্রব বাড়ে-ভূতের উপদ্রবেও পড়ে যেতে পারি। বাড়িটায় অশুভ প্রভাব পড়েছে।'

হয় নাকি!

আর রাতের বেলায় হঠাৎ লিলি চিৎকার করে উঠল-'বাবা ভূত!'

'কোথায়?'

'জানালায়।'

'যা!' অখিল বিশ্বাস করছেন না।

'দেখো না, দেওয়ালে ভূতের কালো ছোপ বসে গেছে।'

খ্যাতা যে দেওয়ালে ঠেস দিয়েছে সেখানেই মানুষের কালো রঙের অবয়ব, সেখানেই নোংরা। সেখানেই আস্ত ভূতের নড়ানড়ি।

অখিল আর কথা বলতে পারলেন না। কেমন তাকে বোবায় ধরেছে। শরীরে ঘাম। মুখ থেকে লালা বের হচ্ছে।

তবু কোনোরকমে বললেন, 'এ বাড়িতে থাকা যাবে না।'

বনো সাহস দিল, 'আমি তো আছি বাবু। আমি তো সব জানি বাবু।'

'তুমি কচু জান। লিলি মা আমার, তোর মা কোথায়?'

'মা রাস্তায়। ভয়ে বাড়িটায় ঢুকবে না। ফুলের বাগানে ভূতেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে মা স্বচক্ষে দেখেছে। আমি মিছে কথা বলছি না বাবা।'

আর পারা যায়! তারপর শকুনের ওড়াউড়ি শুরু হবে। তার চেয়ে হাত-পা খিঁচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা ঢের ভালো।

অখিল সম্পূর্ণ বাক্যহারা। 'তো তো' করছে। সে প্রকৃতই আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেল।

চিঠির রহস্য

রাঙাজেঠুর বাড়ি থেকে ফিরে বুমবাই কেমন চুপচাপ। কথা কম বলে। একা একা থাকতে ভালোবাসে। ঝুপিকে ওর ঘরে ঢুকতে দেয় না সহজে। ঝুপি মানবে কেন! দাদার ঘরে সে লাফাতে না পারলে মজা পায় না। এই নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে। ঝুপি ঢুকলেই হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, নালিশ, 'মা, ঝুপিকে বারণ করে দাও। আমার বই-খাতা যেন না হাঁটকায়।'

মা তার দিকে তখন তাকিয়ে থাকেন। মেজাজ ঠিক রাখতে না পারলে চিৎকার করেন, 'তোমার কী হয়েছে! জেঠুর বাড়ি থেকে ফিরে দেখছি সবার মাথা কিনে নিয়েছ! একটা বোন, তাকেও তুমি ঘরে ঢুকতে দেবে না! তুমি কী ভেবেছ!'

আসলে বুমবাই কী করে বলবে, সে অরুকে একটা চিঠি লিখছে। অরুকে চিঠি লিখলে গোপনে লিখতে হয়। কারণ সে আর কাউকে চিঠি লেখে না। আগে ছোটো থাকতে রাঙাজেঠুকে চিঠি লিখত লুকিয়ে। মা একদম পছন্দ করেন না রাঙাজেঠুকে। ঠিক পরীক্ষার সময় হাজির। আর 'এটা করা ঠিক না বউমা, ওটা করা ঠিক না বউমা! এত পিছু লেগে থাকবে কেন? ছেলেমানুষ, দুষ্টুমি করবে না? সবসময় পড়তে ভালো লাগে? তোমার লেগেছে?' এসব বললে মা গজগজ করতেন। 'কী আক্কেল রে বাবা! পরীক্ষার আগে এসে ভাইপো-ভাইঝিকে নিয়ে এখানে-ওখানে চলে যায়! তাও যদি নিজের ভাই হত।' আড়ালে গজগজ করলে বুমবাই কেমন ফ্যাসাদে পড়ে যেত। 'ইস, যদি জেঠু শুনে ফেলে, কী কেলেঙ্কারি না হবে!'

জেঠুর সরল সাদাসিধে জীবন মা সহ্য করতে পারেন না। এবারে বুমবাই বাবার সঙ্গে জেঠুর বাড়ি ঘুরে এসেছে। জেঠু অসুস্থ, খবর পেয়েই বাবা আর স্থির থাকতে পারেননি। মানুষটা একা, কষ্ট তো হবেই। বাবার সেই এককথা, 'আমরা মামাবাড়িতে মানুষ। দাদারা নিজের দাদা নয় মনেই হত না। একসঙ্গে পুকুরে সাঁতার কেটেছি, কাছের নদী পার হয়ে গেছি নৌকোয়। মাছ ধরতে গেছি মেঘনায়। বর্ষায় নৌকো-বাইচ, কাছারিবাড়িতে ফুটবল, মাতির মার বাতাবি লেবুর গাছ সাফ-' বাবা তাঁর ছেলেবেলাকার কথা বললে জেঠুর

কথা আসবেই। জেঠু নাকি ছিলেন ভীষণ গোঁয়ার। একবার পরীক্ষা দেবেন না বললেন, আর দিলেনই না। যাত্রাগান শুনতে চলে গেলেন।

বাবা শুধু রাতে খাবার টেবিলেই গল্প করার সময় পান। কতদিন কেন যে বাবা তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর বলতেন, 'তোদের পুঁটিমাছের জীবন, বুঝলি, অল্প জলে ফড়ফড়, গভীর জলের কথা জানলিই না।' আসলে, মাকে খোঁটা দেবার এটা একটা মোক্ষম পদ্ধতি। বন্দি জীবন। সকালে একগাদা টাস্ক, স্কুলের ইউনিফর্ম ইস্তিরি, টিফিন, বই-খাতা সাজিয়ে-গুছিয়ে ব্যাগে ভরে দেওয়া, হাত ধরে রাস্তায় গিয়ে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, সারাটা দিন মার এই ব্যস্ততা বাবার পছন্দ নয়। কেবল ঝুপি আর বুমবাই। আর ঝুপি। এ ছাড়া জীবনে আর কিছু আছে, মা তা বোঝেন না। গাছের পাতা-ঝরা টের পান না। ফুল ফুটলে গন্ধ পান না, অবারিত মাঠে হেঁটে যাবার যে আনন্দ, মা জানেন না। মা শুধু তাঁর বাপের বাড়ির গৌরব জাহির করতে ব্যস্ত। তাঁর ন-কাকা কী করেন, দাদারা অধ্যাপক, ব্যাঙ্কের কেরানি, কেউ বেনারসে স্টেশন-মাস্টার, কেউ বাঙ্গালোরে এইচ.এম.টি.র সুপারভাইজার। দাদা-বউদিদের প্রশংসা ছাড়া কিছু বোঝেন না। বাবার দিকের কাউকেই সহ্য করতে পারেন না। জেঠুর কথা উঠলেই এককথা, 'এই তো একা পড়ে থাকছেন, ছেলেরা খোঁজ পর্যন্ত নেয় না।' ইস, তখন তার কী যে রাগ হয়! জেঠুও হয়েছেন তেমনি! 'আর পুত্র! পুত্র না, সব শত্রু। দুটোই অমানুষ। অপদেবতা।'

বুমবাই এবারই প্রথম জেঠুর বাড়ি গেছে। জেঠুর কলকাতায় বিশাল বাড়ি। সেখানে থাকেন না। রিটায়ার করে সব ফেলে রেখে গাঁয়ের বাড়িতে উঠেছেন। একা মানুষ। মাঝে মাঝে বের হয়ে পড়ার স্বভাব। যেখানে যত ভাই-বোন আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াবার স্বভাব। বাবার টানেই জেঠু বছরে দু-বছরে একবার এখানে চলে আসেন। এসেই বলবেন, 'তোদের দেখার জন্য ছটফট করছিলাম। ভালো লাগছিল না। চলে এসেছি। বুমবাই কই রে, শোন।' যেন জেঠু কবে আসবেন, এই আশায় সারাটা বছর কাটিয়ে দেয়। জেঠু এলে স্বাধীন। মার কোনো কথাকেই জেঠু গুরুত্ব দেন না, 'চল আমার সঙ্গে...' বলেই বের হয়ে পড়া। এই শহরের বাইরে যে উদার প্রকৃতি আছে, শাল গাছের জঙ্গল, ফড়িং, প্রজাপতি, সবুজ ঘাস, নদীর জল, জেঠু না এলে সে টেরই পেত না। সেই জেঠুকে আড়ালে হেনস্থা করতে পারলে মার বড়ো সুখ। বুমবাইয়ের যে তখন কী রাগ হয়! 'একদম জেঠুকে দোষ দেবে না!' কত করে বলেছেন, 'বউমা, সবাইকে নিয়ে বেড়িয়ে এসো। গ্রাম জায়গা। ভালো লাগবে।' মা কিছুতেই যাননি।

মার এককথা, 'আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই!' বাবাও কতবার ছুটিছাটায় বলেছেন, 'চলো, রাঙাদার বাড়ি ঘুরে আসি। বাসে ঘণ্টা চারেক, ট্রেনে ঘণ্টা পাঁচেক, মামারা এ-দেশে এসে কেমন বাড়িঘরে থাকতেন, দেখাই হল না।'

মার এককথা, 'তোমার ইচ্ছে হয় যাও। আমার সময় হবে না।'

সময় হবে না! কত জায়গায় যায় তারা, এই তো গতবার শিলং-এ কাটিয়ে এল কতদিন, এই তো বাবা কাজে রাঁচি গেলেন, সঙ্গে সবাই। কেবল জেঠুর বাড়ি অনেক দূর, সেখানে যাবার নাম শুনলেই মার মুখ গোমড়া। বাবাও সাহস পাননি। মা তার কী নিষ্ঠুর! বাবার দিকটা একদম বোঝেন না। তখন তার ইচ্ছে হয়, সে তার মামাবাড়ি আর কোনোদিন যাবে না। ছুটি হলেই মামার বাড়ি-যেন এর চেয়ে বড়ো স্বর্গসুখ মার আর কিছু নেই। স্বার্থপর! বাবাও যে কী! মাকে এত ভয় পান কেন যে, বোঝে না।

শেষে এবারে যে বাবা রাঙাজেঠুর বাড়ি গেলেন, সে যেন দায়ে পড়ে। রাঙাজেঠুর হার্ট অ্যাটাক। সব আত্মীয়স্বজনরা ছুটছে। বাবার কাছেও খবর পৌঁছে দিয়েছেন পিসি। 'আমরা রওনা হচ্ছি। তুমি পার তো রাঙাদাকে দেখে এসো।' বাবা অফিস থেকে ফিরে মুখ গোমড়া করে বসে ছিলেন, যেন একটা বড়ো পৃথিবী থেকে তাঁর নির্বাসন ঘটেছে। মা কী টের পেলেন বুমবাই জানে না, কেবল বলেছিলেন, 'তুমি যাও না। দেখে এসো। আমি কি যেতে বারণ করেছি?' বাবা সকাল হলেই বলেছিলেন, 'যাবি বুমবাই? তোর রাঙাজেঠু খুব অসুস্থ। তোকে দেখলে খুশি হবে।' সে বাবার সঙ্গে না গেলে টেরই পেত না পৃথিবীটা তাদের এই ছোট্ট

উপনগরীতে বন্দি হয়ে নেই। অরু বলে সরল নিষ্পাপ পরির মতো সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে আছে, সে জানত না। রাঙাজেঠুর নাতনি। দাদা নাসা না কোথায় কাজ করে। নাসা কেমন জায়গা, সে জানে না। সেখানে সব রকেট সাজানো, উপগ্রহ ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে। চ্যালেঞ্জার। আরও কী সব। বড়দার বিশাল গাড়ি, মেম-বউদির ভাঙা ভাঙা দুটো-একটা বাংলা কথা শুনলে সে কী যে মজা পেত!

আর গিয়েই সে অবাক! জেঠু বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন। 'বুমবাই এয়েছে! অরু, শিগগির আয়, বুমবাই এয়েচে।' কেমন বালকের মতো অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বিশাল বাড়ি। গাঁয়ের বাড়িতে ইলেকট্রিকের আলো, সামনে মাঠ, শস্যখেত, কত গাছপালা, আশ্রমের মতো সাজানো-গোছানো। অরু কোথায় ছিল কে জানে, কে যেন দৌড়ে গিয়ে অরুকে কোলে তুলে নিয়ে এসেছিল, সাদা ফ্রক পরা, বাদামি রঙের বব-ছাঁট চুল, চোখ গভীর নীল। কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে শুধু তাকিয়ে ছিল বোকার মতো। জেঠু ইংরেজিতে বলছেন, 'ইয়োর আংকল। বাংলায় বল, বল কী হবে?' অরু কিছু বুঝতে পারছে না। জেঠু আবার বলে দিচ্ছেন, 'ইয়োর আংকল মানে তোমার কাকা। কী, মনে থাকবে তো?'

অরু ঘাড় কাত করে দিল। কিছু বলল না। তারপর দৌড়ে পালিয়ে গেল।

জেঠুর কী ক্ষোভ। বাবা পাশে বসে বলছেন, 'তোমার শরীর কীরকম?'

'কেন, ভালোই তো আছি। মহাদেবটা মহা পাজি। আমার কী একটু হয়েছে, রাজ্যে রাজ্যে ঢাক পিটিয়ে দিয়ে এসেছে। ডাক্তার বলছে, ওই যে-রকম বলে আর কি... আজকাল সব ডাক্তারও হয়েছে তেমনি...বিশ্রাম। কোথাও হুটহাট বের হয়ে পড়া চলবে না।...বড়ো ছোটো দুটোই এসেছে। গেল কোথায় এই!-বলে হাঁক দিতে গেলেই মহাদেব প্রায় যেন ডান্ডা হাতে হাজির। 'আবার চ্যাঁচামেচি। ডেকে দিচ্ছি।'

বাবার দিকে তাকিয়ে কেমন আহত গলায় বললেন, 'বউমা এল না? ঝুপি? এই সুযোগে আসতে পারত। খুব আশা করেছিলাম বউমা আসবে। আমার তো কেউ নেই। বড়োটার যে কী বাতিক, আরে দেশের কথা ভাবলি না। পরের গোলামি করছিস! এত অমানুষ তুই! ছোটোটাও তাই। এত করে বলছি, হোম সেক্রেটারিকে লেখ, বাবা একা, আমাকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বদলি করুন। না, তিনি চম্বলের ডাকাতদের শায়েস্তা করবেন। রাতে একা বের হতে ভয় পেতিস, তোর মা সঙ্গে না উঠলে বাইরে যেতিস না, তুই ঠেঙাবি ডাকাত! সরকার আর লোক পেল না। ভিতু কোথাকার! আর তুই কিনা ডাকাতদের শায়েস্তা করবি। তা হলেই হয়েছে।'

মহাদেবদা কেবল গজগজ করছে, 'তোমার না কথা বলা বারণ? ওঠো। চলো, শোবে।'

'ওরা কোথায়?'

'আসছে।'

'বউমারা?'

'আসছে। ওঠো তুমি।'

বাবাও বললেন, 'চলো, ঘরে গিয়ে শোবে, কথা বলবে না।'

কে কার কথা শোনে। বড়দা-ছোড়দা হাজির। কী লম্বা আর কী স্বাস্থ্য। কী সুপুরুষ। পাজামা-পাঞ্জাবি গায়ে। জেঠু বললেন, 'চিনতে পারছিস?'

বড়দা-ছোড়দা গড় হল।

মেম-বউদি এক কোনায় দাঁড়িয়ে। ছোটো বউদি, পিসিরা।

সে বুঝতে পারছে, জেঠুর কত লোকবল। কত আত্মীয়স্বজন। তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'বুমবাই তোর বড়দা, প্রণাম কর। তোর ছোড়দা, তোর বড়ো বউদি, ছোটো বউদি। প্রণাম কর। বউমা, বড়ো বউমা কোথায়?' বড়দা ইশারা করলে, বড়ো বউদি গড় হল বাবার পায়ে। জেঠু বলছেন, 'ইয়োর ফাদার-ইন-ল। মাই কাজিন। বাংলা কী হবে, বলো, তোমাকে বউমা বলেছি, আত্মীয়স্বজন-সম্পর্ক আমাদের কার সঙ্গে

কেমন হয়। খুড়শ্বশুর। মনে থাকবে? আমার পিসতুতো ভাই। মনে থাকবে? চিঠিতে এতবার লিখেছি, মনে থাকে না কেন?' বউদি বালিকার মতো ঘাড় কাত করে মিষ্টি হাসল।

তারপর ওরা চলে গেলে জেঠু বললেন, 'হাত-মুখ ধুয়ে নে। সেই কখন বের হয়েছিস। রান্নাবাড়িতে খবর পাঠা মহাদেব। বুমবাই সেই কখন সকালে বের হয়েছে।'

বাবা বললেন, 'আমরা গাড়িতে খেয়েছি। তুমি অযথা বুমবাইকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না।'

একসময় জেঠু করুণ গলায় বাবাকে নালিশ দিলেন, 'জীবনটা আমার মাটি। দুটো ছেলেই অমানুষ। আমার একমাত্র নাতনি, বুঝলি, বাংলা বোঝে না। ঠাকুরদার নাম ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না। আমার পিতামহের নাম জানে না। আমার বাবার নাম জানে না। ক-দিন থেকে লেগেছি। সারাদিন নাতনিটা আমার গা লেপটে থাকে।' বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন, 'একমাত্র বংশের বাতি, সেই বাংলা জানে না, রবি ঠাকুরের নাম জানে না। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর বিখ্যাত ভুবনে-এই তুমি বিখ্যাত? আমার একমাত্র বংশের বাতি সে তোমার নাম জানে না! কী কষ্ট বল।'

বাবা কেমন খেপে গিয়ে বললেন, 'দিন-দিন তুমি ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ রাঙাদা। ওরা তো রত্ন। ওদের সম্পর্কে অপবাদ দিতে কষ্ট হয় না?'

রাঙাজেঠু কেমন হতাশ গলায় বললেন, 'বুমবাই বড়ো হলে বুঝবি। আমার কী কষ্ট বুঝবি। তোর বউদি বেঁচে নেই, রক্ষে। তাকে এসব দেখতে হল না।' জেঠু আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

সকালে বাড়িটায় সূর্যের আলো এসে পড়েছে। শীতকাল। খেজুরের রস নিয়ে একটা রোগা লোক বারান্দায় বসে। জেঠু সবাইকে ডেকে তুলে দিয়েছেন। খেজুরের রস কী সুস্বাদু। এই শীতের সকালে, অরুকে আর মেম-বউদিকে বোঝাচ্ছিলেন। মেম-বউদি সুবোধ বালিকার মতো কাচের গ্লাস হাতে নিয়ে রস খাচ্ছে। অরু খেতে চাইছে না। বড়দা মহা ফাঁপরে পড়ে গেছে। রাঙাজেঠু পাশে বসিয়ে গেলাস হাতে নিয়ে জীবনে যে মাধুর্য শৈশবে উপভোগ করতেন খেজুরের রস খাওয়ার মধ্যে, তা অরুকে দিয়েও অনুভব করাবার চেষ্টা করছিলেন। সকালেই তিনি বলেছিলেন, 'বুমবাই, তুই তো ইংরেজি মিডিয়ামে পড়িস। ওকে তুই যতটা পারিস, সঙ্গ দিস। গাছপালার নাম, আমাদের মহাপুরুষদের নাম, সব শেখাবি।'

আর এদিকে শেখাতে গিয়ে মহা বিপাকে পড়ে গেছিল বুমবাই।

'মাদার গাছ।'

'মাডাগাস।'

'মাডা নয়। মাদার।'

'মাদা।'

'আরে, তোর দেখছি র-উচ্চারণের স্বভাব নেই। হাসাহাসি হবে, বুঝলি? বল, হাসাহাসি।'

'হাসাহোসি।'

'তোর মুণ্ডু।'

যে ক-দিন ছিল, অরুকে বাংলা শেখাতে গিয়ে সে বিপর্যস্ত হয়েছে, 'আবার আংকল! বলছি না, কাকা বলবি।'

'কা...কা...।'

'খেজুর গাছ।'

'খ্যাজু গাছ।'

'খেজুর। খেজুর বলতে পারিস না! যাছি না, যাচ্ছি। বল, যাচ্ছি।'

এইসব শেখাবার সময়ই একদিন দেখেছিল, বড়দা-ছোড়দা কামরাঙা পেড়ে খাচ্ছে।

সে ছুটে গিয়ে খবর দিয়েছিল, 'জেঠু, বড়দা-ছোড়দা চুরি করে টক কামরাঙা খাচ্ছে।'

'মরবে। দুটোই মরবে। অভ্যাস নেই। তোরা চুরি করে কামরাঙা খাচ্ছিস। এই মহাদেব, ডাক দুটোকে।'

আর, ডাকবার পর-পরে কী মহাফাঁপরে পড়ে গিয়েছিল ওরা। ঠোঁট মুছে সরল বালকের মতো জেঠুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'কামরাঙা খাচ্ছিলে?'

'না তো!'

'বুমবাই মিছে কথা বলে না। তোমরা কী হচ্ছ দিন দিন। আমাকে একদণ্ড শান্তি দিলে না। অভ্যাস নেই। অসুখ-বিসুখ হলে কে দেখবে। তোমাদের মা কি বেঁচে আছেন, যে তিনি দেখবেন?' তোমরা কি মানুষ হবে না?'

আর-একদিন, সে দেখল, পুকুরপাড়ে বাঁশের জঙ্গলে দুই দাদার তুমুল তর্ক।

'এ-দেশে মানুষ থাকে? থাকতে পারে? অপদার্থ সরকার। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ! ছি! তুই আবার এ-দেশের গর্ব করিস। মানুষের ভাত-কাপড় জোটে না, কী হতশ্রী হয়ে যাচ্ছে দিনকে-দিন।'

ছোড়দা হারতে রাজি নয়, 'ওটা আবার দেশ! মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। সব হিপি হয়ে যাচ্ছে। কোনো মনুষ্যত্ব আছে? ও-দেশে থাকে?'

বুমবাই ছুটে এসে বলেছিল, 'বড়দা-ছোড়দা বাঁশবনে ঝগড়া করছে জেঠু।'

'ইস, আর পারা যাবে না। একদণ্ড মিলেমিশে থাকতে পারে না।...মহাদেব, মহাদেব!'

'কী চ্যাঁচাচ্ছ।'

'আমি চ্যাঁচাচ্ছি?'

'চেঁচাচ্ছ না? চুপ করে বসে থাকো, ডেকে, দিচ্ছি।'

ডেকে দিলে জেঠু গম্ভীর গলায় বললেন, 'ঝগড়া করছিলে?'

'না বাবা।' ছোড়দা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে, 'কখন ঝগড়া করলাম?'

'বুমবাই মিছে কথা বলে না। তোমরা একদণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে শেখোনি। এই তোমাদের দোষ। ভাগ্যিস তোমাদের মা বেঁচে নেই!'

আর সেই থেকে বুমবাই দেখেছে, তাকে দেখলেই দু-জন গাছের ডালপালা দেখতে শুরু করে। একদিন সে তাজ্জব। বড়দা-ছোড়দার জামার বোতাম লাগিয়ে দিচ্ছে। বলছে, 'ঠান্ডা লাগবে ছোটন।' এ-দৃশ্য দেখার সময় সে চোখে জল রাখতে পারেনি। ঝুপি তাকে দু-চোখে দেখতে পারে না।

সে বাবার সঙ্গে ফিরে এসে মনমরা হয়ে আছে। তারা আসার আগের দিন বড়দা আর মেম-বউদি গাড়িতে কলকাতায় চলে গেল। ছুটি শেষ। বিমানের টিকিট কাটা। অরু বলেছিল, 'কাকা, যাচ্ছি।' কী সুন্দর উচ্চারণ। সে মুখ আড়াল করে চোখের জল মুছেছিল। কী যেন তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। আজ দু-দিন ধরেই চেষ্টা করছে একটা চিঠি লেখার। 'মাই ডিয়ার অরু' পর্যন্ত লিখে, তারপর কী লিখবে বুঝতে পারছে না। ঝুপিটার স্বভাব তার বইপত্র হাঁটকানোর। ফাইভে পড়ে। 'মাই ডিয়ার অরু' দেখলে মাকে গিয়ে লাগাতে পারে। ঘরে ঢুকলেই ফের বের করে দিচ্ছে। ঝুপির জেদ, ঢুকবে দাদার ঘরে। তুমুল ঝগড়া। মা তেড়ে আসছেন, 'কেন তোমার ঘরে ঢুকবে না? একশোবার ঢুকবে। এই, আয় তো।'

বুমবাই মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। মার কী রাগ! বাবা এলে নালিশ। 'দেখো, তোমার গুণধর পুত্রের কাণ্ড,' বলে কখন যে চিঠিটা বের করে নিয়েছে জানে না। 'কে অরু? কী লিখেছে দেখো।'

বাবা চিঠিটা পড়ে হেসে উঠলেন, 'খারাপ কিছু তো লেখেনি। লিখেছে, 'অরু, তুমি বাংলা ভুলে যাবে না। কী জাদু বাংলা গানে।' লিখেছে, 'জেঠুকে দেখলে কষ্ট হয়। তুমি বাংলায় কথা না বললে জেঠু স্বর্গে গিয়েও সুখ পাবে না। বড়দাকে বলবে, তোমাকে যেন বাংলা শেখায়। বাংলা বই কিনে দেয়। এ-দেশের গাছপালা, জীবন সম্পর্কে, বড়ো মানুষ সম্পর্কে যদি খবর না রাখো, তবে শেকড় থাকবে না তোমার। দেয়ার ইজ সুইট মিউজিক ইন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ।'

বাবা তাকে কাছে ডেকে বললেন, 'তুই এত সুন্দর চিঠি লিখতে শিখে গেছিস! তুই...তুই...লিখেছিস! দেশের জন্য, জেঠুর জন্য, অরুর জন্য তোর এত মায়া!' বলে বাবাও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

কার হাত?

আমার বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়। কাগজের অফিসে কাজের চাপ থাকলে যা হয়। কোনো খবর বাদ না যায়, আবার গুরুত্ব পাবে কোন খবর, কী মেইন হবে, সেকেন্ড মেইন কিংবা আরও সব দেখেশুনে মোটামুটি কাগজের প্রথম পাতার লে-আউট দেখে ফিরতে হয়। অফিস থেকে গাড়িতে ঘণ্টা খানেকের পথ। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা, কখনো বারোটা হয়। একমাত্র স্ত্রী এবং রান্নার লোকটা বাদে অত রাত পর্যন্ত কেউ জেগে থাকে না। কোনোদিন মেজো ছেলে পড়াশোনার চাপ থাকলে জেগে থাকে। কিন্তু সেদিন বাড়ি ফিরে দেখছি সবাই জেগে। রাত নেহাত কম হয়নি। দু-পাশের বাড়ি-ঘরের আলো নেভানো। শুধু রাস্তার আলো জ্বলছে। আর মাঝে মাঝে রাস্তার কুকুরগুলি এলোপাথাড়ি দৌড়োচ্ছে। কখনো ঘেউ ঘেউ করছে। গেট খুলে দেয় রান্নার লোকটা। দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখি ছোটো মেয়ে দৌড়ে আসছে। কাছে এসেই বলল, 'জান মেজদা না সেই কঙ্কালটা নিয়ে এসেছে!'

আমি জানি। এটা আমার জানার কথা। বিস্ময়ের কিছু নেই। ডাক্তারি পড়তে গেলে ওসব লাগে। তবে বিস্ময় না থাকলেও মনের মধ্যে কেমন একটা খিঁচ ধরে গেল। শত হলেও নিজের বাড়ি বলে কথা। তা ছাড়া সংস্কার যাবে কোথায়। বললাম, 'কোথায় রেখেছে ওটা?'

'দাদার খাটের নীচে।'

'খাটের নীচে রাখতে গেল কেন? সিঁড়ির চাতালে রেখে দিলেই পারত!' সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এসব বলা বোধ হয় ঠিক হল না। কঙ্কালটা সম্পর্কে আমারও ভীতি আছে-এই কঙ্কাল নিয়ে আসার ব্যাপারে বাড়িতে কিছুটা ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি গিন্নি এবং ছোটো মেয়ে সোনালির! একদিন খেতে বসে সমীর কঙ্কালের কথা তুলতেই, খাওয়ার পাত থেকে সোনালি উঠে পড়েছিল-'আর সময় পেলি না মেজদা।'

সমীর অবাক। সে বলেছিল, 'তোদের বাড়াবাড়ি!'

খেতে বসে সমীরের সাহস দেখে বেশ গর্বই হয়েছিল। এইতো তার আঠারো পার হয়েছে। কঙ্কাল সম্পর্কে ওর কোনো খিঁচ নেই। ডাক্তারি পড়তে গেলে ওসব থাকলে হয়ও না। কিন্তু তাই বলে খাটের তলায় রেখে উপরে সে ঘুমোবে ভাবতেও আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল।

যেন কিছুই না ব্যাপারটা, আমি জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে ঢুকতে গেলে সোনালি ফের বলল, 'বাবা, তুমি কঙ্কালটা দেখবে না?'

'ওটা আবার দেখার কী আছে!'

স্ত্রী বলল। 'সমীরের ঘরে তুমি বরং আজ শোও। ও একা থাকবে!'

সমীর বোধ হয় দোতলার ঘর থেকে সব শুনতে পাচ্ছে। সে চিৎকার করে বলল, 'তোমাদের কী হচ্ছে!'

আমিও বললাম, 'ওটাতে তো আর কিছু নেই! ভয়ের কী?'

বাড়িটায় লোকের চেয়ে ঘরের সংখ্যা বেশি। এক-এক ঘর এক-এক জনের। কেবল, নীচের ডাইনিং স্পেসে, রান্নার লোকটা শোয়। সোনালি নিজের ঘরে শুতে যায়নি। সে তার মার সঙ্গে শোবে বলে বায়না ধরে বসে আছে। একা কোনো ঘরে ঢুকছে না।

আমি জানি এসব কুসংস্কার থাকা ভালো না। আসলে কঙ্কালটা আসায় বাড়িতে বেশ একটি ভূতুড়ে পরিবেশ যেন সৃষ্টি হয়ে গেছে। এসব ভালো লক্ষণ না। সুস্থতার লক্ষণ না। বললাম, 'চল কঙ্কালটা দেখি।'

'আমি যাব না বাবা! তুমি যাও!'

সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতেই দেখি সমীর উবু হয়ে বেতের ঝুড়ি থেকে একটা হাড় টেনে বের করছে। বোধ হয় সে মিলিয়ে দেখছে, সবগুলি হাড় ঠিক ঠিক সে পেয়েছে কি না। আমাকে দেখেই হাড়টা তুলে বলল, 'বলো তো এটা কোথাকার হাড়!'

'আমি কী করে জানব?'

'হাতের। হাড়টার নাম হিউমারাস।'

হিউমারাস বলার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের দিকে চোখ গেল। একটা পুরো আর্টিকুলেটেড হাতের কঙ্কাল টেবিলে। আঙুলগুলো ছড়ানো। সত্যজিৎবাবুর মণিহার ছবিতে এমন একটা হাতের কঙ্কাল ঝপাৎ করে পড়তে দেখেছিলাম। ঠিক সেইভাবে হাতের কঙ্কাল তার আঙুরগুলো ছড়িয়ে রেখেছে। ভেতরে কেমন যেন কেঁপে উঠলাম। কঙ্কালটা আলগা থাকলে এতটা বীভৎস লাগত না।

বললাম, 'সবই আলগা এনেছিস? এ হাতটা কেন আবার জোড়া লাগানো!'

সমীর বলল, 'যা পাব তাইতো আনব!'

সোনালি নীচ থেকে বলছে, 'দেখলে বাবা?'

'দেখলাম তো! তুই আয় না। ভয়ের কী আছে?'

'ওরে বাব্বা।' সে ছুটে পালিয়ে তার মায়ের কাছে বোধ হয় চলে গেল। সমীর হঠাৎ বলল, 'সোনা বড়ো জ্বালাতন করছে। মাও কেমন আমার ঘরে পা দিচ্ছে না বিকেল থেকে।'

বিষয়টাকে হালকা করে দেবার জন্য বললাম, 'মানুষের সংস্কার যাবে কোথায়! কোথাকার কোন অপমৃত্যুর ফলে এটা হয়েছে কে জানে! গেরস্ত ঘরে এটা প্রথম প্রথম হয়। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে জ্যান্ত আস্ত কঙ্কাল তো?'-আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, ভূত-টুতের আশঙ্কায় তোমার মা কেমন ত্রস্ত। থাকতে থাকতে দেখবে, সব সয়ে গেছে। এটা যেই-না ভাবা, অবাক, দেখি টেবিলের সেই কঙ্কালটা কেমন চকিতে কোনো নারীর সুন্দর সুগোল হাত হয়ে গেল এবং হাতে শাঁখা! আমি খুবই ঘাবড়ে গেছি। বদহজম হবে-টবে। চোখ ঝাপসা হতে পারে। ভালো করে দেখতেই বুঝলাম, ওটা কঙ্কালই। কঙ্কালের একটা হাত। তবু এটা কেন দেখলাম! মনের গোলমাল হতে পারে। বের হয়ে আসার মুখে বললাম, 'কঙ্কালটা কি মেয়েমানুষের?'

সমীর বলল, 'হ্যাঁ। কেন বলো তো?'

সঙ্গেসঙ্গে মনে হল, শীতের রাতেও আমি ঘামছি। তাড়াতাড়ি নিজেকে আড়াল করার জন্য সিঁড়ি ধরে নামতে থাকলাম। বেশি কৌতূহলও প্রকাশ করতে পারছি না। আমি তো বাড়ির অভিভাবক, আমিই যদি ঘাবড়ে যাই তবে আর সব যাবে কোথায়! দীর্ঘকালের সংস্কার থেকে এসব হচ্ছে। ঝেড়ে ফেলা দরকার। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছি।

বাথরুমে ঢুকে হাতে মুখে ভালো করে জল দিলাম। নীলাভ আলোটা জ্বলছে বাথরুমের। কেন যে এমন দেখলাম। স্পষ্ট চোখের উপর কোনো বিবাহিত নারীর হাত ভেসে উঠল কেন! বাথরুম থেকে বের হয়ে নীচে খেতে গেলাম। খাবার টেবিলে স্ত্রী পাশের চেয়ারে বসে এটা-ওটা এগিয়ে দেয়। কী জানি কেন, ওর হাতের দিকে আমার চোখ গেল। চোখ সরাতে পারছি না। আমি যে খাচ্ছি না, স্ত্রী লক্ষ করে বলল, 'কী ব্যাপার, আমার হাতে কী দেখছ!'

কেমন বোকার মতো বললাম, 'না, কিছু না।'

কিন্তু ভেতরের খিঁচটা গেল না। রাতে কেন জানি ভালো ঘুমও হল না। পাশের ঘরে সমীর, তার খাটের নীচে একটা কঙ্কাল। কেমন একটা অলক্ষুণে ব্যাপার ঘটে গেল চোখের উপর-তা ছাড়া যদি সমীর ভয়-টয় পায়-এসব দুশ্চিন্তায় প্রায় সারাটা রাতই এপাশ-ওপাশ করলাম। সাহসেও কুলাচ্ছে না যে যাব ওর ঘরে। ঘর থেকে কঙ্কালের ঝুড়িটা চাতালে তুলে রাখব। যেন ওঘরে গেলেই হা হা করে তেড়ে আসবে হাতটা। হাওয়ায় কিংবা বাতাসে একটা কাটা হাত ভেসে বেড়াতে দেখলে, কিংবা উপুর হয়ে পড়ে থাকলে কার না ভয় লাগে!

কাচের জানলায় দেখলাম, কখন পুব আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। দিনের আলো ফুটতেই কেমন সব অস্বস্তি কেটে গেল। সমীর ঠিকঠাক আছে তো! ভিতরে ভয় ধরে যেতেই ওর ঘরের দরজার লক খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে সমীর। ওর মাথার কাছে সেই হাতের কঙ্কালটা। ওটা তো টেবিলে ছিল, রাতে ওর মাথার কাছে এনে কে ওটা রাখল!

সমীরকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করতে পারি, হাতের কঙ্কাল এখানে কে রাখল! কিন্তু সাতসকালে, সকালই বা বলি কী করে, এখনও অন্ধকার ভাবটা ভালো করে কাটেনি, আর এত সকালে তো আমি উঠি না-এসব মনে হতেই খুব সন্তর্পণে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম চোরের মতো। যদি জেগে গিয়ে দেখে আমি তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ-ঘাবড়ে যেতে পারে।

সকালে চা খাবার দিলে দেখলাম, সমীর স্নানে যাচ্ছে। আটটার মধ্যে কলেজে তাকে বের হতে হয়। ডাকলাম, 'শোন।' কাছে এলে বললাম, 'হাড়-টাড় নিয়ে শুতে তোর ঘেন্না হয় না!' ভয় কথাটা ইচ্ছা করেই বললাম না।-'ওটা তো টেবিলে ছিল। ওখানে গেল কী করে? তুই রেখেছিস?'

'কী জানি, মনে করতে পারছি না।'

এতে ধন্দ আরও বেড়ে যায়।-'মনে করতে পারছিস না মানে!'

আমার কথায় সমীর কেমন অবাক হয়ে গেল। আমার মুখে কি সে কোনো ত্রাস দেখতে পেয়েছে! সে বলল, 'আমার অত খেয়াল নেই।'

বিষয়টা আর ঘাঁটালাম না। সে নীচে নেমে গেল। মনের মধ্যে ধন্দটা ঘুচছে না। অশরীরী আত্মা-টাত্মা নিয়েও তেমন আমার একটা বিশ্বাস নেই। কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কী করে। কেমন একটা বিপদের আশঙ্কা ভেতরে অনুভব করলাম। সমীরকে কলেজে যাবার সময় বললাম, 'আইডেনটিটি কার্ড নিয়েছিস তো! সাবধানে যাস।' এসব আমি কোনোদিন দেখি না, কিংবা বলি না, কিন্তু আজ কেন যে বলতে গেলাম।

আমাকে চারটায় বের হতে হয়। সকাল দশটায় সোনা বের হয়ে গেল। ওর মা বের হয়ে গেল সাড়ে দশটায়। এখন বাড়িতে আমি আর কাজের লোকটা। খুবই উচাটনে আছি। স্নান খাওয়া করতে হয়, করা। সবাই ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে হয়। ওপরের ঘরে আর গেলামই না। গেলে হাত দেখব না কঙ্কাল দেখব, এই আশঙ্কায় বেশ মিইয়ে গেছি। বাবা বেঁচে নেই। অশুভ আত্মা সম্পর্কে তাঁর একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বাড়ি করার পর, বাবা রক্ষাকালীর পূজা করে গেছেন। মাস তিনেক ছিলেন, রোজই সকালে চণ্ডীপাঠ করতেন। এসবে নাকি বাড়ি থেকে অশুভ প্রভাব দূর হয়। তখন আমার ছেলে-মেয়েরা ছোটো ছিল, অত

ওরা বুঝত না। কষ্ট না পান ভেবে আমরাও বাবার রক্ষাকালীর পূজা এবং চণ্ডীপাঠ নিয়ে কোনো অবিশ্বাসের কথা বলিনি। এখন কেন জানি মনে হচ্ছে বাবা বেঁচে থাকলে এ নিয়ে পরামর্শ করা যেত।

আশ্চর্য, সোনা দেখছি লাফিয়ে বাড়ি ঢুকছে। খুব খুশি। ওর আজ বার্ষিক পরীক্ষার ফল বের হবার কথা। আমার কিছুই মনে ছিল না। ও এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'বাবা আমি ফার্স্ট হয়েছি।' খুবই সুখবর। তিন বছর ধরে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রথম হবার। কিন্তু হতে পারছিল না। ওর কী আনন্দ। আমার কী মনে হল কে জানে, অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিলাম, আজ যাচ্ছি না।

এমন সুখবরেও কিন্তু মনের খিঁচটা আমার দূর হল না। সমীর ফিরে না আসা পর্যন্ত-যা সব দুর্ঘটনা ঘটে, তার উপর একটা হাতের কঙ্কাল এভাবে ভয় দেখালে কোনো অশুভ ইঙ্গিত থাকতে পারে এমন মনেই হতে পারে। এবং বার বার জানলায় গিয়ে দাঁড়াই। ঘরে বসে থাকলেও উৎকর্ণ হয়ে থাকি, গেট খোলার শব্দ হয় কি না। একবার কী মনে হতে নীচে নেমে গেলাম-দেখি ডাকপিয়োন, চিঠি রমার। বড়ো মেয়ে রমার চিঠি অনেক দিন পাচ্ছিলাম না। চিন্তায় ছিলাম। চিঠিটা খুলে পড়তে আরও অবাক, ওর বর দিল্লিতে বদলি হয়েছে। আসামে ছিল, সেখানে বিদেশি প্রশ্নে গণ্ডগোল, হানাহানি, অরাজকতা, কত কিছু চলছে বছরের পর বছর। বাড়িতে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কী যে হালকা লাগছে! এই করে একসময় সমীর এবং তার মাও ফিরে এল। এবং মনের মধ্যে যে খিঁচ ছিল সেটা একেবারেই উবে গেল। অশরীরী আত্মার প্রভাব তবে এই বাড়িটাতে কোনো অমঙ্গল ডেকে আনেনি।

এরপর বেশ ক-দিন কেটে গেছে। কঙ্কালটা নিয়ে আমাদের মধ্যে যে ত্রাসের ভাব ছিল, সেটা কেটে গেছে। অনেক দিন বিছানা তুলতে গিয়ে দেখা গেছে, ছোটোখাটো দুটো একটা হাড় পড়ে আছে সমীরের বিছানায়। আসলে সে বিছানায় শুয়ে পড়তে ভালোবাসে। প্রথম বছরটা ডিসেকসান আর হাড়ের নাম মুখস্থ করতে করতেই বুঝি কেটে যায়। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়ে সে নিজেই টের পায় না।

হাড়গোড় বিছানায় পড়ে থাকলেও এ নিয়ে কেউ আর কোনো সোরগোল তোলে না। তবে ওর মা চান-টান করে পারতপক্ষে এখনও সমীরের ঘরে ঢুকতে চায় না। আমি আবার স্বাভাবিক-ওটা মনেরই ভুল ভেবে বিষয়টাকে হালকা করতে চেয়েছি। বাড়ির কুকুরটা আগে আমার ঘরে শুত। এখন সমীরের ঘরে শোয়। একদিন কুকুরটা সমীরের ঘরে শুয়েছে কি না উঁকি দিতেই অবাক, যেখানে কুকুরটা শুয়ে থাকে তার পাশেই সেই হাত। কিন্তু এবারে একেবারে ন্যাড়া। হাতে শাঁখা নেই। সমীর ঘুমিয়ে আছে। ঝুড়িতে কঙ্কালের দাঁতগুলি যেন আমাকে ভেংচি কাটল। গা-টা সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠল। কী করব বুঝতে পারছি না। কুকুরটা আমার পায়ের শব্দে জেগে যেতেই দেখলাম, হাতটা আবার কঙ্কাল হয়ে গেছে! আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমি ঠিক আছি কি না ভেবে নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম। না, এটা আমি নিজে, নিজের চোখে দৃশ্যটা দেখেছি। এবং পরদিন একটা দুঃসংবাদে পেলাম। আমার এক খুড়তুতো বোন আত্মহত্যা করেছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা।

হাত ন্যাড়া-ঠিক বিধবার হাতের মতো সাদা ফ্যাকাশে-আগে যেটা দেখেছিলাম, একজন যুবতীর হাত, এবারে দেখলাম খুব শীর্ণকায়। তবে এই অশরীরী কি আমায় শুভাশুভ আগে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছে?

একদিন রাতে বাথরুমে যাচ্ছি, দেখলাম সেই বিধবা হাত আবার মেঝেতে পড়ে আছে। সারারাত আমার ঘুম হল না। খেতে বসে খেতে পারলাম না। স্ত্রী ঠিক টের পেয়ে বলল, 'তোমার কী হয়েছে? মাঝে মাঝে তুমি কেমন হয়ে যাও।' আমি তো বলতে পারি না, বাড়িতে কঙ্কালটা যেমন এসেছে, তার সঙ্গে সেই অশরীরী আত্মাও হাজির। পর পর তিন দিন দেখার পর, নিজের ভ্রম বলে স্বীকার করি কী করে!

সকালে বারান্দায় পায়চারি করছিলাম। একবার ইচ্ছে হল বলি, সমীর তুই এটা ফেরত দিয়ে আয়! কিন্তু বলি কী করে! আমি প্রবীণ মানুষ, আমার মধ্যে যদি বিভীষিকা দেখা দেয় একটা কঙ্কালের কাণ্ডকারখানায়, তাও আস্ত কঙ্কাল নয়, শুধু একটা হাতের কঙ্কাল, তবে সমীরের মতো ছেলেমানুষের পক্ষে মাথা ঠিক রাখাই দায় হবে। কাউকে তো বলাও যায় না। আমার বাড়িটা কঙ্কালটা আসায় ভূতুড়ে বাড়ি হয়ে গেছে ভাবতেও

কেমন খারাপ লাগছিল। অমঙ্গলের আশঙ্কায় খুবই ঘাবড়ে গেছি। বড়ো ছেলে বাইরে থাকে। যদি কিছু হয়। সকালেই ট্রাংকল করলাম, পেয়েও গেলাম, না, পরমেশ ভালোই আছে। আর কী হতে পারে! এইসব সাত-পাঁচ ভেবে যখন কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না, কারণ যেকোনো মুহূর্তে যা কিছু অঘটন আছে সব ঘটতে পারে। কাজেই ভিতরে স্বস্তি পাচ্ছি না। ছেলে কলেজে গেল, স্ত্রী স্কুলে চলে গেল, সোনা স্কুলে-এখন বাড়িতে বসে থাকা শুধু অপেক্ষায়। অনেকগুলো খবরের কাগজ আসে। সব দেখা দরকার। আমরা কোন খবর মিস করলাম, কিংবা কোন কাগজ কী খবর মিস করল, আমাদের হেডিং স্টান্ট কতটা-এসব দেখার একটা আকুলতা থাকে। কিন্তু কিছুতেই খবরের কাগজগুলিতে মঃনসংযোগ করতে পারছিলাম না-এই বুঝি কলিংবেল টিপে কেউ কোনো দুঃসংবাদের খবর দিতে এল। ভিতরে গুটিয়ে আছি কেমন।

না, দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। রাতে ফিরে এসেও দেখলাম সব ঠিকঠাক আছে। কেবল একটা সংশয় মনের মধ্যে। কঙ্কালটা সত্যি কোনো নারীর কি না। সমীর এমনিতেই বলতে পারে। কিংবা একটা মানুষের সব ক-টা হাড় না আর কারও হাড় মিশে গেছে। কিন্তু এসব কথা তো গুরুত্ব সহকারে বলা যায় না। যেভাবে আমি বার বার কঙ্কালটা নিয়ে প্রশ্ন করছি তাতে ভাবতেই পারে সমীর আমি ভালো নেই। সুতরাং ওর ডিসেকসান রুমের কথা দিয়ে আলোচনাটা শুরু করলাম। সমীর বলল, 'এবারের বডিটা ভালো পেয়েছি।'

তারপর আরও দুটো-একটা কথার পর বললাম, 'এটা মেয়েছেলের কঙ্কাল কী করে বুঝলি। ডোম কি বলে দিয়েছে!'

'বলে দেবে কেন। মেয়েদের ছেলেদের স্যাকরাম আলাদা রকমের। পিউবিসের গঠনও আলাদা।'

সুতরাং এর পর আর কী বলি! তবে ওটা যা দেখি বিধবারই হাত। ন্যাড়া এবং ভয়াবহ রকমের কুৎসিত। রাতের বেলায় হঠাৎ সমীর সেদিন চিৎকার করে উঠল, 'বাবা কুকুরটা দেখো এসে কী করছে!'

একটা দাপাদাপির শব্দ পাচ্ছিলাম। ছুটে ভিতরে যেতেই শরীর হিম হয়ে গেল। কুকুরটা মুখ ঘষছে মেঝেতে, মুখ ঝাড়ছে আর পাগলের মতো মুখ থেকে কী ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। ভয়ে সমীর খাটের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সোনা কান্না জুড়ে দিয়েছে। কুকুরটা কোনো শব্দ করতে পারছে না। কিছুক্ষণের মধ্যে দাপাতে দাপাতে মরে গেল। আমার মুখ থেকে একটাই অস্ফুট শব্দ, 'আমি তবে ঠিকই দেখেছি।'

সমীর একদিন বলল, 'মনে হয় ওটার কৃমি-টিমি হয়েছিল বাবা।'

আমি কিছু বললাম না। কারণ হাতটা যদি আবার দেখি তবে আর একটা বিপদ সামনে বুঝতে পারি।

আমার স্ত্রী একদিন বলল, 'তোমার শরীর এত ভেঙে পড়ছে কেন! কী চেহারা হয়েছে তোমার!'

বললাম, 'বা! বয়েস হয়েছে না। এ বয়সে আর চেহারাতে চিকনাই আসবে কী করে।'

সেদিনই রাতে বাথরুমে যাব বলে বের হয়েছি। জিরো পাওয়ারের এখন আলো জ্বালা থাকে ঘরে। রাস্তার আলোগুলো দেখা যায়-বাড়িটার বড়ো বড়ো জানলা সব কাচের, বাইরের সবই দেখতে পাই, মনে হল গভীর রাতে কোন যুবতী হাতে টিনের সুটকেশ নিয়ে একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বড়ো চেনা। ঠিক সুষমার মতো। ধীরে ধীরে আমার বাড়ির দিকে হেঁটে আসছে। এত রাতে! গাড়ি লেট থাকলে হতেই পারে। কিন্তু একা! সুষমা কবেকার সেই মেয়ে! আমি দরজা খুলে দিতে নীচে নেমে গেলাম। দরজা খুলে দেখলাম কেউ নেই। গেট খুলে বাইরে বের হয়ে দেখলাম সব ফাঁকা। গেট খোলার আওয়াজে সোনা, সমীর ওর মা এবং কাজের লোকটাও জেগে গেছে।-'কে গেট খুলল!'

'কে! কে!'

নীচ থেকে বললাম, 'আমি!'

'এত রাতে কোথায় যাচ্ছ?' বলে সবাই ছুটে নেমে এল। সবার চোখে-মুখে ভারি উদবেগ!

তাইতো! প্ল্যাটফর্ম আসবে কোত্থেকে। এত রাতে কেউ বাড়ি আসে। আর সুষমা যুবতী থাকবে কেন। সেও তো প্রৌঢ়া হয়ে গেছে। ইস, কী যে ভুল দেখলাম! মাথা-ফাতা খারাপ হয়ে যায়নি তো। তবে কঙ্কালটা

কি সুষমার! সেই কি এ-বাড়িতে হাজির। ধুস কী যে ভাবছি। এমনিতেই ঘুম পাতলা, মাঝে মাঝে ঘুম হয় না। আজ দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়তে যাব, এমন সময় সমীর, সোনা এবং তাদের মা পাশে দাঁড়িয়ে। কৈফিয়ত চাইছে, 'দরজা খুলে কোথায় যাচ্ছিলে?' কুকুরটার অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর, সমীর কেমন কিছুটা সংশয়ে ভুগছে।

বললাম, 'মনে হল কেউ হাঁটছে। চোরের যা উৎপাত! কুকুরটা নেই। চোর ঠিক বুঝতে পেরেছে।' প্ল্যাটফর্ম অথবা সুষমার কথা এড়িয়ে গেলাম। আর সুষমা তো আমাদের দেশের বাড়িতে বছর খানেকের জন্য ছিল। তখন আমি কলেজে পড়ি। সুষমা আর ওর দাদা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। দেশ ভাগ হবার পর ওরা আমাদের বাড়িতে এসে বছর খানেক ছিল। বাঁশবেড়ের দিকে ওর দাদার চটকলে চাকরি হয়ে গেলে সুষমা চলে যায়। তবে সুষমা এই বছর খানেক আমার ঘরের সব কিছু এত সুন্দর করে সাজিয়ে রাখত; বই, জামা প্যান্ট সব কিছু। সে ভারি যত্নে গোছগাছ করে রাখত। ও আমার চেয়ে বছর দুই-তিনের ছোটোই হবে। ফ্রক পরার বয়স যায়নি তখন, কিন্তু আমাদের সময়টাতে বারো-চোদ্দো বয়স হলেই মেয়েদের শাড়ি পরার নিয়ম ছিল। যাবার দিন আমি সুষমাকে ট্রেনে তুলে দিতে গেছিলাম। টিনের সুটকেশটা নিয়ে সে যখন ট্রেনে উঠে গেছিল তখন আমার বুকটা কেমন ভারি খালি হয়ে গেছিল। সুষমা জানলায় মুখ রেখে শুধু আমাকে দেখেছে। চোখে জল চিকচিক করছিল।

শুয়ে শুয়ে পুরোনো স্মৃতি হাঁটকাচ্ছিলাম। সমীরের ঘরের কঙ্কালটা সুষমার হতে যাবে কেন? যদিও এর পর জানি না সুষমা কোথায় আছে। সে গিয়ে আমাকে চিঠিও দেয়নি। ওর দাদা বাবাকে চিঠি দিত। তাতে অবশ্য সুষমার কথা বিশেষ থাকত না। চিঠিও একদিন বন্ধ হয়ে গেল। আমার মেজোমাসি কেবল একবার বাড়ি গেলে বলেছিলেন, সুষমার বিয়ে হয়ে গেছে। মেজোমাসির ননদের মেয়ে সুষমা।

এসব ভাবলে ঘুম আসবে না। দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছি। চোখ বুজে আসছে এবং একসময় আবার খুট শব্দে ভেঙে গেল। চোখ মেলতে পারছি না। তবু খোলার চেষ্টা করছি। একটা কাচের গ্লাস পড়ে ভেঙে গেলে যেমন ঝন ঝন শব্দ হয়, তেমনি শব্দ কোথাও। মাথাটায় ঝিম ঝিম করছে। চোখ খুলতে পারছি না। তবু তাকালাম। দেখলাম, সত্যি সুষমার মতো কেউ দাঁড়িয়ে শিয়রে। হাতটা আমার চোখের উপর বাড়িয়ে রেখেছে। হাতে শাঁখা। যেন হাত ঘুরিয়ে সে তার শাঁখার সৌন্দর্য দেখাচ্ছে। এবারে আর পারলাম না। উঠে বসলাম। তারপরই সব ফাঁকা। বুঝতে পারছি আমি প্রচণ্ড ঘামছি। জল তেষ্টা পেয়েছে। নেমে জল খেলাম। আর ঘুম হল না। অবসাদ শরীরে। ভোরের দিকে ঘুমটা এল এবং বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল। এত বেলা করে আমি কখনো উঠি না।

ঘুম থেকে উঠে দেখছি স্ত্রী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। কপালে সুন্দর করে টিপ পরছে সিঁদুরের। ওর টিপ পরা দেখে বললাম, 'জান দু-এক দিনের মধ্যে কোনো সুখবর পাব।' এবং পেলামও। বড়ো ছেলে পরমেশ চিঠিতে জানিয়েছে-সে হ্যালে যোগ দিচ্ছে। বড়ো ছেলের অনেক দিনের স্বপ্ন তাহলে এতদিনে সফল হল। আসলে খুলে বললাম না, হাতে তার শাঁখা পরা দেখেছি। শাঁখা থাকলে কোনো-না-কোনো শুভ খবর পাই। না থাকলে অশুভ খবর। কেউ আমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়ে যায়। হাতটা যে কার?

এরপর আর অনেক দিন কিছু দেখি না। সুষমার কথাও ভুলে গেছি। মেয়ে জামাই বাড়িতে। বেশ উৎসবের মতো ক-টা দিন কেটে গেল। নাতি-নাতনিকে নিয়ে চিড়িয়াখানা, বিধান শিশু উদ্যানে ঘুরে বেড়ালাম। একদিন গুপি গায়েন বাঘা বায়েন দেখলাম। এই করতে করতে ওদের যাবার দিন এসে গেল। রিজার্ভেশন ঠিক। ওরা এলাহাবাদে দু-দিন কাটিয়ে দিল্লি যাবে। মাঝে একবার মোগলসরাইতেও নামার কথা। সেখানে মেয়ের ননদ থাকে। যাবার সময় আত্মীয়স্বজন সবাইকে দেখে যাবার ইচ্ছা তাদের। দেখতে দেখতে যাবার দিন এসে গেল। এবং সেদিন রাতে খেতে বসে আবার সেই, কঙ্কালের ন্যাড়া হাত বারান্দায় পড়ে আছে

দেখতে পেলাম। আবার চমকে গেলাম। এটা দেখলেই টের পাই কোনো অশুভ ইঙ্গিত আছে এর মধ্যে। খাবার টেবিলেই অরূপকে বললাম, 'কাল তোমাদের যাওয়া হবে না। টিকিট ক্যানসেল করো।'

ওরা তো অবাক!

অরূপ বলল, 'কেন, কাল গেলে কী হবে?'

'আমার মন ঠিক সায় দিচ্ছে না।'

স্ত্রী ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি যে কী না! এই হয়েছে'-মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর বাবা যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছে।'

আমি শুধু বললাম, 'যাওয়া হবে না।' বলে টেবিল থেকে উঠে গেলাম। রাতে আমার ঘরে অরূপ এল। বলল, 'আবার রিজার্ভেশন কবে পাওয়া যাবে?'

বললাম, 'সে আমি ঠিক করে দেব। তোমাদের ভাবতে হবে না।'

দু-দিন বাদে খবরের অফিসে টেলিপ্রিন্টারে ভেসে উঠল খবরটা। এলাহাবাদের কাছে ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা। বিরাশি জন দুর্ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। দুটো বগি চুরমার। এবং বগির নম্বর ট্রেন মিলিয়ে বুঝতে পারলাম-এই কামরাতেই ওদের থাকার কথা ছিল।

অবশ্য এসব খুবই রহস্যজনক ঘটনা। কাউকে খুলে বলাও যায় না। স্ত্রী বলল, 'তুমি কি সব আগাম দেখতে পাও?'

আমি শুধু বললাম, 'জানি না।'

পরে খবর নিয়ে জেনেছি, সুষমা স্বামীর ঘর থেকে পাঁচ-সাত বছর আগে কোথায় চলে গেছে। তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

বাগানের তাজা গোলাপ

আজকাল কোনো অনুষ্ঠানে আমার যেতে ইচ্ছে হয় না। তবু যেতে হয়। এমন সব কাছের মানুষজন আসে অনুরোধ নিয়ে, যাদের শেষপর্যন্ত কিছুতেই 'না' বলতে পারি না। অনেক সময় উপরোধে ঢেঁকিও গিলতে হয়।

এই উপরোধের ঢেঁকি গিলতে আজ যাচ্ছি। নতুন লাইব্রেরি ভবনের উদ্বোধন। ফিতে কাটতে হবে। আমি এবং আমার এক লেখক-বন্ধু প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি।

স্টেশন থেকে গাড়ি করে নিয়ে গেল। অনুষ্ঠানে মানুষজনের সমাগম বেশ ভালোই হয়েছে। যদিও এই গল্পের জন্য এগুলো বাড়তি কথা, তবে গল্পের তো শুরু থাকে-শুরুটা এভাবেই করা গেল।

অনুষ্ঠান শেষে অটোগ্রাফের কিছুটা ব্যস্ততা থাকে। একজন বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আজকাল পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম বড়ো কেউ করে না। করলেও, আমার অন্তত অস্বস্তি হয়। বললাম, 'আমি তো তোমার বাবা-কাকা হই না। প্রণাম কেন? যাকে-তাকে প্রণাম করতে নেই।'

মেয়েটি একদম ঘাবড়াল না। বলল, 'তার চেয়েও বেশি।'

খুবই দমে গেলাম কথাটাতে।

মেয়েটি দুটো তাজা গোলাপ আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আমার বাগানের।'

'তুমি বাগান কর?'

'ওই আর কি! আপনাকে দেব বলে এনেছি।'

তারপরই মেয়েটি ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেল!

কে যে কখন নিজের পৃথিবী আবিষ্কার করে ফেলে, বুঝি না। অনুষ্ঠানের মঞ্চেই রজনীগন্ধার মালা কিংবা ফুলের স্তবক ফেলে রেখে আসি। অথবা যে বালিকা মালা পরায়, তাকে পরিয়ে দিই। কিশোরী হলে, তাও পারি না। কোথায় যে সংস্কারে বাধে! অবশ্য এসবও গল্পের জন্য লিখছি না। গল্পটি এখনও শুরুই হয়নি।

আমার এই হয়। গল্প শুরু করতে সময় লাগে, গল্প শেষ করতে সময় লাগে না।

অনুষ্ঠানের মাতব্বর ব্যক্তিরা এই প্রাচীন লাইব্রেরির বার্ষিক অনুষ্ঠানে যেসব রথী-মহারথীদের নিয়ে এসেছিলেন গত একশো বছর ধরে, তাঁদেরও বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। আমার মতো চুনোপুঁটিকেও কিছু বলতে হল। লাইব্রেরিতে শরৎচন্দ্রও এসেছিলেন-তিনি আসতেই পারেন। জায়গাটা থেকে শরৎচন্দ্রের বাড়ি বেশি দূরও না। একটা জংশন স্টেশন থেকে মাইল দেড়েক হেঁটে গেলেই তাঁর বাড়ি।

এমন সব কথার মধ্যেই আমাকে নতুন ভবনের ছাদে নিয়ে যাওয়া হল। ছাদটি অতি বিশাল, সামনে বর্ষার গঙ্গা কলকল ছলছল।

নদী থেকে ভারি মনোরম ঠান্ডা বাতা উঠে আসছে। সামনে নিরন্তর আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে মেয়েটির মুখ কেন যে মনে পড়ে গেল! সে তার বাগানের দুটো তাজা গোলাপ দিয়ে গেছে। অবহেলায় গোলাপ দুটো অনুষ্ঠানের মঞ্চে যদি পড়ে থাকে, তবে তাকে খাটোই করা হবে। সে জানবেও না-গোলাপ দুটো ফেলে এসেছি। ভাবলাম, গোলাপ দুটো যত্ন করে নেওয়া দরকার। ব্যাগে রাখলে গোলাপ দুটো নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেবে, একজনকে বললাম, 'ভাই, সামান্য কলাপাতায় গোলাপ দুটো একটু জড়িয়ে দেবে?'

এবারে গল্পটা শুরু করা যাক। হাওড়া স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। আচমকা ট্যাক্সি ধর্মঘট। কোথায় যেন ট্যাক্সি ড্রাইভারের খুনখারাবির খবর পাওয়া গেল।

আমার লেখক-বন্ধুটি থাকেন দক্ষিণে। আমি থাকি উত্তরে। রাত প্রায় দশটা বাজে। আমাদের দিকের বাস-টাস কিংবা মিনি রাত দশটার পর বিরল হয়ে আসে। শেষে বিপদে না পড়ি-এই ভেবে, একটা মিনিবাস ধরার আশায় সাবওয়ের দিকে এগোতে থাকি।

বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দেখলাম আমাদের দিকের একটা বাসও নেই।

আর-একটু এগিয়ে দেখা দরকার, মিনি যদি থাকে। ভাগ্য প্রসন্ন, পেয়েও গেলাম। উঠে দেখি, ভেতরের দিকে একটি সিট-ই খালি আছে। তবে বসা মুশকিল। একজন সাত-আট বছরের বালিকা সিটের অধিকাংশ জায়গা দখল করে রেখেছে।

কী যে বলি!

মেয়েটির পাশে একটি সুন্দর প্লাস্টিকের ব্যাগ। কোলে প্লাস্টিকের একটি হরিণ-শিশু। একপাশে তার ছোট্ট খেলনার রেলগাড়িও আছে। সে তার লটবহর নিয়ে বেশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে।

বললাম, 'আমাকে একটু জায়গা দেবে? বসব।'

বালিকাটি আমাকে দেখল মুখ তুলে। তারপর জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না। আমি সরে বসব না।'

সুন্দর প্লাস্টিকের ব্যাগটি সে জানালার দিকেই রেখেছে। আর আশ্চর্য, ব্যাগটির সুরক্ষার জন্যই হোক, অথবা অন্য কোনো কারণেও হতে পারে, সে বেশ দু-সিটের অনেকটা জায়গাই দখল করে বসে আছে। ও সরে না বসলে, আমার বসার জায়গা হয় না।

বললাম, 'ব্যাগটা কোলে নাও, তাহলেই জায়গা হয়ে যাবে।'

ছোট্ট মেয়েটি খুবই গম্ভীর হয়ে গেল।

পেছনের সিট থেকে কেউ তখন বলছে, 'অ্যাই, সরে বোস না। ওনাকে বসতে দে। তুই কী রে?'

আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'সারা রাস্তায় জ্বালাচ্ছে। কাউকে বসতে দিচ্ছে না পাশে। কিছুতেই সরে বসবে না।'

অবশ্য বাসে অন্য উত্তেজনা প্রবল।

কেউ বলছে, 'এতদিনে সরকার একটা কাজের কাজ করেছে!'

কেউ বলছে, 'আগেই করা উচিত ছিল। সুরক্ষা বলে কথা!'

কিছুদিন ধরেই মানুষজন বড়োই উত্তেজনায় ভুগছে। এখন সুরক্ষা ছাড়া মানুষজনের মাথায় যেন সব কিছুই ভোঁতা হয়ে গেছে!

পেছনের সিটে বসা ভদ্রলোক মেয়েটির হয়তো কেউ হবে। বাবা হতে পারে। মামা কাকা যে-কেউ হতে পারে। ওঁর কথায় আমি কেমন বিব্রত বোধ করলাম।

মেয়েটি আমার দিকে আর তাকাচ্ছেই না। জানালায় চোখ রেখে সেতু পার হবার সময় নদীর জল দেখছে। বাসে যে সুরক্ষা নিয়ে এত উত্তেজনা চলছে-কীসের সুরক্ষা, কেন সুরক্ষা, সে কিছুই বুঝছে না। তার নিজের

জায়গাটির সুরক্ষা ছাড়া, সে বেশি কিছু যেন বোঝেও না।

বাধ্য হয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। না-বসলেও চলবে। আমার দাঁড়িয়ে যেতে অসুবিধা হবে না। আপনি ওকে...প্লিজ, কিছু বলবেন না।'

আসলে মিনি কিংবা বাসে বসতে পাওয়া গেলে, সৌভাগ্যবান হতে হয়। এখন তো আবার সুরক্ষার আবেগে মানুষজন ভাসছে! একজন বলেই ফেলল, 'আপনি এখানটায় বসুন। আমি দাঁড়িয়ে যেতে পারব। কোনো অসুবিধা হবে না।'

'না না, আপনি বসুন। আপনি দাঁড়িয়ে যেতে পারলে, আমিও পারব।'

লোকটির কথায় কিছুটা যে আহত, মেয়েটি আমাকে দেখেই তা টের পেয়েছে। সে কী ভেবে জানালার দিকে সামান্য সরে বসল। তার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু খেলনাপাতি গুছিয়ে, প্লাস্টিকের ব্যাগে তুলেও রাখল।

আমি তবু বসছি না দেখে মেয়েটি বলল, 'বোসো না। জায়গা হয়ে যাবে।'

আমি হাসলাম।

মেয়েটি এত চঞ্চল আর সুন্দর যে তাকে ভারি আদর করারও ইচ্ছে হল। শিশুরা আছে বলে পৃথিবীটা যে এত সুন্দর, তাও টের পেলাম।

মেয়েটি আরও চেপে, আরও একটু সরে বসে বলল, 'কী, হবে না?'

আমি না বসলেও স্বস্তি পাচ্ছে না যেন মেয়েটি-তবু সুন্দর প্লাস্টিকের ব্যাগটি কোলের উপর রাখবে না।

কী আছে ওই ব্যাগে? এত সতর্ক ব্যাগটি নিয়ে! ব্যাগের মধ্যে এমন কোনো কোমল বস্তু থাকতেই পারে, কোলে তুলে রাখলে হাতের চাপে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

যাই থাকুক, আমার বসে পড়া ছাড়াও আর উপায় নেই।

আর বসতেই মেয়েটি বলল, 'তোমার নাম কী গো?'

এতটুকুন ছোট্ট মেয়ে, চোখ দুটো ভারি সুন্দর-আবার কখনো সব কিছু তার মনে হয় ভারি রহস্যে ভরা, সে আমার পাশে বসে আছে, পেছনে কেউ আছে তার-কত সহজে সে আমার নাম জানার আগ্রহ প্রকাশ করল!

তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলাম। বললাম, 'আমার নাম দিয়ে কী হবে?'

'বলোই না। জান, বাবা আমাকে আব্বু বলে ডাকে। জান, আমার না, বাবার বাবা আছে। তাঁর বাড়িতে আমরা যাচ্ছি।'

মেয়েটির কথাবর্তা এত আন্তরিক যে কেবল আদর করতে ইচ্ছে হয়। কী পাকা পাকা কথা, অথচ নিষ্পাপ-এমন জীবন তো আমরাও পার করে দিয়ে এসেছি।

বললাম, 'বাবার বাবা তোমার কে হয়?'

'বা রে, তুমি তাও জান না! নানাজি হয়।'

'তাহলে দাদুর বাড়ি যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। জান, আমার দাদুর খুব অসুখ। বাঁচবে না।' তারপর পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আমার বাবা। আমার মা। কোলে দেখো, আমার ভাই।'

পেছনে চেয়ে দেখলাম-ভাইটির বয়স বছর খানেকও নয়।

ওর বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাশে তো বসলেন, সারা রাস্তা জ্বালিয়ে মারবে।'

আমি কিছু বললাম না। ঘণ্টা খানেকের রাস্তা এবং এরা জানে না, আব্বুর কথা আমি কত আগ্রহ নিয়ে শুনছি।

আমার ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়ে গেছে, তারা উড়েও গেছে-আমি আর আমার স্ত্রী এখন বাড়িতে, আমরা বড়ো নিঃসঙ্গ মানুষ। কাজের লোক ছাড়া আমাদের দেখারও কেউ নেই। অফিস ছাড়া কথা বলারও লোক

নেই। কাগজের অফিসে কাজ, বিকেলে যাই, রাতে ফিরি। আর এ সময়ে এমন সবুজ তাজা প্রাণের স্পর্শ, কে না পেতে চায়!

আব্বু এবার কী বুঝে, খুব যত্নের সঙ্গে সুন্দর প্লাস্টিকের ব্যাগটি কোলে তুলে, জানালার কাছ ঘেঁষে বসল। তারপর আমাকে দেখল। শেষে কী ভেবে বলল, 'ঠিক হয়ে বোসো না। অত জড়ভরত হয়ে বসলে হয়!'

ঠিক হয়ে বসতে-না-বসতেই বলল, 'এতে কী আছে, বলো তো?'

এবারে ধাঁধা শুরু।

বললাম, 'এতে তোমার সব খেলনা, রেলগাড়ি, পুতুল, উড়োজাহাজ, প্লাস্টিকের ঘরবাড়ি সব।'

'কিছু বলতে পারলে না! কী মজা! তুমি খুব বোকা আছ।'

আমি বোকার মতোই তাকিয়ে থাকলাম।

আব্বু বলল, 'এতে আছে আমার ভাইয়ের ফিডিং বোতল। জান তো, ভাইকে আমি দুধ খাওয়াতে পারি।'

কত কাজের মেয়ে! পৃথিবীতে এ কাজটি সে ছাড়া যেন আর কেউ করতে পারে না!

আমি ততোধিক বিস্ময়ের গলায় বললাম, 'বলো কী! এত কাজের মেয়ে তুমি?'

'জান, আমার বাবা রোজ অফিসে যায়। মা তো একা, ভাইকে নিয়ে পেরে ওঠে না।'

'আর কী কাজ কর?'

'ঘর ঝাঁট দিতে পারি। জান, মা আমাকে তখন বকে। ঝাঁটা হাত থেকে কেড়ে নেয়।'

'তাই নাকি? তোমার মার এটা ভারি অন্যায়।'

'মার সঙ্গে বাসন-কোসন মাজতে বসলেও বকে। কেবল বলবে-যা, পড়তে বোস। আমার পড়তে ভালো লাগে না। কাজ করতে গেলেই, মা রেগে যায়।'

'খুব অন্যায়।'

'আমাদের কাজের দিদি না খুব ফাঁকি দেয়।'

'তুমি বকে দিতে পার না?'

মুখে তার আশ্চর্য হাসিটুকু লেগেই আছে। কেউ বোধ হয় এত গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে না!

আমার দিকে তাক^িয়ে ফের মুখ তুলে বলল, 'তুমি অফিস যাও না?'

'হুঁ। যাই।'

'তোমার বাড়িতে কে আছে?'

আমার কেন যে সহসা গলায় কথা আটকে গেল!

কী বলি! সবাই আছে, অথচ কেউ নেই!

একসময়, সে যেন কবেকার কথা-মা বাবা ভাই বোন, আত্মীয়স্বজনও কম ছিল না। একে একে সবাই আলগা হয়ে যেতে থাকল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সম্বল করে ফ্ল্যাটবাড়ি। তারপর নিজের বাড়ি। তারপর সব ফাঁকা। পুত্র-কন্যারা সময়ই পায় না! বছরে দু-বছরে বাড়ি ঘুরে যায় ঠিক, তবে কোথায় যেন সেই আন্তরিকতা আর নেই। এককালে এক বিছানায় সবাই শুয়েছে, বড়ো হয়েছে। তারপর কখন যে সব আলগা হয়ে গেছে।

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি মার সঙ্গে শোও, না বাবার সঙ্গে।'

'বা রে, আমরা তো এক বিছানায় শুই। একসঙ্গে না শুলে, আমার ঘুমই হবে না!'

'তুমি কাকে বেশি ভালোবাস? মাকে, না বাবাকে?'

'আমি সবাইকে ভালোবাসি।'

তারপর থুতনিতে আঙুল রেখে কী ভাবল, যেন আমার প্রশ্নের সে সঠিক জবাব দিতে পারেনি।

'জান, আসলে আমি ভাইকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।'

'মা-বাবাকে?'

'সমান সমান।'

'ভাই তোমাকে ভালোবাসে?'

'মোটটেও না। দেখো না, আমার হাত কামড়ে দিয়েছে সকালে।'

'খুব অন্যায়। তুমি এত ভালোবাস, ভাই জানে না?'

'জানবে না কেন! মা বলেছে-নতুন দাঁত উঠেছে তো, তাই কামড়াবে। ওর তো কোনো দোষ নেই। ছেলেমানুষ, বোঝে না-কামড়ালে লাগে।'

মিনিবাসটা মানিকতলায় মোড়ে এসে, সামান্য জ্যামে পড়ে গেছে।

চুপচাপ বসে থাকলে যা হয়, গোলাপ দুটোর কথা মনে পড়ে গেল। খুবই যত্নের সঙ্গে কলাপাতায় মুড়ে ব্যাগে রেখেছি। ফুল দুটো কেন যে কিছুটা মায়ায় জড়িয়ে আছে, তাও ঠিক বুঝছি না। মেয়েটির মুখ মনে পড়ে গেলে যা হয়-সে দিয়েছে, সে দিয়েই খুশি তার প্রিয় লেখককে। সে কিছু আর চায়ও না। দু-দণ্ডের জন্য হলেও, আমার ফুলদানিতে ফুল দুটো শোভা পেলে, তার যে খুশির অন্ত থাকবে না, তাও বুঝি। ব্যাগে ঠিকঠাক আছে কি না, চেপটে না যায়-সেজন্য সতর্কতারও শেষ নেই।

হাত দিয়ে দেখলাম-না, ঠিকই আছে।

তবে এই ফুলের জন্য বাড়ির কারও কোনো যে আগ্রহ নেই, টেবিলে রেখে দিলে পড়েই থাকতে পারে, আর কাজের লোকের দায়ই বা কতটা! সুমিত্রার অফিসে কাজের চাপ, তার শরীরও বিশেষ সুস্থ না, যেন কোনোরকমে জীবনযাপন।

কেন জানি মনে হল-ফুলদানিতে নিজেই গোলপ দুটো রেখে দেব। যে ক-দিন তাজা থাকে। মেয়েটি আমাকে প্রণাম করায় কেন যে সহসা খেপে গেছিলাম, তাও বুঝতে পারছি না।

বরং এখন মেয়েটির সেই করুণ মুখের কথা ভেবে, আমার খারাপই লাগছিল।

আমার কোনো গল্প কিংবা উপন্যাস পাঠের পর মেয়েটির হয়তো মনে হয়েছিল-যদি কোনোদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তবে এই গোলাপ দুটো তার ইচ্ছের প্রতীক হয়ে থাকবে।

তখনই আব্বু বলল, 'তোমাকে কে বেশি ভালোবাসে?'

এ ভারি কঠিন প্রশ্ন!

শিশুদের প্রশ্ন এত কঠিন হয়, জানা ছিল না, মিছে কথাও বলতে পারছি না। 'সবাই আমাকে ভালোবাসে' বলতে পারলে, খুশি হতে পারতাম। কিন্তু মিছে কথা হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে কে আমার নিজের, তাও বুঝতে পারছি না। এমন নিষ্পাপ শিশুর সঙ্গে ছলনাও করা যায় না।

বললাম, 'আমি ঠিক জানি না, এ মুহূর্তে কে আমাকে বেশি ভালোবাসে।'

আমার মুখ কেমন হতাশায় ভরে গেছে দেখে আব্বু বলল, 'জান, আমার নানাজির ভারি কঠিন অসুখ। আমি ফুল নিয়ে যাচ্ছি। নানাজি ফুল খুব ভালোবাসে।'

'দাদুর জন্য ফুল নিয়ে যাচ্ছ? কোথায় থাকেন তিনি?'

'বা রে, হাতিয়াড়ায় পীরের দরগা আছে না, দরগার পাশে থাকেন।'

'তোমরা কোথায় থাক?'

'তারকেশ্বরে। আমাদের কোয়ার্টারের পাশে সবুজ ধানখেত। যতদূর তাকাবে না... কেবল ধানের খেত। কোয়ার্টারের পাশে ডোবা আছে। কত জল। কত কচুরিপানা। মা আমাকে যেতে দেয় না। ডোবার পাড়ে জঙ্গল। জান, জঙ্গলে একটা ভূত থাকে।'

'ভূতের সঙ্গে কথা হয়?'

'হবে না! আড়ি দিয়ে রেখেছি। আবার ভাব হলে কথা বলব। ভূতটাই তো এসে বলল-দাদুর বাড়ি যাবি, ফুল নিবি না?'

তারপর আব্বু কী ভেবে বলল, 'কী ফুল নিই, কী ফুল নিই, কোনো ফুলই নেই- যা গরম পড়েছে। তখনই কচুরিপানার ফুল মনে পড়ে গেল। লুকিয়ে জলে নেমে গেছি-কেউ জানে না দুটো ফুল ডোবা থেকে

তুলে এনেছি।'

'ভূত না বলে বন্ধু বলো।'

আব্বু বলল, 'বন্ধুই তো। আমি কি বলেছি, বন্ধু নয়?'

এসব কথাবার্তার মধ্যেই আব্বু তার ব্যাগ থেকে কচুর পাতায় মোড়া ফুল দুটো বড়ো সন্তর্পণে বের করে আনল।

সে তারপর কচুর পাতা খুলে যা বের করল, অবাক না হয়ে পারলাম না!

সত্যি, দুটো কচুরিপানার ফুল।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে ফুল দুটো বোধ হয় তুলে এনেছে। সামান্য দুটো কচুরিপানার ফুল নীল-সবুজ পাপড়ি মেলে, এক বিশাল ফোয়ারার মতো দু-আঙুলের ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

আব্বু বলল, 'কী সুন্দর না! বাবা জানে না-ব্যাগে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

আমি বললাম, 'আমারও কেউ জানে না। ব্যাগে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

'বারে, বড়োরা আবার কিছু লুকিয়ে নিয়ে যায় নাকি?'

আমি বলতে চাইলাম, যায়। বড়োরাই যায়।

আব্বু বলল, 'কী লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছ?'

'তোমার মতো দুটো ফুল।'

'দেখি কোথায় ফুল?'

ব্যাগ থেকে কলার পাতা খুলে দেখাতেই, আব্বু লাফিয়ে উঠল।

'কী সুন্দর ফুল! আমাকে একটা দেবে?'

আমার ফুল দুটো কলাপাতায়, ওর দুটো কচুর পাতায়।

'তুমি দুটোই নাও। দুটোই বাগানের তাজা গোলাপ।'

'বাড়িতে তোমাকে বকবে না? সব দিয়ে দিচ্ছ!'

হাসলাম। শেষে বললাম, 'তোমার দাদুকে দিয়ো। দাদুকে বলবে-রাস্তায় একটা লোক...জান, ফুল দুটো তোমাকে দিতে বলল!'... আর কী বলবে, বলো তো?'

'বা রে, আর কী বলব, জানব কী করে? আমি কি তোমাদের মতো বড়ো?'

'বলবে-আমিও তোমার দাদুর বাড়ির দিকে হাঁটছি। আগে থেকেই তাঁকে আমার প্রিয় ফুল দুটো পৌঁছে দিলাম।'

'তুমি যাবে আমাদের বাড়ি?'

'যাব।'

'কবে যাবে?'

বাস থেকে নেমে যাবার সময় হাত তুলে বললাম, 'যাব। ঠিক একদিন চলে যাব। যেকোনো দিন।'

আব্বু বাসের জানালায় হাত নাড়ল।

'টা টা!'

আব্বুর মুখে দুরন্ত হাসি। যতক্ষণ দেখা যায়, বাসের জানালায় দাঁড়িয়ে আব্বু আমাকে দেখল। আমি হাত নাড়ছি। হাঁটছি।

বাসটা চলে যেতেই কেমন ঝুপ করে যেন সব অন্ধকার হয়ে গেল। চোখে যেন কিছু আর দেখতে পাচ্ছি না।

কে যে কখন কার প্রিয়জন হয়ে যায়, কেউ বোধ হয় জানে না।

চকোর

বাড়িতে আমি, মা, বাবা, ছানু। মানু আমার ছোটো বোন। সবে হাঁটতে শিখেছে। তবে দু-পা হেঁটে গিয়ে পড়ে যায় কেন বুঝি না। পড়ে গেলে তাকে তক্ষুনি কোলে তুলে নিতে হবে। আদর করতে হবে। গাছপালা পাখি দেখিয়ে কান্না থামাতে হবে।

তক্তপোশের ধার ধরিয়ে দিলে বোন নিজেই হাঁটতে পারে কখনো দু-হাত বাড়ালে কিছুটা হেঁটে আসে, তারপর বসে পড়ে।

মানু হেঁটে বেড়ালে আমার আনন্দ হয়। দারুণ মজা লাগে। চিৎকার করে উঠি, 'মা শিগগির এসো, তাড়াতাড়ি।'

যেন মা তাড়াতাড়ি না এলে, বোনের দাঁড়িয়ে পড়া, দু-পা হেঁটে বসে পড়ার মজাই নষ্ট।

মজা দেখতে গিয়ে বোন পড়ে গেলেই মার বকুনি-'আবার ফেললি! হাত-পা ভাঙুক, আমি কিচ্ছু জানি না। আবার কাঁদালি খুব, সরে যা।'

তখন আমার কী যে খারাপ লাগে! আমার বাবা নাকি খুবই অবিবেচক। মার গালমন্দ থেকে তাও টের পাই। কেন অবিচেক তাও বুঝি না। বাবার তো দেখি একদণ্ড ফুরসত নেই।

তবে ছানু, মানে আমার ছোটো ভাইয়ের বুদ্ধি কম। মা বলতেই পারে। সারাক্ষণ পকেটে তার ছোলা ভরা নাহয় মুড়ি রেখে দিতে হবে। পকেটে ছোলা মুড়ি না থাকলেই কাঁদতে বসবে পা ছড়িয়ে।

আমাদের উঠোনে একটা আম গাছ আছে। গাছটা দাদু লাগিয়ে গেছেন। গাছটা না থাকলে, বাড়িটাকে বাড়ি মনে হত না। আর গাছটা এত বড়ো-দু-ভাই মিলে তার বেড় পাই না। তবে গাছের কাণ্ডটা লম্বা নয় বলে রক্ষা।

গাছের কাণ্ডটা সিঁড়ির মতো আধশোয়ানো। সহজেই দৌড়ে আমরা দু-ভাই গাছের ডালপালায় নিখোঁজ হয়ে যেতে পারি।

কী বোকা গাছটা! এত ঝড়বৃষ্টি রোদেও নড়ে না। আধশোয়া হয়ে পড়ে থাকে।

গাছটা আছে বলেই জানালায় বসে ঝড়বৃষ্টি দেখতে এত ভালো লাগে। কখনো কেন যে মনে হয়, গাছটা ঝড়ে ডালপালা মেলে উড়ে না যায়। তখন কেন যে রামায়ণের তাড়কা রাক্ষসীর মুখ দেখতে পাই, বুঝি না।

গাছটায় চড়ে বসলে, তার সঙ্গে, তার ডালপালার সঙ্গে আমার যে কত কথা হয়। গাছটার সঙ্গে আমার এত কী কথা মা কিছুতেই বোঝে না। আমার নাকি মাথায় ছিট আছে।

আসলে গাছটার নীচেই গোয়ালঘর। গোরু-বাছুর, বাবার ভাঙা সাইকেল বারান্দায়-কাঠকুটো সহ গোয়ালঘরটা আছে বলেই বাড়িটা আমাদের বাড়ি মনে হয়।

গোয়ালঘর পার হয়ে তেলকলে যাবার রাস্তা।-সুযোগ পেলেই রাস্তায় হাওয়া। দু-লাফে নিরুদের বেড়া টপকে ঘাপটি মেরে বসে থাকা।

মার বকুনি তখন, 'যাবি কোথায়?'

আমরা দোষ করলে বাবারও দোষ। বাবাকে টেনে আনলে কষ্ট হয় না! বাবা কি বলেছেন, পড়ে তোমাদের কচু হবে? পড়তে ভালো না লাগলে কী করি! পড়াশোনা না করলেও বাবার দোষ।

আসলে পড়াশোনায় মন দিতে পারি না। মাথাটা কেমন করে। উঠোনে আম গাছ, বাবার ভাঙা সাইকেল, গোয়ালের গোরু-বাছুর, তারপর খালপাড় ধরে যতদূর চোখ যায় ধানের খেত। টালির ঘরে বসে থাকতে কার কতক্ষণ ভালো লাগে।

রান্নাঘর থেকে মার গলা পাই-'অঙ্ক হল?'

ভুলে গেছি, আমাদের একটি রান্নাঘরও আছে।

ঘরের সঙ্গে চাল টেনে গেল সালে বাবা রান্নাঘর বানিয়েছে। পাটকাঠির বেড়া। একটা তলি বাঁশের ডগায় বেড় দিয়ে ঘরের কোনায় পুঁতে দিয়েছে। ডগাটা ঝুড়ির মতো, মুখ হাঁ করা। বিড়ালের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার এই একটা উপায়।

মাছ হলে, ডাল হলে সবই মা তলি বাঁশের ডগায় তুলে রাখ। বাবার কত বুদ্ধি তলি বাঁশের ঝুড়িটা না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। সেবারেই শুধু বাবার বুদ্ধির খুব তারিফ করেছিল মা।

'কী রে অঙ্ক তোর হল?'

'হয়েছে মা।'

মা তো জানে না, অঙ্ক ভুল না ঠিক। কারণ ভুল না ঠিক মা অঙ্ক দেখে বুঝতে পারে না। স্কুলে গেলে বুঝতে পারি অঙ্ক ঠিক হয়নি। বেদম প্রহারে জর্জরিত হলে টের পাই, মাকে ফাঁকি দিলেও রঙ্গমাস্টারকে ফাঁকি দেবার উপায় নাই।

'সব অঙ্ক করেছিস?'

'করেছি।'

'সব ফল মিলেছে?'

'সব ফল মিলেছে মা।'

মার মুখে কী তৃপ্তির হাসি।

আমি যে উত্তর না দেখেই বলেছি, মিলেছে-মা বুঝবে কী করে! মা তো জানে না ফল কী করে দেখতে হয়। আমারও অঙ্কের উত্তর দেখার সাহস হয় না। উত্তর দেখলেই, ভুল। মাকে বললে পিঠে পড়বে।

'ইস্কুলে যাও কেন? কী কর স্কুলে গিয়ে? ভুল হয় কেন? সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ালে অঙ্কের আর দোষ কী?' শতেক প্রশ্ন। তার চেয়ে যা হয় স্কুলে গিয়ে হবে।

'হাতের লেখা করেছিস?'

'হ্যাঁ, দেখবে।'

'না দেখতে হবে না। যা, বই খাতা ব্যাগে তুলে রাখ। গোরুটা মাঠে দিয়ে আয়। তোমার বাবা তো দোকান দোকান করেই গেল। কিছু দেখে! না দেখার ত্যানার সময় আছে।'

ভাগ্যিস বাবার চায়ের দোকান আছে আর লালগোলা প্যাসেঞ্জার গাড়িটা আছে- না থাকলে কপালে আমাদের দুর্গতির শেষ থাকত না।

বাবার ওই একটাই দোষ। হঠাৎ হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় আমি পড়াশোনায় খুবই ফাঁকি দিচ্ছি। তখনই তাঁর ক্যাড়া উঠে যায় মাথায়।

'চকোর!' রাতে ফিরেই বাবার হাঁক।

ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসি। চোখ কচলে দেখি সাক্ষাৎ যমদূত। এত তাড়াতাড়ি! বাবার লালগোলা প্যাসেঞ্জার কি অন্য লাইনে চলে গেল! এত তাড়াতাড়ি বাবার ফিরে আসার কথা না।

'আরে তুই যে দেখছি কুম্ভকর্ণের বাবা। পড়াশোনা কি লাটে তুলে দিলি! খাতা পেনসিল বের কর। আমি হাতমুখ ধুয়ে আসছি।'

তখন মা আমার বিপদতারিণী।

'কী শুরু করলে, দোকান থেকে ফিরে। এই তো সবে শুল। সব তো লিখেছে বলল।'

বাবা পড়াতে বসলেই যে মাথা গরম করে ফেলবে, মা জানে। বাবা পড়া নিয়ে বিন্দুমাত্র চোটপাট করলে মা খেপে যায়।

'তাই বলে এত রাতে ছেলেটাকে পেটাচ্ছ! লাগে না!' মা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

'দরকার নেই পড়াশোনায়। লাটে ওঠে, গোল্লায় যাক, আমি দেখব। আমি বুঝব। এই খেতে আয়।'

বাবা তখন নিরুপায় চোখে শুধু অন্ধকারে জোনাকি জ্বলা দেখেন। আমরা খাচ্ছি, বাবা বারান্দার জলচৌকিতে গুম মেরে বসে আছেন। মার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না।

তবে গোরুটা একটু বেশি দুধ দিলে, দোকানে বিক্রিবাট্টা ভালো হলে বাবার মতো মানুষ হয় না। মন খুবই প্রসন্ন তখন। যাত্রাগানে নিয়ে যান, মেলায় নিয়ে যান। মাও তখন বাবার সঙ্গে হেসে কথা বলে।

বাবার ফিরতে দেরি হলে লণ্ঠন হাতে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মা। সঙ্গে আমরা।

মন প্রসন্ন থাকলে, পড়াশোনায় অবহেলা না থাকে, সেদিকেও খুব নজর বাবার।

'হ্যাট মানে কী বলতো চকোর।'

মাথা চুলকে বলি, 'হ্যাট মানে টুপি।'

'ঠিকই তো বলেছিস। মাথা চুলকাবার কী হল! এত ভয়ডর থাকলে মানুষ হবি কী করে! ভালো করে পড়াশোনা করলে তেলকলের ম্যানেজার হতে পারবি জানিস!'

গাঁয়ের পাশে তেলকল। গাঁয়ের লোকজন কাজ করে। কাজ পেলেই বর্তে যায়। আর সেখানে তেলকলের ম্যানেজার সোজা কথা!

আমার ভালোমানুষ বাবার পক্ষেই সম্ভব এত বড়ো স্বপ্নের কথা মনে করিয়ে দেওয়া। তিনি না থাকলে মানুষের কোনো উচ্চাশা থাকা উচিত, বুঝতে পারতাম না।

বাবা খুশি থাকলে বলবেন, 'সবই ইচ্ছে করলে পারিস। কেন যে তোর ইচ্ছের দম এত কম বুঝি না।'

স্কুল থেকে রঙ্গনাথ মাস্টার কখনো বাড়ির রাস্তায় গেলেই মা ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে যাবে।

মা ডাকবে, 'ও রঙ্গ ঠাকুরপো...।'

রঙ্গমাস্টার জিয়লের বেড়ার পাশে ডাক শুনে দাঁড়াবে। চাদরটা গায়ে ভালো করে জড়াবে। সাইকেল থেকে এক পা নামিয়ে তাকাবে আমাদের বাড়িটার দিকে।

তারপর মাকে ছুটে আসতে দেখলেই বলবে, 'আমাকে কিছু বলবে?'

'চকোর পড়া পারছে। মার মুখে কি প্রত্যাশা তখন!'

আমি কাছে থাকি না। ঝোপে-জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ি। রঙ্গমাস্টার কী বলবে জানি।

মাঝে মাঝে মনে হয় জঙ্গল থেকে রঙ্গমাস্টারকে ঢিল ছুড়ে মারি। মাথা ফেটে রক্ত পড়ুক। কিন্তু মুশকিল বাবাকে নিয়ে। শিক্ষক বলে কথা। গুরুজন বলে কথা। পিতৃতুল্য বলে কথা। তুই চকোর শেষে এত অমানুষ হলি! বাপের নাম ডোবালি। জঙ্গলে ঘাপটি মেরে থাকি, হাতের ঢিল আর পড়ে না।

রঙ্গমাস্টার পকেট থেকে নস্যির ডিবা বের করে নাকে গুঁজতে গুঁজতে বলবে, পারছে কি পারছে না, চকোরই তো ভালো বলতে পারে। ও কোথায়? ও কিছু বলে না?

'ও তো বলে সবই পারছে।'

'কচু পারছে। পকেটে এত কাঁঠাল বিচি থাকলে হয়! কাঁঠাল বিচি এত পায় কোথায় বলো তো! এক পকেটে বিচি, এক পকেটে গুলি। ও ছেলের কিছু হয়!'

দেব একদিন ঠ্যাং খোঁড়া করে। হাঁ, বুঝবে। ছানুর পকেটে ছোলাভাজা মুড়ি না থাকলে সে যেমন হালকা হয়ে যায়, আমিও পকেটে কাঁঠাল বিচি ভাজা আর মার্বেলের গুলি না থাকলে হালকা হয়ে যাই। আমার কী দোষ বুঝি না।

কাজেই পড়া পারছি না খবরটা যে বাড়িতে আদৌ সুখবর নয় বুঝি। রঙ্গনাথ কাকাকে মজা দেখাতে হবে। তোমার যে কী দরকার আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার।

আমার ভালোমন্দ নিয়ে তোমার কি খুব মাথা ব্যথা আছে! চকোরের কিছু হবে না-দাদার দোকানে বসিয়ে দিন। কত কু-পরামর্শ মাকে।

আমি তো দোকানে বসতেই চাই। বাবার দোকানটা স্টেশনের মোড়ে। বাবার ভাঙা সাইকেলে বিশ-বাইশ মিনিটের রাস্তা। দুপুরে আমি কতদিন এমনিতেই যাই। টিফিন ক্যারিয়ার হাতে ঝুলিয়ে বাবার সাইকেল চালিয়ে যাই। মাথার উপর পাখিরা ওড়ে-কে যায়, চকোর যায়।

কোথায় যায়? বাবার ভাত নিয়ে ইস্টিশনের মোড়ে যায়। পাখিরাও বোঝে, চকোর সাইকেল পেলে সব ভুলে যায়। পাখিরা যা বোঝে, তুমি তাও বোঝো না।

তুমি মাকে নালিশ দাও। পড়া পারি না বল। মা খেপে গেলে ধূমাবতী। পিঠে কিল মারলে আমি বেঁকে যাই। হাত ছাড়ে না। হাত ছাড়লে আর পায়! ভালোই জানে, হয় রাস্তা ধরে পালাব, নয় খাল পার হয়ে সারের গুদামে লুকিয়ে পড়ব।

একান্ত না পারলেই উঠোনের আম গাছটায় লাফিয়ে উঠে পড়ব। গাছের মগডালে গিয়ে বসে থাকব।

মা চ্যাঁচাবে, 'নেমে আয় বলছি।'

'আমাকে মারবে না বলো।'

কে শোনে কার কথা।

'ওরে চকোর আমার মাথা খারাপ করে দিস না। ঘরের আনারসটা খুঁজে পাচ্ছি না। বছরকার ফল, কেউ মুখে দিল না, ঘর ফাঁকা।'

চকোর একদম রা করে না।

রঙ্গমাস্টার যাচ্ছিল, তাকেও নালিশ, 'কী ছেলে পেটে ধরলাম বলুন, কিচ্ছু ঘরে রাখা যায় না। গোটা আনারসটা ঘর থেকে হাওয়া। কার কাজ বলুন, এত মার খায় তবু লজ্জা হয়! মানদা বুড়ি আনারস খেতে চাইল, ঘরের আনারসটা দিয়ে এলি! আনারস না খেয়ে মরলে ভূত হয়ে ফিরে আসবে। এটা কথা হল রঙ্গঠাকুরপো!'

চকোর গাছের মগডালেই বসে আছে। নামছে না।

রঙ্গমাস্টার বলল, 'বুড়ির বড়ো খাই খাই স্বভাব হয়েছে। এবারে মরবে। সারাদিন গুষ্টিসুদ্ধ লোককে শাপশাপান্ত করছে।'

চকোর চিৎকার করে উঠল, 'দেখো না কী হয়! বুড়ি সবাইকে মজা দেখাবে। বুড়ির তিনকুলে কেউ নেই। কে দেখে!'

তা ঠিক। মাটির ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়ে থাকে। রাস্তায় শব্দ শুনলেই উঠে বসে-

'কে যায়?'

'আমি রঙ্গ।'

'তা বাবা, তোরা করাতির বংশ, তোদের ঘরে মা লক্ষ্মীর বাস। আমাকে ছেঁড়া তেনাকানি পরে থাকতে হয় কেন রে। শীতে কষ্ট পাই কেন রে আবাগির ব্যাটারা। লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে শীতের চাদর না দিলে।'

চকোর মগডালেই দাঁড়িয়ে পড়ল, 'বুড়ি মরে ভূত হয়ে তাড়া করবে। আমাকে বলেছে।'

রঙ্গমাস্টার দেখল চকোর উঁকি দিয়ে তাকে দেখছে।

'আজ স্কুলে যাস, পেঁদিয়ে বৃন্দাবন করে ছাড়ব।'

'দেখলেন, দেখলেন তো। বুড়িটা নির্ঘাত ওকে ঠকিয়েছে। এককথা বুড়ির, দেখ না মরি, তারপর বুঝবি মজা। চকোর ছেলেমানুষ, বুড়ির সব কথায় ভারি বিশ্বাস।'

তা বুড়ির এটা আছে। লোককে ভয় দেখিয়ে মন্দ বেঁচে নেই। চাল, আটা, গুড় যে যা পারে দিয়ে আসে।

তা ছাড়া চকোর তো আছেই।

'ভালোমানুষের ব্যাটা না হলে চকোর হয়। তোর ভাই রাজা হবার কথা। আমার পক্ককেশের মতো তুই দীর্ঘায়ু হবি চকোর। ঘরে তোর রাজরানি আসবে রে। আনারস না খেয়ে মরে গেলে পাড়া ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করবে নারে চকোর। তোর বাবা দেখলাম হাতে করে আনারস নিয়ে গেল।

'মরে গিয়ে পাড়ায় ঘোরাঘুরি করলে কি তোদের ভালো হবে রে! রাত-বিরেতে ঘর-বার হতে তোর মা ভয় পাবে, সেটা কি ভালো দেখাবে রে!'

বুড়ি মরে গিয়ে ভূত হয়ে ঘোরাঘুরি করবে। ভালো কথা না। তার চুল খাঁড়া। ঘরে আনারস এনেছে বাবা টের পেয়েছে। তারপরই মনে হল রঙ্গমাস্টারকে মজা দেখালে কেমন হয়।

চকোর বলল, 'ঠানদি, আনারস খাওয়াতে পারি। তুমি ভূত হয়ে রঙ্গমাস্টারকে জলে চোবাবে, কথা দাও।'

'কেন রঙ্গমাস্টার কী করেছে!'

'আমাকে শুধু শুধু মারে।'

'খাওয়া, মরে দেখি কী করতে পারি।'

কতদিন হয়ে গেল সেই বুড়ি মরে গেল। কিছুই হচ্ছে না। সকালে বিকালে চকোর বের হয়, রঙ্গমাস্টারকে দেখলেই পালায়। বড়োই আতান্তরে পড়ে গেছে। স্কুলে গেলে রঙ্গমাস্টার, না গেলে বাড়িতে মা, ধূমাবতী।

সেদিনও স্কুলে রঙ্গমাস্টার ওর চুল ধরে টানতে টানতে টেবিলে নিয়ে গেছে। পিঠে গুমগুম করে বিরাশি শিক্কায় কিল। তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। চোখ ছানাবড়া। সে বই নিয়ে দৌড়। আর রাতেই কাণ্ডটা ঘটল।

রঙ্গমাস্টার টিউশনি করে ফিরছে। মোড়ের তেঁতুল গাছটা ভালো না। গাঁয়ের মানুষজনের অভ্যাসও খারাপ। বাদ বিসম্বাদে গাছটাই সম্বল। ফি বছর ডালে কিংবা গোড়ায় গলায় দড়ি কেউ না কেউ ঝুলে থাকে।

অন্ধকারে গাছটার নীচ দিয়ে যেতেই ভয়। জ্যোৎস্না উঠলে আরও রহস্যময় হয়ে যায় গাছটা।

রঙ্গমাস্টার চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। গাছটার নীচে কেউ ডালে ঝুলে আছে যেন। সাদা থান পরা-জ্যোৎস্না আবছা আলোয় দূর থেকে বোঝাও যায় না, গলায় দড়ি দিয়েছে, না চোখের ভুল। যদিও সাহসে কুলাচ্ছে না এগিয়ে দেখার, হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। যদি মানদা গলায় দড়ি দেয়-তারপরই মনে হল, মানদা বুড়ি মাসও কাবার হয়নি, মরে ভূত হয়ে গেছে, সে গাছের ডালে গলায় দড়ি দেবে কোন অজুহাতে।

এরে বাবাঃ এটা কী দেখছে। বুড়ি লাফাচ্ছে, গান গাইছে-নাকি বলছে, 'কেঁ যায়? তিনকড়ির ব্যাঁটা যায়। নঁন্দ কঁরাতির ভাঁইপো যায়, বঁড়ই মঁজা।

আর মারে! রঙ্গমাস্টার পালাচ্ছে। ভূ...ত, ভূত...ত।

থানপরা বুড়িও পেছনে ছুটছে। তাও আবার সাইকেল চড়ে। আর নাকি সুরে বলছে, 'ওঁরে রঙ্গঁ পাঁলাস নাঁ। আঁমি যেঁ চঁকোরকে কঁথা দিঁয়েছি, তোঁকে জঁলে চোঁবাব।'

সামনেই মল্লিকদের পুকুর। বুক জল, কোথাও গলা জল। রঙ্গমাস্টার বলছে, 'কথা দিলেই হল! আমি কী করেছি!'

আর তখনই দেখল সাইকেলটা লাফাচ্ছে। ওর গায়ে এসে পড়বে। তার হাত-পা অবশ হয়ে গেছে আতঙ্কে। সে ছুটতে গিয়ে জলে গড়িয়ে পড়ে গেল।

'ডুঁব দেঁ। ডুঁব দেঁ। নঁইলে ঘাঁড় মটকে দেব। কাঁদায় পুঁতে রাঁখব। ডুঁব দেঁ। এঁকশো ডুঁব। এঁক, দুঁই, তিঁন...।'

সে রাতেই গাঁয়ে হইচই পড়ে গেল। রঙ্গমাস্টার বাড়ি ফেরেনি। দিনকাল খারাপ, চুরি রাহাজানি খুন ছিনতাই বড়ো সড়কে লেগেই থাকে। সবাই রঙ্গকে খুঁজতে বের হয়ে গেল। চকোরও তার বাবার ভাঙা সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেল। সেই এসে খবর দিল, রঙ্গকাকা পুকুরের জলে গলা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে তুলে আনতে হবে।

রঙ্গমাস্টারকে ধরাধরি করে তুলে আনা হল ঠিক-তবে কেন গলা জলে নেমে দাঁড়িয়েছিল বলতে পারল না। ভূত বললে যে মাষ্টারের ইজ্জত যায়। কথা বলতে গেলেই তোতলাতে থাকে। দাঁতকপাটি লেগে যায় আর কি।

চকোর খুবই উৎসাহিত হয়ে খড়কুটোয় আগুন জ্বেলে দিল। ছুটে গিয়ে শুকনো জামাকাপড় নিয়ে এল। ধরাধরি করে এত বড়ো লাশ নিয়ে যাওয়া কঠিন। আগুনে সেঁকে নিলে আবার তাজা হয়ে যাবে। নিজেই হেঁটে বাড়ি চলে যেতে পারবে।

কে যেন বলল, 'চকোরের সত্যি বুদ্ধি আছে।'

তবে ভূত না, অন্য কিছু-তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। রঙ্গমাস্টারের মুখ থেকে কোনো রা সরেনি। শুধু চকোরকে দেখলে রঙ্গমাস্টার পিটপিট করে তাকায়। তাকে দেখলে রঙ্গমাস্টার কেন যে পালায়, কেউ বোঝে না।

বাঁশবনের চার অপদেবতা

এবারে তিনুকাকা বর্ষাকালে এসে হাজির। বর্ষাকালে তিনি পারতপক্ষে আসেন না। আমরা বড়ো হয়ে অন্তত দেখিনি। বর্ষকালে যখন-তখন যেখানে-সেখানে দলবল নিয়ে বের হয়ে পড়া যায় না। বাড়িতে নৌকো একখানা, গাঁয়ের এ-বাড়ি সেবাড়ি যেতেও নৌকো লাগে। বাড়ির চারপাশে জল, মাঠঘাট সব জলে ভেসে যায়। দ্বীপের মতো এক-একটা বাড়ি নাক জাগিয়ে থাকে। হেন অবস্থায় সতত বিচরণশীল তিনুকাকার ভালো লাগবে কেন। বন্দি গৃহকোণ -তিনুকাকার পছন্দ নয়।

তিনুকাকা আসায় ক-দিন বাড়িতে ভালোমন্দ খাওয়া হবে। ঠাকুমার একমাত্র ভাইপো, বাপের বংশে সবেধন নীলমণি। কাকা এলে তাঁর জিম্মায় আমরা চালান হয়ে যাই। তিনিই তখন অভিভাবক। আমাদের জাঁদরেল মাস্টারমশাই পর্যন্ত ট্যাঁফু করতে সাহস পান না।

কাকা এসেই আমাদের খবরাখবর নেওয়া জরুরি দায়িত্ব ভেবে থাকেন। আমাদের সুবিধা-অসুবিধা সব জেনে নিয়ে সেই মাফিক কাজকর্ম শুরু করে দেন। এবারে আমাদের অভিযোগ অনেক।

এক নম্বর অভিযোগ, লাঙলবন্দের অষ্টমী স্নানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়নি।

দু-নম্বর অভিযোগ, মালতির মার মাচানে থেকে শশা চুরির দায়ে পাইকারি হারে ছোটোকাকার বেদম প্রহার।

তিন নম্বর অভিযোগ, গুপ্তধন আবিষ্কারের আশায় বসির মিঞার কোপে পড়ে যাওয়া। সে রাতে বাড়ির সব চুরি করে নিয়ে গেছে। কথা ছিল দুপুর রাতে দরজা খুলে ওর সঙ্গে বের হয়ে যাব গোপাটের তেঁতুল গাছের নীচে, সে আমাদের সেনেদের ভিটাবাড়িতে নিয়ে গিয়ে গুপ্তধনের খোঁজ দেবে। মেজদা বড়দা ছোড়দা আমি দুপুর রাতে দরজা খুলে ঠিক গেছিলাম, কিন্তু বসিরের পাত্তা পাওয়া যায়নি। সকালে দেখি সব সাফ। ছোটোকাকার পাইকারি হারে ঠেঙানো আমাদের কপালে লেখা ছিল। সব তাতেই আমরা আসামি, আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়।

চতুর্থ অভিযোগটি শুনে কাকা কিছুক্ষণ কপাল চুলকালেন। দোহারা চেহারার মানুষ। ফর্সা। মাথায় লম্বা চুল। ঝাকসু ওস্তাদ মার্কা গোঁফ। কাকার অনেক কীর্তির আমরা সাক্ষী। এবারের অভিযোগ শুনে বললেন, 'ক-টা হাঁস চুরি গেছে?'

'পাঁচটা।'

'কে নিয়েছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বড়দা বলল, 'বলো তো, সারাদিন হাঁস পাহারা দেব! আমাদের আর কাজ নেই! বর্ষাকালে কোথায় কখন চলে যাবে, আমরা নজর রাখি না কেন; ডিম খাবে সবাই, আর হাঁস চুরি গেলে যত দোষ আমাদের। গাণ্ডেপিণ্ডে গেলা ছাড়া আমাদের নাকি আর কাজ নেই। আমরা ঘুমোই, পড়ি, স্কুল যাই, দাঁত মাজি, হাডুডু খেলি ঠিক, সে তো সাঁজ লাগার আগে। নৌকোয় মাঝে মাঝে বিলে চলে যাই, সেটা কী যে দারুণ, শাপলা তুলে আনলে ঠাকুমা কী খুশি হন, ছোটোকাকার হম্বিতম্বি আর সহ্য হয় না কাকা। আবার হাঁস চুরি গেলে বাড়ি থেকে বের করে দেবে বলেছে। বের করে দিলে আমরা কোথায় যাব!'

'কেন আমার বাড়ি! তোদের আর এখানে রাখা যাবে না, দেখছি।'

আমি বললাম, 'জান তিনুকাকা, এত মনিব থাকলে মানুষ বাঁচে! ছোটোকাকা, মাস্টারমশাই। হরকুমার, যে গোয়াল গোরু সামলায় সে পর্যন্ত মনিবি ফলাচ্ছে। বড়দা রেগে একদিন সাফ সাফ বলে দিয়েছে, কিছু হবে না যখন তরকারি বেচে খাব।'

'না না, তরকারি বেচে খাওয়া ভালো না। তোরা কত বড়ো বংশের ছেলে! তোরা যদি পড়া না পারলে মারের চোটে তরকারি বিক্রি করে খাবি বলিস, তবে তোদের বাপ-কাকা-জ্যাঠাদের সম্মান থাকবে কেন! এ ছাড়া পড়া পারতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আমার তো বিদ্যা অষ্টরম্ভা-তাই বলে কী তরকারি বেচে খাই।'

ছোড়দা বলল, 'কী মার মারে না কাকা, মারের চোটে ভূত পালায়। পড়া না পারলে মারতে মারতে কচুকাটা করে ছাড়ে। আর হম্বিতম্বি, ওরে তোরা কী করে খাবি! খুবই ন্যায্য কথা। মাস্টারমশাইরও দোষ দেওয়া যায় না। স্কুলে তার মুখ থাকে না। মাস্টারমশাইর মুখ রক্ষার্থে বড়দা জানিয়েছে, তরকারি বিক্রি করে খাবে, মেজদা বলেছে, গামছা বিক্রি করে খাবে। আমি যে কী বিক্রি করে খাব, ভেবে পাচ্ছি না।'

তিনুকাকা আমাদের পুকুরপাড়ে নিয়ে এসেছেন। তেঁতুল গাছের শেকড়ে বসে শলাপরামর্শ হচ্ছে। তিনুকাকাই বলতে পারবেন, আমরা মানে আমি আর ছোড়দা কী করে খাব। বড়ো হলে খেতে হবে, বাড়ি থেকে যদি বের করে দেয়, তবে আর এক ফ্যাসাদ। কিছু না করতে পারলে চলবে কেন?

তিনুকাকার মাথায় আসছে না, আমরা কী বিক্রি করে খেতে পারি। তখনই মনে হল লজেন্স বিক্রি করে খেতে পারি, মুড়িমুড়কি বিক্রি করে খেতে পারি। এমন বলতেই তিনুকাকা বললেন, 'শাবাশ, তোদের মাথা নেই কে যে বলে!'

'মাথা আর আছে কোথায়! পাঁচ-পাঁচটা হাঁস গায়েব হয়ে গেল। এক ডজন হাঁস বাড়িতে-শেয়ালে খায়, কিন্তু এত সাহস হবে কী করে! সাঁজ না লাগতেই আমরা, আয় তৈ তৈ শুরু করি। ওরা ঠিক যেখানে থাকুক, কি ধান খেত কি পাট খেত কিংবা পুকুরের কচুরিপানার ভিতর যেখানেই থাকুক বের হয়ে আসবে। ঝোপজঙ্গল থেকেও বের হয়ে আসে।' আমি এমন সাফাই গাইতেই তিনুকাকা বললেন, 'শেয়ালেই খায়। বড়ো ধূর্ত প্রাণী। সংস্কৃত পুঁথিতে শেয়ালপণ্ডিত আর কুমিরছানার গল্প পড়িসনি! হাঁস চুরি যায়নি, শেয়ালেই খেয়েছে।'

তারপরই তিনি বললেন, 'শেয়াল রাতে হুক্কা হুয়া করে?'

'করে।'

'কতদূর থেকে করে? বাঘার কোনো দায়িত্ব নেই? বাঘা কী করে?'

বাঘা আমাদের পোষা কুকুর। খায় আর ঘুমোয়। মাঝে মাঝে গিরগিটি দেখলে তাড়া করে।

বললাম, 'বাঘা তো হরকুমারের পাশে শুয়ে থাকে তখন। দু-জনেই ঘুমোয়। কেউ কিছু বলে না।'

তিনুকাকা খুব বিমর্ষ গলায় বললেন, 'তোরা দেখছি বাড়িতে কুকুরের থেকেও অধম।'

বড়দা বলল, 'জান ইচ্ছে হয় কোথাও চলে যাই। একদম ভালোলাগে না। এত শাসন সহ্য হয়! তুমি বলো তিনুকাকা!'

'সহ্য না হবারই কথা। তবে কী মুশকিল জানিস, যাবি কোথায়! এখন তো ত্রেতাযুগের মতো পঞ্চবটী বনও নেই, যে তাড়া খেয়ে সেখানে গিয়ে পালিয়ে থাকবি। দশরথের তাড়া না খেলে রামের বয়েই গেছিল বউকে নিয়ে বনবাসে যাবার। বইয়ে সত্য কথা লেখা থাকে না জানিস।'

এটা আমাদেরও বিশ্বাস। বইয়ে সত্য কথা লেখা থাকে না। লেখা থাকলে শাসনের নামে আমাদের উপর এত অত্যাচার হত না। বাড়ির কুকুরেরও যখন-তখন ঘুমোবার, দৌড়োবার স্বাধীনতা আছে। আমাদের তাও নেই। ঘড়ি ধরে চলা। সকালে সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে না উঠলেই তাড়া, হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে না বসলেই তাড়া, পড়া শেষ করে চান-খাওয়া করে স্কুলে না গেলেই তাড়া। স্কুল থেকে ফিরেও তাড়া-কে কোথায় কী করছে হরকুমারের গোয়েন্দাগিরি। সাঁজ লাগলে পড়তে বসা, রাত দশটার আগে ছুটি নেই। এর উপর কাকার হুমকি, 'হাঁস যদি খোয়া যায়, সব ক-টার মাথা ন্যাড়া করে দেব।'

কাকাকে বললাম, 'মাথা ন্যাড়া করা কি ঠিক! আমাদের ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে যদি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখে কী অপমান বলো! পাশের বাড়ির শোভা আবু খিলখিল করে হাসবে। তুমি একটা বিহিত করো কাকা। পায়ে পড়ি।'

'হবে হবে। আগে বাঘাকে প্রহার করতে হবে।'

'কেন?'

'সে কি শুধু লেজ নেড়ে আদর খাবে! শেয়ালেরই কাজ। অনেক ভেবে দেখলাম, তেনারা বর্ষায় মাঠঘাট বনজঙ্গল ভেসে যাওয়ায় গাঁয়ের কোনো ঝোপজঙ্গলে এসে উঠেছে। উঠলেই তো হয় না, খেতে হয়! খাবে কী? এ তো আর মাঠ কিংবা বিল নয় যে গর্তে লেজ ঢুকিয়ে কাঁকড়া তুলে খাবে!'

বড়দা কাকার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা পুকুরপাড়ে। সাঁজ লাগার আগে হাঁসগুলি তুলে নিতে এসেছি। পুকুরের পাড় জেগে। এদিক-ওদিক বনঝোপ। তারপর জল আর জল, ধান খেত পাট খেত। সর্বত্র বুক-সমান অথবা সাঁতার জল। শেয়াল এতটা জল সাঁতরে আসতে পারে ভাবতে বিশ্বাস হয় না। শুধু আমাদেরই হাঁস চুরি যাচ্ছে না-কারও হাঁস-মুরগি, ছাগলের বাচ্চাও-এত ধূর্ত তবে!

আমরা ডাকছি, 'আয় তৈ তৈ।'

আমাদের অবস্থা মধুসূদন-ত্রাহি ডাকে গগন ফাটছে-আয় তৈ তৈ।

বড়দা বলল, 'লেজে কাঁকড়া ওঠে?'

তিনুকাকা বললেন, ওঠে। শেয়াল কাঁকড়ার গর্তে লেজ ঢুকিয়ে নাড়ে। আহাম্মক আর কাকে বলে। কাঁকড়ার চিমটি কাটার স্বভাব। গর্তে কোন বেয়াদপ লেজ নাড়ছে! যেই না চিমটি কাটা আর অমনি সুরুত করে টান। কাঁকড়া বাবাজি আটক। তারপর তেনার ভুরিভোজ। সুতরাং বুঝলে-' বলে তিনি কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে বললেন, 'কতদূর?'

'কী কতদূর কাকা?'

'বাঁশের জঙ্গল, বনবাদাড়। কতদূর?'

'সে তো বেনেপাড়া পার হয়ে।'

'জেগে আছে না ভেসে গেছে?'

'কী জেগে আছে কাকা?'

'আরে ডাঙাজমি না জলাজমি।'

'ডাঙাজমি কাকা।'

'ব্যস। কাল সকালে নৌকোয় বুঝলি, কেউ টের পাবার আগে ভেসে পড়া। বাঁশবনে তেনারাই আস্তানা গেড়েছেন। সব ভেসে গেছে জলে, তেনারাই বা যাবেন কোথায়, কিন্তু তাই বলে তোদের দুর্ভোগ আমি সহ্য

করব কেন! বাড়িতে গেলেই তোদের জন্য মন খারাপ হয়ে যায়। থাকতে পারি না। চলে আসি। আর শোন, গোটা চারেক লাঠি, কিছু শুকনো লঙ্কা, কিছু খড়কুটো-এই সঙ্গে যাবে। বংশ নির্বংশ না করে ছাড়ছি না।'

কাকাকে আমরা জানি, মাঝে মাঝে ভড়কে যাবার স্বভাব। কাকার কথা, সাহস না থাকুক, তেজ আছে। তা কাকার তেজ আছে। এখানে এসে বার তিনেক নিখোঁজ হয়ে গেছিলেন। একবার ভূতের ভয়ে, একবার চোরের ভয়ে আর একবার পুলিশের ভয়ে। আমার ছোটোমামা থানার দারোগা হয়ে সোজা ধরাচুড়ো পরে ঘোড়ায় চড়ে হাজির। তিনুকাকা ছিপ ফেলে পুকুরে মাছ ধরছিলেন, না কী যেন করছিলেন-পুলিশ না একেবারে সাক্ষাৎ দারোগা শুনেই দৌড়। যত ডাকি তত ছোটেন। বছর খানেক পরে উদয় হলে তাঁর এককথা, 'ভয় পাইনি বুঝলি, ভড়কে গেছিলাম।'

ভয় আর ভড়কে যাওয়ার মধ্যে অনেক তফাত-কাকার প্রতি এজন্য বিশ্বাস হারাতে পারিনি। আমাদের পোষা হাঁসগুলির জন্যও কষ্ট। কাকার কথামতো চারটে বাঁশের শক্ত লাঠি আর খড়কুটো, শুকনো লঙ্কা নিয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠেই যাত্রা করা গেল। ঠাকুমা দরজা খুলে বের হতেই দেখলেন, সাতসকালে তিনু কোথায় যাচ্ছে। সহসা হাঁকলেন, 'আবার তোরা ওর পেছনে লাগলি!' ঠাকুমার ধারণা আমাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়েই ভাইপোটি তাঁর নিখোঁজ হয়ে যায়। আমরাই নিরুদ্দেশের মূলে।

কাকার কড়া ধমক, 'পিসি চুপ করো তো-যাচ্ছি শুভকাজে, উনি মাঝখানে বাগড়া দিতে এলেন!'

কী এমন শুভকাজ বুঝতে না পেরে শুধু বললেন, 'ফিরে আসবি তো?'

'আলবৎ আসব।'

নৌকো ভেসে গেছে। ধান খেতের ভিতর দিয়ে নৌকো যাবে। আরে লগিই তো নেওয়া হয়নি! বইঠা মেরে ফের লগির খোঁজে। আমাদের তাড়নায় নৌকো ঘাটে থাকে না, লগি হরকুমার গোয়ালঘরে তুলে রাখে। কী যে রাগ হচ্ছিল! জীবনে স্বাধীনতা পেলে প্রথম কাজই হবে আমাদের, ব্যাটাকে ঠ্যাঙানো। একবার পড়ার টেবিলে মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্ন, 'বড়ো হয়ে তোমরা কী করবে? বড়দা বলেছিল, 'হরকুমারকে ঠ্যাঙাব স্যার।'

'তোমরা?'

'আমরাও স্যার।'

'খুব ভালো কাজ।' মাস্টারমশাই গুম হয়ে গেছিলেন। সুতরাং হরকুমারকে ঠ্যাঙানো কত জরুরি এই লগির ক্ষেত্রেও বোঝা গেল। ছোটোকাকা টের পেলে আমাদের ধর্মনাশ হবে। যত তাড়াতাড়ি ভেগে পড়া যায়। দ্রুত লগি ঠেলে বাড়ি থেকে অদৃশ্য হতে না পারলে দুই কাকাতে কুরুক্ষেত্র বেধে যেতে পারে। তবে কুরুক্ষেত্র শুরুর মুখে ঠাকুমা ছোটোকাকার পক্ষে, আর শেষ হবার মুখে তিনুকাকার পক্ষে। ফলে তিনুকাকাই জিতে যান। ঠাকুমার কথা সংসারে শেষ কথা। আমার বাবা-কাকারা বড়ো বেশি মাতৃভক্ত-এ-বিষয়ে তাঁদের একটাই তুলনা-বিদ্যাসাগর আর ভগবতী দেবী।

আমরা মাঝিবাড়ি পার হয়ে খালে পড়েছি, খাল ধরে গেলে দক্ষিণ পাড়া, দক্ষিণ পাড়া পার হলে জেলে পাড়া এবং তারপরই বিশাল বাঁশের বন। এই বনেই এখন তেনারা আস্তানা গেড়েছেন। এখন তাদের ডেরা খুঁজে বের করতে হবে। নৌকোটা বাঁশের গুঁড়িতে বেঁধে নেমে পড়েছি। আমার মাথায় খড়কুটোর আঁটি, কাকার কোঁচড়ে পোয়াটেক শুকনো লঙ্কা, মেজদার হাতে চারটে বাঁশ, বড়দার হাতে ধান ঝাড়ার কুলো। কুলোর বাতাসে লঙ্কা পোড়ার ধোঁয়া গর্তের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে পারলেই সুড়সুড় করে ইঁদুরের মতো সব বের হয়ে আসবে। বাঁশের ঝাড় অজস্র-দিনের বেলাতেও মনে হয় অন্ধকার। তবে রক্ষা, বাঁশঝাড়ের নীচে কোনো আগাছা গজাতে পারে না। বৃষ্টি-বাদলায় অথবা বর্ষায় দুব্বো ঘাস ছাড়া কিছু গজায় না। কিছুদূর গেলে টের পেলাম বাঁশের ঝাড় ঘন, কোথাও কোনো গর্ত দেখছি না। আরও ভিতরে ঢুকে যেতে হবে। কিন্তু অজস্র কঞ্চি বের হয়ে ঢোকার রাস্তা অগম্য করে রেখেছে। কঞ্চি সরিয়ে ক্রমে আরও গভীরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকছি। কাকা একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন-'গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে, বের হলেই মাথায় বাড়ি, বুঝলি! তারপর

বলির পাঁঠার মতো লাশ সরিয়ে আবার বাড়ি। চার জন পরপর দাঁড়িয়ে থাকবি-চারটে লাঠি হাতে।' কাকা বললেন, 'আমি শুধু কুলোর বাতাস দিয়ে যাব। এই একটাই কাজ আমার, বুঝলি!'

আমরা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। কঞ্চি লেগে আমাদের শার্ট-প্যান্ট ছিঁড়ে যাচ্ছে। গায়ে লেগে রক্তপাত হচ্ছে। ভ্রূক্ষেপ নেই। হঠাৎ মেজদা চিৎকার করে উঠল, 'কাকা পেয়েছি, গর্ত!' সুতরাং লেগে পড়া গেল। আগুন, লঙ্কাপোড়া, কুলোর বাতাস। আমরা রেডি। কোথায় কে দাঁড়াবে ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে। কাকার একটাই কথা- 'লাঠি ফসকালে, ছাল-চামড়া তুলে নেবনে। দেখ কী মজা হয়।' কিন্তু কুলোর বাতাসে গর্ত থেকে কেউ মুখ বার করছে না দেখে, কাকা বড়ো মুষড়ে পড়লেন। বুঝতে দিলেন না, বললেন, 'আছে আছে-সামনে চল।'

সামনে যেতে যেতে কোথায় যে ঢুকে যাচ্ছি, মাথার উপর বাঁশের ঘন ছায়া, আর বাতাসে বাঁশ নাড়া খেলে ক্যাঁক কোঁক শব্দ, কেমন ভৌতিক এবং এক আজগুবি দেশে আমাদের কাকা নিয়ে এসেছেন। বাড়ির পাশেই এমন একটা গভীর বন আছে, আমরা কাকা না এলে ইহকালে টের পেতাম না। বর্ষার সময় সাপখোপের উপদ্রব বাড়ে-কাকা তারও পরোয়া করছেন না। কাকার তাড়া, আছে আছে, এগোও, একবার না পারিলে দেখো শতবার। রবার্ট ব্রুসের গল্প বলে তিনি আমাদের হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর বাণী ঝড়তে থাকলেন। এমন একটা জায়গায় এসে গেছি যে এখন কেউ আর নড়তে পারছি না! বাঁশের কঞ্চি হাজার হাজার, আমাদের যেন জালে আটকে ফেলেছে। আমিই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলাম, 'কাকা, বের হতে পারছি না!' মেজদাও বলল, 'বের হতে পারছি না!' বড়দাও চিৎকার করছে, 'বের হতে পারছি না।' কাকা পেছনে, সবসময় বিশ-ত্রিশ গজ পেছনে।

হাওয়া উঠেছে। বৃষ্টিপাত শুরু। ঝড়। কোথা থেকে দমকা হাওয়ায় সব বাঁশগুলোকে কোনো এক অপার্থিব শক্তি যেন এলোমেলো করে দিয়ে গেল। হঠাৎ আমি কেঁদে ফেললাম, 'কাকা, সামনে পেছনে বাঁশ আর কঞ্চি ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বাঁশ পাতায় গা কেটে ফালা ফালা করে দিচ্ছে।' আমরা পাগলের মতো চ্যাঁচাচ্ছি। কাকাকে দেখতে পাচ্ছি না, সাড়াও পাচ্ছি না। ডাকছি, 'কাকা, শিগগির বাড়িতে খবর দাও, বাঁশগুলি ঝড়ো হাওয়ায় হেলেদুলে আমাদের আটক করে ফেলেছে। বাঁশগুলি বাঁশ না, ভূত। শিগগির খবর দাও, না হলে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ব।'

কোনো সাড়া নেই।

'তিনুকাকা!'

আর তিনুকাকা! আমাদের অজ্ঞান হবার জোগাড়। অন্ধকারে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমরা আর বাড়ি ফিরতে পারব না, বাঁশবনে ক্যাঁক কোঁক শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। এমনকী কোনো কীটপতঙ্গেরও না। আমাদের আর্ত চিৎকার কেউ শুনতে পাচ্ছে বলেও মনে হচ্ছে না। আমরা চার ভাই এখানে বাঁশের জঙ্গলে আটকা পড়েছি কেউ জানতেও পারবে না। এখানে আমরা তবে মরে পড়ে থাকব। ভাবতেই শরীর হিম হয়ে গেল। বসে পড়লাম। আমাদের মৃত্যু তবে আসন্ন। মৃত্যুভয় মানুষকে কতটা কাহিল করে এই প্রথম টের পেলাম।

ছোটোকাকা এসে উদ্ধার করেছিলেন। তিনুকাকা আবার নিখোঁজ। বাঁশবনে নৌকো বাঁধা দেখেই টের পেয়েছিলন ছোটোকাকা, বাড়ির শয়তানরা এখানে লুকিয়ে আছে। তিনি চিৎকার করে ডাকলে বড়দা বলেছিল, 'আমাদের ভূতে ধরেছে কাকা। আমাদের কোনো দোষ নেই।'

ছোটোকাকা শুধু বললেন, 'তোরা মানুষ না অপদেবতা! ঢুকলি কী করে?'

মানুষজন বাঁশ কেটে রাস্তা করছে। আমরা বাঁশ কাটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি শুধু। বাঁশ কেটে সাফ না করলে আমাদের বের করা ভগবানেরও অসাধ্য কাজ বুঝতে পারছি।

বছর খানেক বাদে তিনুকাকার উদয়। বললাম, 'কাকা, তুমি এত ভীতু! আমাদের ফেলে পালালে!'

তিনুকাকার সাফ জবাব, 'তোদের তিনুকাকা কখনো ভয়ে পালায় না, ভড়কে গেলে পালায়। বুঝলি কিছু!'

টিংকু

আমাদের পরিবারে পাঁচ ভাইয়ের পর এক বোন।

বোনের নাম টিংকু। বাড়িতে তার আদর বেশি। এই আদরে কিছুটা সে বাঁদর হয়ে গেছে। জেদ প্রবল। কিছু করবে ভাবলে কিংবা কোথাও যাবে বললে, সে যাবেই।

আমরা যাচ্ছি পুকুরে বড়শি ফেলে পুঁটি মাছ ধরতে। বর্ষাকালে ঘাটেই নানাপ্রকারের মাছ ঘুরে বেড়ায়। পুঁটি, ট্যাংরা, কখনো খলসে মাছ।

আবার একটু দূরে কচুরিপানা সাফ করে বড়শি ফেললে, বড়ো কই মাছও ধরা যায়। পূজার ছুটি, সময় কাটে না। পূজার সময় মাঠঘাটে এবং সর্বত্র জলাভূমি। পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়ালে আদিগন্ত মাঠ জলে এখনও ডুবে আছে।

তবে জলে টান ধরেছে। নদী খালবিলে জল নেমে যাচ্ছে। পাট কাটা হয়ে যাওয়ায় সেগুলিও বড়ো জলাভূমি। জল আর শাপলা শালুকে ভরতি জলজ ঘাস আর শ্যাওলা তো আছেই। ধান খেত থেকেও জল নেমে যাচ্ছে। এই সময়টায় নানাবিধ মাছের প্রবল আনাগোনা। কাজেই আমরা পাঁচ ভাই তখন বড়শি ছাড়াও নানাবিধ মাছ ধরার চাঁই জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমার ছোটোকাকা মাছ ধরায় ওস্তাদ। তিনিই হাট থেকে ডজন খানেক চাঁই কিনে এনেছেন।

অর্থাৎ এই সময়টায় বাতাসেও জলকণা ভেসে বেড়ায়।

পুকুরে লাল শালুকের ফুল।

কাকা সাঁজ লাগার আগে নৌকায় চাঁই তুলে নিতেন। তখনও টিংকু হাজির। আমি আর ছোটকা।

আমরা বড়শি নিয়ে হাঁটছি, কখন দেখি টিংকু পেছন থেকে ডাকছে, 'দাদারে...।'

'আরে তুই!'

'আমি যাব।'

'তুই না গেলে পুকুরপাড়ে লাফাবে ঝাঁপাবে কে? দু-দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারিস না। মাছ শব্দ পেলে পালায় জানিস না? না, তোর যেতে হবে না।'

'আমি লাফাব না।'

'মাছ দেখলে তোর যে কী হয়, সব তুই ভুলে যাস। ছোটোকাকার সঙ্গে যাবি। চরণ নৌকা নিয়ে ফিরলেই কাকা ঝোপে-জঙ্গলে চাঁই পাতার জন্য বের হয়ে পড়বে।'

'না আমি যাব!'-বলেই কান্না। কান্না শুনলে রক্ষা নাই, ঠাকুমা কোথা থেকে উদয় হন। এককথা ঠাকুমার, 'টিংকু যাবে। না নিয়ে গেলে তোমরা মাছ ধরতে যেতে পারবে না।'

হয়ে গেল। ঠাকুমা ফতোয়া জারি করে দিলেন।

আমরা যে কী করি?

'এই চল।'

টিংকু দু-লাফে বাড়ি থেকে বের হয়ে এল।

আমার দাদারা গজগজ করছে।

আসলে আমার দাদারা কেন, আমিও জানি তাকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে কাকিমা-জেঠিমারা উপদ্রবে পড়ে যাবে। রাগে অভিমানে কোথায় গিয়ে যে লুকিয়ে পড়বে, খুঁজেই পাওয়া যাবে না। সকালের জলখাবার হয়ে গেছে কখন!

টিংকু কোথায়?

'ওরে টিংকু কোথায় গেলি! খাবি না!'

টিংকুর সাড়া পাওয়া যায় না।

'ওরে টিংকু, আর কত জ্বালাবি! সবার খাওয়া হয়ে গেল তোর পাত্তা নেই।'

তার পরই খোঁজ খোঁজ।

ঠাকুরঘরের পেছনে লেবুর ঝোপে যদি লুকিয়ে থাকে! না নেই।

বাড়ির পেছনের বেত ঝোপের অড়ালে যদি বসে থাকে! না নেই।

ফুলের বাগানে? না তাও নেই।

বৈঠকখানায়! না নেই।

সব ঘরে নেই। ঝোপে-জঙ্গলে নেই। দামাল মেয়ে কাউকে ভয় পায় না। তোমরা মাছ শিকারে যাবে, যাও। দেখো টিংকু কী করে!

কাজেই ঠাকুমা ফতোয়া জারি করতেই পারেন।

সে নিজে বের না হয়ে এলে, কারও ক্ষমতাই নেই কেউ তাকে খুঁজে বার করে। আট-দশ বছরের টিংকুর এই দাপট সবাই আবার মুখ বুজে সহ্যও করে। সে 'কু' শব্দে জানিয়ে দেয়, সে আছে। এই পর্যন্ত। কোথা থেকে 'কু' করছে কেউ টের পায় না। পাঁচ ভাইয়ের পর এক বোন বলতে কথা। আর বাড়ির লোকজনের তো ভয় হওয়ারই কথা। যতদূর চোখ যায় সর্বত্র কোমর সমান জল, কোথাও বুক জল, কোথাও আবার লগি তল পায় না। চারপাশে বর্ষার জল, সব মাঠঘাট নদীনালা জলে ভরতি। বর্ষার জল বাড়ির সীমানায়ও উঠে আসে। আর এসময় যদি টিংকুকে খুঁজে না পাওয়া যায়। জলের আতঙ্কে সবারই তরাস শুরু হয়।

ওকে আমরা নানাভাবে সাঁতার শেখানোর চেষ্টাও কম করিনি।-'এই নাম।'

সে নামে।

তবে হাঁটুজল কিংবা কোমরজল পর্যন্ত। আর নামে না!

'কী হল?'

'ভয় করে।'

'আরে, আমরা তো আছি। হাত ধর।'

কে কার হাত ধরে। দু-লাফে পুকুরের ঘাট থেকে উঠে দৌড়োয়।

তাকে আর ধরা যায় না।

গায়ে সাদা ফ্রক, চুল কোঁকড়ানো। কেমন দেবী-দেবী মুখ। এত সুন্দর টিংকু যে, শাসন করাও যায় না। শাসন করলেই দু-চোখ বেয়ে জল গড়াবে।

'দাদা আমাকে বকলি!'

'ঠিক আছে বকব না আয়।'

'না, যাব না।'

শত চেষ্টাতেও আর তাকে হ্যাঁ করানো যায় না। আমরা বিরক্ত হয়ে বলি, 'ধুস ছেড়ে দে। যা খুশি করুক। যা ভাগ্যে আছে হবে।'

'আয়, আমরা সাঁতার জানি।'-বলে বিশাল পুকুরের মাঝখানে অনায়াসে চলে যেতে পারি। চিত সাঁতারে ডুব সাঁতারে আমরা ওস্তাদ। টিংকু পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুকে জড়িয়ে রেখেছে আমাদের জামাকাপড়। আর দাদাদের সাঁতারে মজা উপভোগ করছে।

এই মেয়েকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে হয়! আবার লুকিয়ে পড়তেই পরে। বোঝো মজা।

বাধ্য হয়ে বলি, 'চুপ করে বসে থাকবি।'

'থাকব।'

'নড়াচড়া চলবে না।'

কত যে তখন বাধ্য মেয়ে। একেবারে সরল আর আর অকপট। সে তখন এত সুবোধ বালিকা হয়ে যায় যে, ভাবাই যায় না।

'এই দাদা দেখ খোট দিচ্ছে।'

ফিসফিস করে বলবে। মাছেরা বড়োই সতর্ক থাকে। গাছ থেকে তাল পড়লেও জলের নীচে মাছগুলি বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। বর্ষার জল, ডালিমের রসের মতো টলটল করছে। পাঁচ-সাত হাত নীচের খাদ জলজ ঘাস সবই অতি স্পষ্ট।

'দাদারে-'

'ইস! আবার কথা বলছিস?'

'আমাকে লাল শালুক ফুল দিবি?'

পুকুরটা বিশাল। দিঘি বললেও চলে। জলে শাপলা শালুকের ছড়াছড়ি, একদিকে রক্ত শাপলার ফুল ফুটে আছে। যখন সাঁতার কাটি তখনই যত বায়না তার। তাই রক্ত শাপলা ফুল ডুবে ডুবে মাঝ পুকুর থেকে নিয়ে আসি।

'নে ধর।'

'আমাকে পদ্ম দিবি।'

'কোথায় পাব?'

'ঠিক ফুটবে দেখিস।'

'ফুটলে দেওয়া যাবে। যা বাড়ি যা।'

সেজদা বলল, 'আমাদের পুকুরে পদ্ম ফোটে না। তুই বললেই ফুটবে।'

'না ফুটবে।'

'আরে, আবার সেই জেদ!'

'ঠিক আছে, ফুটলে দেব তো বললাম।'

ছোটকা নৌকা নিয়ে বের হয়েছেন। চরণকে নেননি। কোষা নৌকার পাটাতনে সাজানো চাঁই। পলতা বাঁশ কেটে বাতা, বাতা ফালাফালা করে চেঁচে লম্বা লম্বা কাঠি। তাই দিয়ে তৈরি। জল নেমে যাওয়ার সময় চোরাস্রোত থাকে। আদিগন্ত জলাদেশের ঝোপজঙ্গলেও একবুক জল। তার ভেতর চাঁই পেতে ফিরতে ফিরতে সাঁজ লেগে যায়-ভোররাতে ছোটকা ঘুম থেকে উঠেই পুকুরের ঘাট থেকে নৌকা নিয়ে বের হয়। কোমরজল, হাঁটুজলে পাতা থাকে চাঁইগুলো। মাছ ঢুকলে আর বের হতে পারে না। এমনকী সাপ শামুক যাই ঢুকুক,

আটকা পড়ে যায়। আর কপাল ভালো থাকলে কতরকমের যে মাছ, কই মাগুর গলদা চিংড়ি ট্যাংরা-রাতে জলের স্রোতে উজানে উঠে আসার মুখে চাঁই-এর মধ্যে আটকা পড়ে যায়।

আমরা ছোটোরা যেতে পারি না, নিষেধ অছে। কিন্তু টিংকু যদি চায় যেতে তাকে নিতেই হবে।

ফ্রক পরা টিংকু যেতে চাইলে নিতেই হবে। কারণ ভ্যাক করে কেঁদে দিলেই ঠাকুমা ছুটে আসবে।

'কী হল আবার?'

'কিছু না। ছোটকা নৌকায় যাচ্ছে। আমি যাব।'

সঙ্গেসঙ্গে হয়ে গেল ফতোয়া জারি।

'টিংকু না গেলে তোকেও যেতে হবে না জলু, নৌকা ঘাটে বেঁধে রাখ। দশটা না পাঁচটা, একটি মাত্র মেয়ে তাকে নিয়ে যেতে তোর আপত্তি।'

'মা, ও তো সাঁতার জানে না।'

'টিংকু সাঁতার না জানুক, তুই তো জানিস। তুই আছিস কী করতে!'

সারা বর্ষায় প্রায় দিনই টিংকুকে নিয়ে যেতে হয়। না নিলে ছোটকার মাছ ধরার নেশাই বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে টিংকু কখন কী নিয়ে বায়না ধরবে তা বোঝা শিবের অসাধ্য। তখন ছোটকা চুপিচুপি নৌকার পাটাতনে চাঁই নিয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে বের হয়ে যায়। লগি মারে, আর কোনের দিকে তাকায়। কারণ পুকুরের পাড়ে এসে কখন যে মেয়েটা হাজির হবে তার ঠিক কী।

আর নৌকায় উঠলে টিংকুর যত কথা।

'এটা কী পাখি ছোটকা?'

'ডাহুক পাখি।'

'ওই যে ডাকছে, কুব কুব শব্দ করছে ওটা কী পাখি?'

'কোড়া পাখি।'

'আমাকে একটা কোড়াপাখি এনে দেবে? আমি পুষব।' তারপর বলবে, 'জান আমার ফড়িংয়ের মতো উড়তে ইচ্ছে হয়।'

'উড়ে কোথায় যাবি?'

'কেন, পরিদের দেশে।'

'ওখানে গিয়ে কী করবি?'

'ওদের সঙ্গে খেলা করব, কী না মজা হবে।'

'আর কী চাই তোর টিংকু।'

'একটা পদ্ম এনে দেবে বিল থেকে। ঠাকুরের পায়ে দেব।'

'ঠিক আছে, দেব। এখন চুপ কর তো। বলে ছোটকা চাঁই নিয়ে কোমর জলে নেমে ঝোপের ভেতর চোরা স্রোতের মুখে চাঁই পেতে সামনে পেছনে কাঠি পুঁতে দেন। তারপর কচুরিপানা, জলজ ঘাস চাঁইয়ের ওপরটা ঢেকে দেওয়ার সময় দেখেন টিংকু ঝুঁকে কী দেখছে।

'আরে পড়ে যাবি!'

তা পড়ে যেতেই পারে-সারা মাঠে বর্ষার জল। জলে আদিগন্ত থইথই করছে। নৌকা দুলছে। আকাশে দু-একা তারাও দেখা যাচ্ছে-ছোটকা দেখছেন টিংকু কিছুতেই গলুই থেকে নড়ছে না। তিনি ধমক না দিয়ে পারেন না, 'কী হচ্ছে টিংকু। মাঝখানের পাটাতনে বসে থাক। ঝুঁকলে নৌকা কাত হয়ে যায় বুঝিস না। পড়ে-টড়ে গেলে কেলেঙ্কারি।'

'ছোটকা তুমি আমায় বকছ?'

'না না, তা পারি। তোর ঠাকুমা আমাকে আস্ত রাখবে।'

'জান, ছোটকা আমার খুব দুঃখ।'

'ঠিক আছে। হাতের কাজ সারি।'

'না। দুঃখের কথা তুমি শুনবে না?'

'বল না, শুনছি তো।'

আমার না পদ্ম ফুল হয়ে ফুটে থাকতে ইচ্ছে হয়। আমাদের পুকুরে পদ্ম ফুল ফোটে না কেন? কেবল, শাপলা, পাতিশাপলা নাহয় রক্তশাপলা।'

ছোটকাকা বললেন, 'বিলে পদ্ম ফুল ফোটে। পুকুরে ফোটে না।'

'ফোটে।'

'কে বলল ফোটে? আরে টিংকু পদ্ম ফুল ফোটে বিলের জলে। বিলের জল-মাটি আলাদা-'

'আমি যদি পদ্ম হয়ে ফুটে থাকি ছোটকা। কী মজাই না হবে!'

'কোথায় ফুটবি?'

'কেন পুকুরে?'

'ওতে কী হবে?'

'পুকুরের শোভা বাড়বে।'

'কী পাকা পাকা কথা। ঠিক আছে, যখন হবি তখন দেখা যাবে।'

আকাশে মেলা তারা ফুটে আছে।

ছোটকা নৌকায় লগি মারছেন। ঝোপে-জঙ্গলে জোনাকি জ্বলছে। এবং এক আশ্চর্য রহস্যময় জগৎ। টিংকু চুপচাপ বসে নাই। কথার খই ফোটে, কত কথা- 'ছোটকা তারাদের দেশে কারা থাকে?'

'ঠাকুরদেবতা থাকে।'

'আমি না স্বপ্নে তারাদের দেশে পরিদের দেখি। ঠাকুরদেবতা দেখি না কেন?'

'স্বপ্নে সবকিছুই দেখা যায়। এই ঠিক হয়ে বোস। আবার নৌকার পাশে গিয়ে বসলি! জলে হাত দিবি না।'

'শাপলা তুলছি।'

'তোমাকে আর শাপলা তুলতে হবে না।'

'ঠাকুমা শাপলা ডাটি দিয়ে শুকতোনি খেতে ভালোবাসে।'

'বাসুক। তুই জলে হাত দিবি না। হাত তোল। কাল সকালে চরণ তুলে নিয়ে যাবে। একদণ্ড চুপ করে বসে থাকতে পারছিস না। জানপাড় এসে গেছি। পুকুরে নৌকা ঢুকবে।

'পাটাতনে একটু নাচি ছোটকা।'

'এটা নাচার সময়?'

'মাথার ওপর কী সুন্দর তারাদের দেশ। ধান খেতে কোড়াপাখি কুব কুব করে ডাকছে, গাঙে গয়না নৌকোয় গ্রামাফোনে গান, লণ্ঠন দুলছে, দূরে হাজাকের বাতি, ঢাক বাজছে, সরকার বাড়ি দুগগাঠাকুরের চক্ষুদান হচ্ছে আর দেখো না ছোটকা, কত গাছপালার ছায়া পর্যন্ত অধীর হয়ে উঠছে, উঠছে না? পাতা নড়ছে না? আমি যদি নাচি ক্ষতি কী!'

'এবারে জানপাড়ে জল কম। নৌকা ধাক্কা খাবে। ঠিক হয়ে বোস। পাটাতন চেপে বোস। ছিটকে পড়ে যাস না।'

'আমি তো ঠিক হয়েই বসে আছি। যত জোরে খুশি লগিতে ভর দাও। আমার কিছু হবে না।'

আর ভর দিতেই ছোটকা দেখল নৌকোর মাথা ওপরে উঠে নীচে পড়ে গেল। নৌকাও ঢুকে গেল পুকুরে আর কী যে দেখল! মেয়েটা ছিটকে পুকুরের গভীর জলে পড়ে গেল। পাড়ের গাছপালার আচ্ছন্ন জ্যোৎস্নায় সে দেখছে, একটা সাদা ফ্রক গভীর নীল জলে হারিয়ে যাচ্ছে।

ছোটকা সব ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। জলের নীচে অন্ধকার, চিৎকার করতেও পারছে না। সে পাগলের মতো খুঁজছে, আবার ভেসে উঠছে, আর হায় হায় করছে, 'আমি কী

করব!'

নৌকাটা হাওয়ায় ভেসে ঘাটে ভিড়তেই লোকজনের ছোটাছুটি, পুকুরপাড়ে ভিড়! বাড়ির সবাই হাজির। ঠাকুমা চ্যাঁচাচ্ছে, 'এই জলু, উঠে আয়। তুই জলে ডুবে কী খুঁজছিস?'

ছোটকা বলল, 'মা আমাদের সর্বনাশ।

সবাই দেখল, জলুর মাথায় মুখে শ্যাওলা ভরতি এবং জলজ ঘাসে শরীর ঢাকা।

কোন এক ফাঁকে টিংকু হাজির, 'ছোটকা তুমি আমায় খুঁজছ?'

জলু টিংকুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুই মা কত রূপে যে দেখা দিস। জলে পড়ে গেলি...।'

'আমি জলে পড়ব কেন? তুমিই তো জলে পড়ে গেলে। আমার কী দোষ। আমি তো নৌকোর পাটাতনে চেপে বসেই ছিলাম। আবছা অন্ধকারে কী দেখতে কী দেখেছ। লগিতে ভর দিয়ে টাল সামলাতে পারনি, পড়ে গেলে।'

ছোটকা টিংকুকে বুকে জড়িয়ে বলল, 'হবে হয়তো মাগো। তুই তো দেবী রূপে সংস্থিতা, তোর কত যে বিভূতি!'

ভূতুরা

আবার বুঝি লেগেছে। রুমি, ঝুমি-দু-জনে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে রাধামোহন খুবই ফাঁপরে পড়ে যান। তিনি দোতলায়। দৌড়ে নীচে নামতেও পারছেন না। বয়স হয়েছে। সিঁড়িতে পা হড়কে গিয়ে গেল বছর টানা এক মাস বিছানায়। তিনি জানেন, রুমি, ঝুমি খেপে গেলে তাদের আয়াটি আরও দিশেহারা হয়ে যায়।

যমজ হলে বোধ হয় এই হয়! এই ভাব, এই মারামারি। এর পুতুল ও ধরলেই হাত কামড়ে, চুল টেনে ধুন্ধুমার কাণ্ড!

ঝুমিটাই মার খায় বেশি। তবে পেছনে লাগার স্বভাব ঝুমিরই বেশি। 'রুমি পুঁটিমাছ, রুমির নাক খাচ্ছি,' মচমচ করে যেন নাক চিবোচ্ছে ঝুমি! আর যায় কোথায়! লেগে গেল। রুমিটা দিন দিন একগুঁয়ে জেদি হয়ে উঠছে। যত আক্রোশ ঝুমির ওপর। সে তার কিছুতে ঝুমিকে হাত দিতে দেবে না। একটা বড়ো গামলায় সব খেলনা-পুতুল, রেলগাড়ি, টিয়াপাখি, খরগোশ, ব্যাং-সবই জোড়ায় জোড়ায়। জেদ চেপে গেল রুমি, ঝুমিকে কিছুই ধরতে দেয় না। ধরলে আঁচড়েকামড়ে শেষ করে দেয়।

তিনি সিঁড়ির মুখে এসে ডাকলেন, 'এই আরতি, তুমি কোথায়!'

আরতির সাড়া নেই। ঘুমোতেও পারে।

ঠিক মেঝেতে ঘুমিয়ে আছে, আর খাটে দুটো মারামারি শুরু করেছে।

তিনি সিঁড়ি ধরে নামছেন-কী পড়ল, কীসের শব্দ! তিনি আর পারলেন না, 'কী হচ্ছে রুমি!'

ঝুমির আর্ত চিৎকার, 'দাদুমণি, ভুতুরা বলছে।'

'কে ভুতুরা বলছে তোমাকে?'

'আমি ভুতুরা, দাদুমণি?'

'না, কখনো না।'

নীচে নেমে দেখলেন, বিছানা লণ্ডভণ্ড।

আরতি নেই, বাথরুমে থাকতে পারে, অথবা কলতলায়। কলতলায় চান করলে এঘরের চ্যাঁচামেচি শোনা যায় না। রান্নার মেয়েটিই-বা কোথায়!

তাঁকে দেখেই ঝুমি এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গেসঙ্গে রুমিও। রুমির অভিযোগ, 'আমি পুঁটিমাছ দাদুমণি!'

'তোরা ঘুমোসনি। মারামারি করছিস!'

'আমি ভূতুরা দাদুমণি?' ঝুমির অভিযোগ।

'না, কখনোই নয়।'

এতে রুমি খেপে গেল, অভিমান, দাদুমণি তাকে ভালোবাসেন না। ঝুমিকে বুকে নিয়ে আদর করছেন, সহ্য হবে কেন? ঝুমি ভুতুরা নয় তবে কে ভূতুরা? দাদুমণি ভূতুরা। 'দাদুমণি, তুমি তুমি ভূতুরা।'

'ঠিক আছে, আমি ভূতুরা। এবার শুয়ে পড়ো। না, না তুমি ঝুমির বালিশ ধরে টানছ কেন? ঝুমি এখানে শোবে। ঝুমি কত ভালো, কথা শোনে। ঝুমি, চোখ বোজো। এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে। রুমিও খুব ভালো। রুমি অবাধ্য হয় না, পেট ভরে খায়, তাই না! রুমি পুঁটিমাছ হতেই পারে না!'

'আমি পেট ভরে খাই, না দাদুমণি!' রুমি দাদুমণির দিকে তাকিয়ে আছে।

ঝুমি বলল, 'আমিও পেট ভরে খাই, না দাদুমণি!'

'সবাই খাও, এখন আর কথা না। চোখ বোজো। দরজা-জানলায় পর্দা টেনে দিলাম। তোমরা দু-জনেই খুব ভালো। ঘুম থেকে উঠে আমরা পার্কে বেড়াতে যাব। খালধারের জঙ্গলটায় হরিণগুলো আছে, তারা কী বলছে জান, রুমি, ঝুমি দাদুমণির হাত ধরে বেড়াতে আসবে। কী মজা। হরিণগুলোকে ঘাস খেতে দেবে না। বাচ্চা হরিণটা কেমন লাফায়।'

রুমি বলল, 'আমাকে হরিণ দেবে দাদুমণি?'

'দেব।'

ঝুমিও উঠে বসল, 'আমাকে হরিণ দেবে দাদুমণি?'

'ওঠে না। উঠতে নেই। এখন সবাই ঘুমোয়। দুপুরে খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমোয়। না ঘুমোলে হরিণের দেখাই পাওয়া যাবে না।'

সঙ্গেসঙ্গে রুমি, ঝুমি দু-জনেই মুখে আঙুল দিয়ে শুয়ে পড়ল।

'এই তো, কত ভালো মেয়ে। কথা শোনে।'

তারপর ঘুমিয়ে পড়লে তিনি রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। আরতি খেতে বসেছে।

'ওরা ঘুমিয়েছে মেসোমশাই!'

'তোমাদের এত দেরি কেন বলো তো, চান করতে, খেতে। জেগে গেলে ঘরে একা থাকতে বাচ্চারা ভয় পায়, জান! এত করে বলি, চান-টান সকালেই সেরে নেবে।'

রাধামোহন জানেন, আয়াটি জবাব দেবে না। সকালে তার এত কাজ, কখন চান করে নেবে। কিছু না বললেও রাধামোহনবাবুর বুঝতে কষ্ট হয় না, চুপচাপ থেকে কী বলতে চায় আরতি।

সকালে ন-টার পর বাড়ি ফাঁকা। সবাই অফিস, নাহয় স্কুলে। বাড়িটায় তিনি আর তাঁর দুই যমজ নাতনি। আয়ার ওপর ভরসা রাখা যায় না, রাধামোহনবাবুর কান খাড়া থাকে। বাচ্ছাদের মা, বাবাও বোঝেন, তিনি তো আছেনই, নিশ্চিন্তে অফিসকাছারি করে রাত করে ফিরলেও অসুবিধে থাকে না।

দুই সাধের নাতনিকে নিয়ে তিনি ভালো আছেন কি মন্দ আছেন, বুঝতে পারেন না। তবে নাতনিদের বাহানার শেষ নেই। কিছুই মুখে দিতে চায় না। উঠতে-বসতে গল্প শোনা চাই। তিনি রাম-রাবণের গল্প বলেন, শূর্পনখার গল্প বলেন, দুষ্টু খেঁকশেয়ালের গল্প যখন বলেন, বড়ো বড়ো চোখে তারা শোনে। দু-পাশে দু-জন দাঁড়িয়ে যায়-যেন দুটো পুতুল, চোখ-মুখ অতি সজীব। তখন লাফায় না, দৌড়োয় না, দু-জন সত্যি খুব ভালো মেয়ে হয়ে যায়। আজগুবি যা কিছুই তিনি বলেন, রুমি, ঝুমি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে।

স্কন্ধকাটার গল্প বললে দু-জনই তাঁকে জড়িয়ে ধরে, 'তারপর দাদু?'

'তারপর সেই রাজপুত্র কী করে! বরফ পড়ছে।'

'বরফ কী দাদু?'

'বরফ-দেখাচ্ছি।' ফ্রিজ থেকে আইসক্রিমের ট্রে বের করে দেখান।

'আমাকে বরফ দেবে?'

'না, না, ঠান্ডা লাগবে। ঠান্ডা লাগলে সর্দি-জ্বর হয় জান-তারপর না, পাইন গাছগুলোর পাতা ঝরে যাচ্ছে। বাগানে রাজপুত্রের কত গোলাপ গাছ। চাই একটা গোলাপ ফুল। কিন্তু পাবে কোথায়! এত শীতে গোলাপ গাছ বলল, ফুল দেব কী করে? দেখছ না, কী ঠান্ডা!'

'গোলাপ ফুল কেন দাদুমণি?'

'রাজপুত্র যে রাজকন্যার সঙ্গে নাচবে। রাজকন্যাকে গোলাপ ফুল যে দিতে পারবে, তার সঙ্গেই নাচবে।'

'আমি নাচব দাদুমণি।'

'গোলাপ ফুল ফুটুক। নাও এবারে হাঁ করো। হাঁ করলে গোলাপ ফুল ফুটবে।'

আরতি দুধ, ভাত, কলা চটকে চামচে ধরে আছে। হাঁ করতেই চামচ মুখে ঢুকে গেল।

'তারপর না সেই গুপি গায়েন বাঘা বায়েন ঢোল বাজাতে লাগল।'

'আমাকে ঢোল দেবে দাদুমণি?'

'দেব।'

'আমি ঢোল বাজাব।'

'বাজাবে। আবার হাঁ করো। হাঁ না করলে ঢোল বাজবে কেন?'

আরতি আর এক চামচ মুখে দিলে বললেন, দেখি তো পেট দু-খানা তোমাদের কতটা ঢোল হল।' দু-জনই জামা তুলে পেট দেখালে বলেন, 'এবারে ঢোল বাজবে। আর দু-চামচ খেলেই বাজাবে।'

ঢোল বাজবে শুনেই দু-জনে যত দ্রুত পারল মুখের ভাত গিলে ফেলল। কারটা আগে বাজে! দু-বোনের রেষারেষি, কে আগে কতটা বেশি খাবে। কার আগে ঢোল বাজবে।

এই করে দুপুরের খাওয়া। আরতি দু-থালায় ভাত, ডাল, মাছ, শাক এবং দুধের বাটিতে দুধ নিয়ে খাওয়াতে বসলেই দু-জন দু-দিকে পালায়। একজন দরজার দিকে ছুটে গেল তো আরেকজন কলপাড়ে। ভাত খাওয়ানোটা রোজকার বিড়ম্বনা। তাই যত অসম্ভব আজগুবি গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলতে হয়। কখনো রাজপুত্র, কোটালপুত্র, কখনো অজগরের, হাতির গল্প, টিভি চালিয়েও খাওয়ানো হয়। বাঘ, হরিণ, ভোঁদড়, খেঁকশিয়াল কিছুই বাদ যায় না, গল্পের গোরু গাছে ওঠে। হাতির পাখা গজায়, 'ওই দেখো আকাশে একটা হাতি উড়ে যাচ্ছে।'

'কোথায়, কোথায়?'

'আগে হাঁ করো, তবে দেখাব।'

রাধামোহন আর পারেন না, আজগুবিরও শেষ আছে, তবে ইদানীং দুই বোনই বলছে, 'ওই গল্পটা বলো দাদুমণি।'

'কোন গল্প?'

'রাজপুত্র নাচবে।'

তিনি বুঝতে পারেন, রাজপুত্র নাচলে তারাও নাচবে।

গল্পটার মুশকিল, তাঁর সব ঠিকঠাক মনে নেই। বিদেশি গল্প কবে কোথায় পড়েছিলেন আবছামতো তার কিছুটা মনে আছে। বিশেষ করে একটি নাইটিংগেল পাখি সারারাত হিমের মধ্যে বুকে গোলাপ গাছের কাঁটা বিঁধিয়ে গান গেয়েছিল। রাজপুত্রের জন্য গোলাপ গাছে ফুল ফুটিয়েছিল। শীতের ঠান্ডায় গোলাপ গাছে ফুল না ফুটলে কী করা!

রজার বাগানে এত গোলাপ গাছ অথচ ফুল নেই গাছে। গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে। বরফে গাছপালা-নদী জমে গেছে, অথচ চাই একটি গোলাপ ফুল। রাজপুত্র ফুলটি না পেলে রাজকন্যার সঙ্গে নাচতে পারবে না। এই পর্যন্ত তিনি মনে করতে পারেন। রাজকন্যার চাই গোলাপ ফুল।

হঠাৎ কী হল, এক দুপুরে দুই বোনেরই বায়না, 'দাদুমণি, গোলাপ ফুল দেবে না। রাজপুত্র দেবে না?'

'ফুটুক। ফুল ফুটলে রাজপুত্রও চলে আসবে।'

'কবে ফুটবে!'

এই ফুটবে। তোমরা না খেলে ফুটবে না। খাও।'

রোজ রোজ এক কথা শুনবে কেন! কিছুতেই খাওয়ানো যাচ্ছে না। পালাচ্ছে, মুখে দিলে উগরে দিচ্ছে। শাসন করলে বাটি ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। আচ্ছা বিপদে পড়া গেল!

'গোলাপ গাছ কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?'

'আছে। খাও। খাওয়া হলেই গোলাপ গাছের কাছে নিয়ে যাব।' আসলে ঠিক ওদের অন্যমস্ক না করে দিতে পারলে রক্ষা নেই।

'আমরা ফুল দেখব।'

জানলার পাশে একটি করবী ফুলের গাছ। করবী ফুলের গাছটা দেখালেন, 'এই তো ফুল, খাও।'

'ওটা তো করবী ফুলের গাছ।'

বাড়ির গাছপালা তাদের চেনা হয়ে গেছে। পেয়ারা গাছ দেখিয়েও বলার উপায় নেই, ওটা গোলাপ গাছ। তারা সত্যিকারের গোলাপ গাছ না দেখতে পেলে কিছুতেই খাবে না। এখন তিনি কোথা থেকে যে গোলাপ গাছ দেখান! টবের গোলাপ কিনে আনলে হয়। তিনি আর পারছেন না। আরতিও দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে কাহিল। তাঁর আজগুবি কথাবার্তা নাতনিরা আর মোটেও গ্রাহ্য করছে না।

শেষে বললেন, 'চলো তো দেখি, গোলাপ গাছ খুঁজে পাওয়া যায় কি না!'

ওরা সঙ্গেসঙ্গে দাদুর পায়ে পায়ে সিঁড়িতে উঠে এল। ভাবলেন, ইস, বাজার থেকে একটা গোলাপ গাছ কিনে রেখে দিলে পারতেন! তিনি সিঁড়িতে উঠছেন, রুমি, ঝুমিও দাদুর হাত ধরে উঠছে। বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছে। একটু কিছু মুখে দেওয়া গেল না, অন্য কিছু দেখিয়ে তারপরই মনে হল দোতলায় তাদের কাঠের ঘোড়াটি পড়ে আছে। তিনি বললেন, 'আগে ঘোড়ায় চাপো। ঘোড়াটা আকাশে উড়লে গোলাপ গাছটা দেখা যেতে পারে।'

'না, না, ঘোড়াটা নড়ে না।'

'না, না, ঘোড়াটা ওড়ে না।'

'কোথায় পাই তবে বলো! তোমরা খেয়ে নাও, তারপর নাহয় সবাই মিলে গাছটা খুঁজব।'

'ফুল কোথায়?'

'গাছ কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?'

কী করেন রাধামোহন! বৃষ্টি নেই, বাদলা নেই, বাড়িতে একটা টবও নেই, টবে গাছও কেউ লাগায় না, কিন্তু চাই একটা গোলাপ ফুল। একটা গোলাপ ফুল। একটা গোলাপ গাছ। তিনি এখন পান কোথায়!

ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি গাছের মোহ কাটানো যায়! তিনি দোতলার একটা জানলা খুলে দিলেন, দু-নাতনিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন জানলায়। তারা গ্রিল ধরে ঝুলছে। গ্রিল বেয়ে ওপরে উঠছে। গাছের কথা ভুলে গেলে তিনি রক্ষা পান। তিনি বললেন, 'ওই যে স্কুলবাড়িটা দেখছ, সেখানে কিন্তু ভুতুরা থাকে। না খেলে ভুতুরা রাগ করবে।'

এরা ভুতুরা, স্কন্ধকাটা, রাক্ষস-খোক্কসের নামে জড়সড় হয়ে থাকে। ভুতুরার ভয় দেখিয়ে যদি খাওয়াতে পারেন! হাতে থালা নিয়ে আরতি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছ। সেদ্ধ ডিম, মাখন-ভাতে চটকে গোল্লা তৈরি করে রেখে। হ্যাঁ করলেই মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

দু-জনেই মুখ ফিরিয়ে নিল। খেল না।

আবার সেই এক কথা।

'গাছ কোথায়? ফুল কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?'

নাও, এবার বোঝো ঠ্যালা। ভবি ভুলছে না। রেগেমেগে রাধামোহন বললেন, 'যাও, ভাত খেতে হবে না। কতক্ষণ তোরা না খেয়ে থাকতে পারিস দেখি!'

দু-জনেই অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে ফেলল। গ্রিল বেয়ে নীচে নেমে দু-জনই ঘরের দু-কোনায় মাথা নীচু করে বসে রইল। টসটস করে চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

'গাছ কোথায়? ফুল কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?'

'কাল নিয়ে আসব। বাজার থেকে নিয়ে আসব। লক্ষ্মী মেয়ে, খাও। তোমাদের মা এসে কষ্ট পাবে না, দুপুরে কিছু খাওনি শুনলে খারাপ ভাববে। জেঠু তোমাদের জন্য কত কিছু নিয়ে আসে। বড়োমা তোমাদের কী ভালোবাসে! রাইদিদি স্কুল থেকে ফিরে তোমরা খাওনি শুনলে মুখ ব্যাজার করে ফেলবে। খাও লক্ষ্মীটি।'

'গাছ কোথায়! ফুল কোথায়! রাজপুত্র কোথায়!'

'গাছ আমার পেটের ভেতর। শয়তান হচ্ছে দিন-দিন! এ কী রে বাবা, কিছুতেই গোঁ ছাড়বে না। এবারে কিন্তু মারব।' এতে রুমি, ঝুমি আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দাদুমণি বকেছেন, দাদুমণি তো সবসময় আদর করেন, দাদুমণিকে তারা রাগতেই দেখেনি। জোরে ধমক দিলে তারা না কেঁদে পারে! দু-বোনই জড়াজড়ি করে কাঁদতে বসে গেল। আর তখনই তিনি দেখলেন, দোতলায় খোলা বারান্দায় একটা ফুলের গাছ।

কারুকাজ করা সুন্দর টবে একটি গোলাপ ফুলের গাছ। অবাক বিস্ময়ে গাছটি দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই তো গোলাপ গাছ! শিগগির আয় রুমি, ঝুমি।' দরজা খুলে বারান্দায় ছুটে গেলেন। রুমি, ঝুমিও দাদুর পায়ে পায়ে দৌড়ে গেল। কাছে যেতেই দেখতে পেলেন, টবটির গায়ে চিত্রবিচিত্র কিছু ছবি, টবটি পেতলের হতে পারে, তামারও হতে পারে, মিনাকরা প্রাচীন ধাতুর সিলমোহর, ফারাওয়ের মুখ, পিরামিডের ছবি এবং কোনো নদীর অববাহিকা টবের গায়ে আঁকা। চটাওঠা, প্রাচীন মুদ্রার মতো বর্ণহীন টবটা এখানে কে রাখল? কে নিয়ে এল? গাছটা খুবই নির্জীব, পাতা নেই বিশেষ, যেন বরফের দেশ থেকে কেউ তুলে এনে রেখে দিয়েছে। শীতে পাতা ঝরে গেছে। দুটো-একটা যাও-বা আছে তার রং হলুদ। গাছের কাঁটায় যেন শ্যাওলা জমে আছে। গাছটা দেখতে দেখতে তিনি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই তো সেই গাছ!'

ততক্ষণে রুমি, ঝুমিরও কৌতূহল বেড়ে গেল।

'এটা কী দাদুমণি?'

'এটা গোলাপ গাছ।'

'এটা কী?'

'এটা পাতা।'

রুমি, ঝুমির স্বভাবই এরকম। নতুন কিছু দেখলেই এটা কী, এটা কী করা।

'এটা কী?'

'এটা টব। ফুলের টব।'

'এটা কী?'

'এটা মাটি। এটা কাঁটা, এটা গাছ। গোলাপ গাছ।'

'পাতায় হাত দিয়ে ঝুমি বলল, 'ফুল কোথায়?' রাজপুত্র কোথায়!'

রুমি, ঝুমি গাছটার কাছ থেকে নড়তে চাইছে না। লাফাচ্ছে আর গাছটাকে দেখছে। রাধামোহন ভাবলেন, গাছটা এখানে কে নিয়ে এল! ভৌতিক কাণ্ড নয় তো! টবটাও বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। তিনিই-বা চেঁচিয়ে উঠলেন কেন, এই তো সেই গাছ! বড়োই ধন্ধে পড়ে গেলেন রাধামোহন।

'ফুল কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?

তখনই মনে হল, আরতি ওদের খাবারের থালা হাতে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। জোর করেও খাওয়ানো যায় না। নিজে না খেলে কে খাওয়াতে পারে! দুধ অবশ্য জোর করেই খাওয়ানো হয়। তবে ইদানীং জোর করতে গেলেই রুমি, ঝুমি চ্যাঁচাবে, 'নিজে নিজে খাব।'

'তবে খাও।' দুধের গ্লাস হাতে তুলে নিলে খায়, একটু খায়, আবার রেখে দেয়, পালায়, ছোটাছুটি, নিজে নিজে খাব, খায় ঠিক, বড়ো সময় নেয়। কিন্তু দুপুরের ভাত তো আর গেলানো যায় না। না খেতে চাইলে কী

করা।

ঝুমি, রুমি চঞ্চল হয়ে পড়ছে। ঝুঁকে গাছটা দেখছে। টবের চারপাশে গোল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিছু।

'ফুল কোথায়?'

'ফুটবে। তোমরা খাও, খেলেই ফুল ফুটবে।'

দৌড়ে আরতির কাছে চলে গেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এক গ্রাস মুখে নিয়ে ছুটে এসে বলল, 'ফুল কোথায়?'

'সবটা শেষ করো, না হলে ফুল ফুটবে না।'

রুমি, ঝুমি দৌড়ে গেল আরতির কাছে। গবগব করে খেল। জল খেল, আবার দৌড়ে এল, 'ফুল কোথায়! আমরা খেয়েছি দাদুমণি।'

'গাছটাকে বলো, তোমরা খেয়েছ।'

'আমরা খেয়েছি।' গাছটার কাছে মুখ নিয়ে দু-বোনই চেঁচিয়ে কথাটা বলল।

তারপর রাধামোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফুটছে কই! ফুল কোথায়! রাজপুত্র কোথায়?'

'আরও জোরে বলতে হবে। রোজ রোজ বলতে হবে। গাছটা ঘুমিয়ে আছে। রোজ দুপুরে পেট ভরে খাবে, খাবার পর মুখ ধোবে, তারপর গাছটার কাছে এসে বলবে, আমরা খেয়েছি, মুখ ধুয়েছি। আমরা ঘুমোব এবার। ফুল দাও। তোমার সব কথা শুনি, তুমি একটা ফুল দিতে পার না!'

ঠিক রাধামোহনের মতোই গাছটাকে তারা সব বলল, পাতা ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়ল না। যদি গাছটা সত্যি রাগ করে! তারা তো কিছুই চায় না, রাজকন্যার মতোই একটা শুধু গোলাপ ফুল চায়-রাজপুত্র চায়।

তাদের এককথা গাছটার সঙ্গে 'আমরা পেট ভরে খাই, তুমি একটা ফুল দিতে পার না!'

একদিন ঝুমিই চেঁচিয়ে ডাকল, 'দাদুমণি, এসো না দেখবে।' তিনি কাছে গেলে বলল, 'এটা কী?'

একটা নরম ছোট্ট পালক গাছটার ডালে জড়িয়ে আছে। নরম উষ্ণতায় ভরা। কোনো নাইটিংগেল পাখির পালক নয় তো! টুনটুনি কিংবা চড়াইয়ের পালক যে এটা নয়, রাধামোহন সবিশেষ এটা জানেন।

'এটা কী?' আবার প্রশ্ন ঝুমির।

তিনি কিছুটা ঘোরে পড়ে যাচ্ছিলেন, তবে কি মৃত নাইটিংগেল পাখিটাই মিশরের কোনো প্রান্ত থেকে উড়ে আসছে, অথবা সাইবেরিয়ার তুষারভূমি পার হয়ে এখানে এসে আবিষ্কার করেছে, এই তো সেই ফুলগাছটা, কে রেখে গেল এখানটায়!

'এটা কী!'

ঘোরের মধ্যেই যেন তিনি বললেন, 'নাইটিংগেলের পালক।'

'আমি নেব।'

'না, নিতে নেই। গাছে আছে, গাছেই থাকুক।'

কী জানি, পালকটা যদি সত্যি নাইটিংগেল পাখির হয়, আর ওটা ধরলে যদি রুমি, ঝুমির অকল্যাণ হয়, এসব ভেবেই যেন বলা।

'না, নেবে না। ভূতুরা আছে, পালকটা ধরবে না।'

দু-জনেই দাদুমণিকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ভুতুরা দাদুমণি?'

আসলে এক রাতে ঠিক এমনই তাঁকে দু-বোনই ভূতুরা-ভূতুরা বলতে বলতে, তাঁর কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর বসার ঘরে সোফায় বসে সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস পড়ছিলেন, খুবই মগ্ন ছিলেন পড়ায়, হঠাৎ দু-বোনের ভূতুরা, ভূতুরা আসছে চিৎকার শুনে কিছুটা বিপাকে পড়ে তাদের বাবাকে ডেকেছিলেন, 'ভূতুরা কী! ওরা এত ভয়ে কাবু!'

ছোটো পুত্র উঁকি দিয়ে বলেছিল, 'ভূতুরা জানেন না, ভূতেরা সব ওদের কাছে ভুতুরা হয়ে গেছে।'

'কেন যে আজেবাজে ভয় দেখাও তোমরা, বুঝি না! কচি মন, সহজেই ভয় পেতে পারে।' দু-বোনকে জড়িয়ে বুকে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, 'ভূতুরা আমার বন্ধু জান! কিচ্ছু করে না। তোমরা বলবে, দাদুমণি বলেছে, ভূতুরাকে ভয় না পেতে। দাদুমণির বন্ধুকে কেউ ভয় পায়! যা চাইবে, তাই এনে দেবে।'

এত বলেও তাদের ভূতুরার ভয় তিনি নিরসন করতে পারেননি। এখন নিজেই এক ভূতুড়ে কাণ্ড ভেবে গাছটার খুব কাছে রুমি, ঝুমিকে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। কারণ, কেউ স্বীকারই করেনি, তারা কেউ ফুলের টব এনে এখানটায় রেখেছে। 'কার দায় পড়েছে, তুমি নিজেই কখন নিয়ে এসেছ, মনে করতে পারছ না।' তিনি আর কী বলেন, বড়ো পুত্র আর-এক কাঠি ওপরে, টবটি দেখে তার মন্তব্য, 'দেখে তো মনে হয় ফারাওদের সমাধি থেকে তুলে আনা হয়েছে।'

হয়ে গেল! অথচ আশ্চর্য, রুমি, ঝুমি বিশ্বাস করে বসে আছে, তারা পেট ভরে খেলে গাছটাতে একদিন ঠিক একটি গোলাপ ফুটবেই। রাজপুত্র গাছের পাশে তাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবেই। এখন আর খাওয়া নিয়ে ছোটাছুটি করতে হয় না, ঘুমোনো নিয়ে বকাঝকা করতে হয় না। সময়মতো তারা খায়, না হলে গাছটা রাগ করতে পারে, সময়মতো তারা ঘুমোয়, রাজপুত্র যদি শেষে না আসে! এত কিছুর মধ্যেই একদিন শীতের জ্যোৎস্না রাতে, গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। রুমি, ঝুমি, কখন পায়ের কাছে এসে জুটেছে। জুটতেই পারে, নীচের ঘরে টিভি চলছে, টিভিতে অজস্র আজগুবি সব সিরিয়াল, বুঁদ হয়ে সিরিয়াল দেখার সময় শিশুদের দৌরাত্ম্য কে সহ্য করে? এটা টানছে, ওটা ভাঙছে, নীচের ঘরগুলিতে দাপাদাপি করে বেড়ালে নিশ্চিন্তে সিরিয়াল দেখাও যায় না, তখন একটা দুষ্টুবুদ্ধিই মাথায় খেলে যায় সকলের, 'যাও তো ওপরে, দাদুমণি কী করছে দেখে এসো তো।' আর কথা নেই, 'দাদুমণি, দাদুমণি তুমি কী করছ,' তাঁর শোওয়ার ঘর থেকেই রুমি, ঝুমির গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। তিনি গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তারা জানে না। তিনি যে উবু হয়ে জ্যোৎস্নায় এবং বারান্দার আলো জ্বেলে অবাক চোখে গাছটাকে শুধু দেখছেন, রুমি, ঝুমি জানবে কী করে। তারা এসে কী করে। তারা এসে অবাক, দাদুমণি গাছটার পাশে চুপচাপ বসে আছেন।

'দাদুমণি, ও দাদুমণি, ফুল ফুটবে?'

'মনে হয় ফুটবে।'

তিনি একটা কুঁড়ি দেখিয়ে বললেন, 'এটা কী!'

'এটা কী?' ঝুমিরও প্রশ্ন।

'এটা ফুলের কুঁড়ি।'

'ফুলের কুঁড়ি, দাও না!'

'না, ফটুতে দাও। পাখিটা উড়ছে।'

'কোথায় পাখি?'

'দেখছ না, আরও সব পালক পড়ে আছে। রেশমের মতো নরম পালক। পাখিটা ঠিক রোজ রাতে উড়ে আসে। গাছটার ওপর পাক খায়। ঠিক একদিন গাছের ডালে বসে যাবে, বুকে গাছের কাঁটা বিঁধিয়ে দেবে, সারারাত ধরে গান গাইবে। উষ্ণতার খুব দরকার দিদিভাই। উষ্ণতার খুব দরকার। না হলে ফুল ফোটে না।'

ঘোরের ভেতর কথা বললে যা হয়, রুমি, ঝুমি কেমন অবাক হয়ে দেখছে দাদুমণিকে। এ দাদুমণিকে তারা চিনতে পারছে না।

আর সকালেই রুমি, ঝুমি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে, ডাকছে, 'দাদুমণি, শিগগির ঘুম থেকে ওঠো। গাছটায় ফুল ফুটেছে।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়লেন রাধামোহন। তাঁর ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় ছুটে গেলেন, আশ্চর্য! গাছটা সবুজ পাতার সমারোহে আজ উদ্ভাসিত। গাছটায় একটামাত্র তাজা লাল গোলাপ। তিনি নতজানু হয়ে গাছটার পাশে বসলেন।

তারপরই ঝুমি সহসা কেমন ভয় পেয়ে সরে দাঁড়াল।

'এটা কী?'

তিনি গাছের ভেতর ঝুঁকে দেখলেন, মাকড়সার জালে একটা মৃত পাখি। গাছের কাঁটায় আর মাকড়সার জালে জড়িয়ে আছে। চড়াইপাখির মতো বড়ো নয়, টুনটুনিপাখির মতো তত ছোটোও নয়, বুকে তার নরম পালক।

'এটা কী দাদুমণি?'

'এটা নাইটিংগেল পাখি।'

'ওটা আমি নেব।'

'না, ওটা মরে গেছে।'

'মরে গেছে কেন? আমি মরে যাব।'

এর কী জবাব দেবেন তিনি! এতদিন হাজার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন উদ্ভট সব কথা বলে, তাদের কৌতূহল নিরসন করেছেন, কিন্তু আজ কেন জানি তাঁর কোনো কথা মুখে জোগাল না। তিনি শুধু বললেন, 'চলো পাখিটাকে মাটিচাপা দিই। ওটা মরে পড়ে থাকলে পচা গন্ধ উঠবে।'

ঝুমির এককথা, 'মাটিচাপা কেন দাদুমণি?'

'এসো, দেখতে পাবে।'

নীচে খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। রুমি, ঝুমি সাড়া দিচ্ছে না। তারা দেখল, দাদুমণি পাখিটার ডানা ধরে নীচে নামছেন, দাদুমণি হাতে কী নিলেন, 'এটা কী দাদুমণি?' রুমির প্রশ্ন।

নিজেই ফের বলল, 'এটা খুরপি, না দাদুমণি?'

রাধামোহন বললেন, 'তোমরা বড়ো হয়ে গেছ, আমার সঙ্গে এসো।' কলপাড়ে কামিনীগাছের নীচে ছোট্ট গর্ত করে পাখিটাকে শুইয়ে দিলেন। তারপর মাটিচাপা দিয়ে দেখতে পেলেন, রুমি, ঝুমি কেউ তাঁর পাশে নেই। তিনি উঠতে যাবেন, রুমি, ঝুমি ফের হাজির। হাতে তাদের সেই আশ্চর্য গোলাপ।

'গাছ থেকে ফুল তুলতে নেই। ফুল ছিঁড়লে কেন?'

'আমরা ছিঁড়িনি দাদুমণি, রাজপুত্র দিল।'

'রাজপুত্র! কোথায় রাজপুত্র? কী বলছিস!'

'বা রে! গাছটার পাশে। কী সুন্দর দেখতে। হাতে দিয়ে বলল, নাও।'

'যে-ই দিক, গাছ থেকে ফুল ছেঁড়া উচিত হয়নি। গাছটার কষ্ট হয় না! চলো, আমরা গাছটার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই।'

শিশুরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। রাজপুত্র, কোটালপুত্র, কত কিছু তাদের চাই। হাতি, ঘোড়া, এরোপ্লেন চাই, তবে ভূতুরা একজন না থাকলে এসবের বুঝি কোনো গুরুত্ব থাকে না। রাজপুত্র ফুলটা তাদের দিতেই পারে।

'চলো তো, কোথায় গাছের পাশে রাজপুত্র দাঁড়িয়ে আছে দেখি।' বলে রাধামোহনবাবু সিঁড়ি ভেঙে দোতালায় উঠে এলেন। রুমি, ঝুমিও দাদুর পেছন পেছন উঠে এল।

কোথায় রাজপুত্র! গাছটা কোথায়! টব, গাছ, পাতা, কাণ্ড, সব হাওয়া! রাধামোহন গাছটা না দেখে একেবারে হতভম্ব।

রুমি বল, 'এখানে ছিল রাজপুত্র।'

ঝুমিও বলল, 'এখানে ছিল।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে! মিছে কথা বলছ।'

'না দাদুমণি, মিছে কথা না! সত্যিই ছিল।' তারপর দু-জনেই দাদুমণির ধমক খেয়ে ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল।

রাধামোহন ফাঁপরে পড়ে গেলেন। রাজপুত্র নাও থাকতে পারে। কিন্তু গোলাপ গাছ কোথায়! তার তো তিনি দিনরাত পরিচর্যা করছেন!

রুমি বলল, 'গোলাপ গাছ কোথায়?'

রাধামোহনের মাথা গরম হয়ে গেল। রুমি, ঝুমিকে নিয়ে সারা বাড়িতে গাছটা খুঁজলেন। কোথাও নেই! কোথাও খুঁজে পেলেন না। কেউ বললও না এবাড়িতে কখনো একটা গোলাপ গাছ ছিল। তিনি রোজ গাছে জল দিতেন, রুমি, ঝুমি জল দিত গাছের গোড়ায়, কেউ বিশ্বাসই করল না।

তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়ে সিঁড়ি ধরে নীচে নামলেন-কলতলায় কামিনীগাছের নীচেও কিছু দেখতে পেলেন না। তাজা গোলাপটা কোথায়! খোঁড়াখুড়ি কোথায় করলেন, কোথায় মাটির নীচে পাখিটাকে রেখেছেন, কিছুরই কোনো চিহ্ন নেই। শুধু দেখলেন, একজোড়া ভুঁইচাপা ফুটে আছে এক কোনায়!

রুমি, ঝুমি বলল, 'দাদুমণি, ফুল।'

তিনি শুধু বললেন, 'চলে এসো। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে নেই।'

পূজার আনন্দ

কে আগে যায়, কে আগে দৌড়োয়, কে আগে মাকে গিয়ে বলতে পারবে-এই এক প্রতিযোগিতায় তার দু-জনই ছুটছে। আচার্যপাড়া থেকে পালপাড়া, বেশি দূর না। বেশি দূর না, কিন্তু ছুটে না গেলে এত বড়ো খবর যে আগে দেবে তারই বাহবা পাবার কথা। দু-ভাই ছুটছে। পিঠাপিঠি দু-ভাই। ইশকুলে নিরু বলেছিল, বাবা তার শহর থেকে নতুন প্যান্ট-জামা কিনে এনেছে। পূজার জামা-প্যান্ট। ইশকুলের চালাঘরটা পার হয়ে মাঠ, ঝোপজঙ্গল। নিরু বলেছিল, 'আমার বাবা পূজার জামা প্যান্ট এনেছে। মার জন্য শাড়ি। দিদির ফ্রক।'

পূজার বাজনা এবারে বাজবে।

শরতের ছবি মাঠের কাশ ফুলে, শিউলিতলায়, আকাশের অবারিত মহিমায়।

চারপাশে কেমন এক নেশার মতো ঘ্রাণ, ঘাসে কুয়াশা সকাল বেলায়। ইশকুলের দিদিমণিরা শাড়ি নিয়ে আসছে স্কুলে। পূজার বাজার শুরু হয়ে গেছে। আচার্যপাড়ায় প্রতিমার রং হচ্ছে। দু-ভাই প্রতিমা দেখে আর গালে হাত দিয়ে বসে থাকে।

দুই ভাইয়ের ছেঁড়া জামা-প্যান্ট। বড়োটির প্যান্টের পেছনে তালি মারা। দড়ি নেই প্যান্টে। গুঁজে পরেছে। জোরে দৌড়োতে গেলে খুলে যায়। তারপর ধপাস করে মাটিতে আছাড় খায়। ছোটো এগিয়ে গেছে। ইস, কী যে হবে! সে আবার দৌড়োয়।

এই আনন্দ কী গভীর, বোঝা যায় মার কাছে যখন আবদার,-মা জান, নিরুকে কী চকচকে পূজায় প্যান্ট কিনে দিয়েছে। জামাটা কী সুন্দর। মোজা দিয়েছে। কী সাদা, না দুধের মতো সাদা!

'মা, মামা আসবে না!'

'আসবে বাবা।'

'কবে আসবে!'

বিশাখা চুপচাপ থাকে। স্বামীর মৃত্যুর পর দাদা সামান্য টাকা দেয়। কোনোরকমে তিনটে পেট চলে যায়। মানুষটা মিলে কাজ করত। ক-দিনের জ্বরে চলে গেল। সেই থেকে বিশাখা পূজা এলেই মনমরা হয়ে যায়। পুজার দিন বলে কথা! দাদা পূজার আগে গেলবার এসেছিল। ভাগনেদের পূজার জামা-প্যান্ট দিয়ে গেছে। এবারে কী হবে জানে না। এই একটা ভয় বিশাখার।

কোনোদিন মুখ ফুটে বলবে না, 'মা আমাদের পূজার জামা-প্যান্ট হবে না?' শুধু বলবে, 'মা, মামা কবে আসবে,' মামা এলেই তারা জামা-প্যান্ট পাবে কী করে যে বুঝে ফেলেছে!

দুই ভাই দৌড়োয়। লাফায়। পূজার ঢাক বাজতে থাকলে, দুই ভাই বাড়িঘরে আর বসে থাকতে পারে না। কোনো কোনোদিন মাঠ পার হয়ে বড়ো সড়কে চলে যায়। বড়ো সড়ক ধরে গেলে ইস্টিশন। মামা এলে সকালের গাড়িতে আসে। সকালে না এলে বিকেলের গাড়িতে আসে। এখন দু-জনের একটাই কাজ, কার বাড়ি কে এল দেখা, কে কী পেল দেখা। আর ছুটে এসে মাকে খবর দেওয়া। আবার সময় পেলেই, সড়কে উঠে যাওয়া। মামা যদি রিকশায় আসে। কেমন ধুকপুক করে বুকটা। কিন্তু মামা আসে না। মনমরা তারা। তবু আশা মামা ঠিক আসবে। মামা না এসে পারে না।

'এই সানথু, তোর মামা এল?'

'আসবে আসবে।'

'কবে আসবে?'

'ঠিক আসবে। আমার জন্য মামা মিলিটারি পোশাক আনবে বলেছে জান। কাঁধে সবুজ ডোর থাকবে জান! হুইসিল থাকবে। আমি বাজাব। ফুরুৎ ফুরুৎ।'

মুখে সানথু সেই আওয়াজ করতে করতে ছোটে।

বিশাখা ডাকে, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

কোথায় যেতে ইচ্ছে হয় তারাও জানে না। কালীতলায় বাঁশ পোতা হচ্ছে। ঠাকুরের মণ্ডপ তৈরি হবে। দু-ভাইয়ের এখন অনেক কাজ। জীবনদার ফুটফরমাস খাটা।

'ধর শাবল।'

সানথু হাতল ধরে রাখে।

'এই নানথু কী করছিস রে? এদিকে আয়। দড়িটা ধর। বাঁশটা আলগা কেন? টেনে ধর।'

দুই ভাই মণ্ডপে সকালে যায়। বিকেলে যায়।

সানথু এসে খবর দেয়, 'এই যাবি?'

'কোথায়রে দাদা?'

'মিনার দিদি এসেছে।'

'মিনার দিদি, পরানের মাসি, হাবুলের কাকা সবাই চলে আসছে। শহর থেকে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে ফিরছে। পূজার ছুটি। তাদেরও স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। এখন পূজার ক-টা দিন কেবল ছোটাছুটি। একদণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। কে যেন বলে দেয়, 'ওরে সানথু আমার চক্ষুদান হবে, দেখবি না!'

সানথু ডাকে, 'মা।'

বিশাখা গোয়াল থেকে পাটকাঠি বের করে রোদে দিচ্ছে।

সানথু জল এনে দেয়।

নানথু গোবর এনে দেয়।

বিশাখা আর তার দুই ছেলে এই বাড়িটার শ্রী ফেরাবার চেষ্টা করছে। কী করে যে শ্রী ফিরবে সে জানে না। তবু একদণ্ড বিশাখার বসার সময় নেই। সে ধান কিনে রাখে, রোদে দেয়। চালকল থেকে ধান ভাঙিয়ে আনে। যতটা পারে সে টাকা বাঁচাবার চেষ্টা করে। পূজায় তার কিছু না হলেও মনে আর কোনো কষ্ট হয় না। কিন্তু অবোধ শিশুরা বুঝবে কেন।

তার জ্যাঠারা পাশাপাশি বাড়িতে থাকে। দুই অবোধ শিশু যখন এসে খবর দেয়, জান মা, বড়দির শাড়িতে না সোনার জলে দুগগা ঠাকুর আঁকা। জান মেজদার প্যান্টে একটা গোল চাকতি। ধর্মেন্দ্র শার্ট এনেছে বড়োজ্যেঠু মেজদার জন্য।

বিশাখা ধর্মেন্দ্র শার্ট ঠিক বুঝতে পারে না।

সানথুর মেন হয় মা-টা কিছু জানে না। কত রকমের শার্ট প্যান্ট, কী রঙের বাহার-পরলেই রাজা!

বিশাখা ঘরের ভিতর নীরবে সব শোনে। কোনো কথা বলে না। দাদা এলে ঠিক চলে আসত। দাদার মাসোহারা এলেও যে-করে হোক খাক না খাক, পূজার সময় বলে কথা, ওদের নিয়ে গিয়ে ফুটপাত থেকে নতুন প্যান্ট-শার্ট কিনে দিতে পারত। টাকাটাও আসেনি। কী যে হল! পিসি-জ্যাঠারা দেখেও দেখে না।

ধীরেনের মা যাচ্ছিল রাস্তা ধরে। বলল, 'বউমা বিনোদের বউয়ের শাড়ি দেখে এসো।'

বিশাখা বলল, 'যাব পিসিমা।'

পূজার সময় কোনো গ্লানি রাখতে নেই মনে। কারণ সকালে শিউলিতলায় ফুল ঝরে পড়ে থাকে। মনটা কেমন প্রসন্ন হয়ে যায়। মা-বাবা সবার কথা মনে পড়ে। তার বাবার অবস্থাও ভালো ছিল না। পূজার সময় ছোটোকাকা, মেজোকাকা, শাড়ি দিয়েছে। ছোটো থাকতে ফ্রক দিয়েছে। কী আনন্দ তখন। এখন যেন মানুষ আলগা হয়ে গেছে। সানথু ফাঁক পেলেই এর-ওর বাড়ি ছুটে যাচ্ছে। পূজার জামা প্যান্ট দেখে লাফাতে লাফাতে ফিরছে। ভেতরে যে ওরা দুঃখ বয়ে বেড়ায় মুখ দেখলে বোঝা যায় না। ওরা কি বুঝতে পারে নতুন জামা-প্যান্টের জন্য মার কাছে বায়না করলে, মা কষ্ট পাবে। ওরা মুখ ফুটে চায় না বলে আরও কষ্ট তার। সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কিছু একটা বন্ধক দিয়ে ক-টা টাকা যদি ধার করা যায়। নবর বাবা থালাবাসন বন্ধক রেখে টাকা দেয়। পঞ্চমীর সকালেও যখন দাদা এল না, না দাদা না তার মাসোহারা, তখন আর অগত্যা কী করা যায়।

সে আঁচলের নীচে বিয়ের একটা গ্লাস লুকিয়ে বের হয়ে পড়ল।

'মা, কোথায় যাচ্ছ?' সানথু এসে মার কোমর জড়িয়ে ধরেছে। বলতে পারে না, 'তোর বাবা যে গ্লাসটায় জল খেতে ভালোবাসত, সেটা বন্ধক রাখতে যাচ্ছি।' মানুষটার স্মৃতি তাকে যতটা কষ্ট দেয়, তার চেয়ে বেশি কষ্ট পায়, পূজার দিনে ছেলে দুটোর নতুন জামা-প্যান্ট হয়নি ভেবে। সে তাড়াতাড়ি প্রায় চুরি করে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে চাইল। বলল, 'কোথাও যাস না বাবা। আমি আসছি।'

'আমি যাব।'

'না।'

'না, আমি যাব। তোমার সঙ্গে যাব।'

ছোটোর জেদ প্রবল। সে যাবেই। মা কোথাও গেলে তার প্রবল কৌতূহল। আর কী যে হয়, মার সঙ্গে পাড়ায় বেড়াতে গেলেও আনন্দ। সবসময় সে তার মার গায়ে লেপটে থাকে। মার আশ্চর্য ঘ্রাণ। সে ঘ্রাণের মজাই আলাদা।

বিশাখা চায় না, সানথু নানথু কেউ জানুক বাবার গ্লাসটা বন্ধক দিতে যাচ্ছে মা। কাঁসার গ্লাসটা এত বড়ো যে, নানথু জল খেলে দু-হাতে তুলে খেতে হয়। বাবার গ্লাসে জল খেতে দু-জনেই ভালোবাসে। কে খাবে এই নিয়ে দুই ভাই ঝগড়াও করে। বিশাখা বলে দিয়েছে, দু-জনেই খাবে। খেতে বসলে দু-থালায় ভাত দু-জনের, এক গ্লাসে জল। দুটো আসন, দুটো থালা, দুই ভাই-কিন্তু গ্লাস একটা। খেতে বসে কে কতবার জল খেল তারও বাজি শুরু হয়ে যায়।

বিশাখার তখন এককথা, 'এ কীরে তোরা জলই খাবি, ভাত খাবি না!'

বিশাখা দরজায় শেকল তুলে বলল, 'না বাবা, লক্ষ্মী বাবা আমার। আমি এলাম বলে। বাড়িতেই থাকিস বাবা। তোদের জামা-প্যান্ট কিনে আনব।'

'মামা আসবে না?'

মামা আসবে না, বিশাখা বলতে পারল না। মামা না এলে পূজার দিনগুলি মাটি। মামা না এলে নতুন জামা প্যান্ট হবে না-তাই আর কী করে, বলল, 'আসবে না কেন, আসবে। তোদের মামা দিতে পারে, আমি দিতে পারি না।'

ইস কী মজা! সঙ্গেসঙ্গে দুই ভাই ছুট লাগায়। বাড়ি বাড়ি উঠে এক খবর, এবার মামা দেবে। মাও দেবে। জ্যাঠাদের বাড়ি খবর দিয়ে এল। বড়দি-মেজদিকে খবর দিয়ে এল। কেউ বাদ থাকল না। এমনকী কাকপক্ষীরাও খবর পেয়ে গেল সানথু, নানথুকে তার মা দেবে, মামা দেবে। কুকুর বেড়াল কাকপক্ষী সবাই ওদের বন্ধু। ওরা সবার সঙ্গে কথা বলে। গাছের সঙ্গেও!

বিশাখা তখন নবর বাবাকে বলল, 'আর কুড়িটা টাকা দিন। দাদার টাকা এলেই সুদ সমেত সব দিয়ে যাব।'

'না বউমা। হবে না। কাঁসার দাম পড়ে গেছে। ত্রিশ টাকার বেশি দিতে পারব না।'

'ত্রিশ টাকায় দু-জনের জামা প্যান্ট হয় কাকা?'

'না হলে কী করব মা। আমার তো টাকার গাছ নেই। একজনেরটা তোমাকে দিই, তোমারটা আর-একজনকে দিই। লেনদেনে দুটো পয়সা হয়।'

অনেক কাকুতিমিনতি করে বিশাখা আর দশটা টাকা বেশি নিল। সে জানে না গ্লাসটা আর ফেরত নিতে পারবে কি না। মহাজনের পেট খুব বড়ো হয়।

ক্রোশ খানেক হেঁটে গেলে শহর। দু-ভাই মার পেছনে আগে, লাফায় আর হাঁটে। মণ্ডপে দুগগা ঠাকুর দেখলে, হাত জোড় করে প্রণাম করে। বিশাখা দাঁড়িয়ে থাকে। ঠাকুর দেখে না-দেখে দুই ভাই আর সে ছাড়া সংসারে তার কেউ নেই। চল্লিশ টাকায় দুর্মূল্যের বাজারে কী হয় না হয় বিশাখা ভালোই জানে।

আর যা হয়, বিশাখা অবাক। সস্তা দামের প্যান্ট-জামা কিনতে গেলেও ষাট সত্তর টাকা লাগে। কী যে করবে। অবোধ দুই বালক শুধু দেখে, মা এক দোকান থেকে আর-এক দোকানে ছুটছে।

'ও টাকায় দু-জনের জামা-প্যান্ট হবে না দিদি।'

'আমার যে আর টাকা নেই ভাই।'

'মোহন সিনেমার কাছে যান ফুটপাতে পাবেন। দু-জনেরই হয়ে যাবে।'

সানথু, নানথু বোঝে তারা বড়ো গরিব। শহরের মানুষজন, রিকশা, গাড়ি, ঘরবাড়ি সবই বড়ো দূরের মনে হয়। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে গেছে। আর লাফাতেও পারছে না। মোহন সিনেমার সামনে ফুটপাত-হেঁকে বিক্রি হচ্ছে। 'দশ টাকা দশ টাকা। হাতে নিয়ে দেখুন।

বিশাখা হাতে নিয়ে দেখল। তারপর গন্ধ শুঁকল। নতুন কাপড়ের গন্ধ নেই। বর্ডার পার হয়ে পুরোনো জামা-প্যান্ট আসে। কেটে ছোটোদের মাপে প্যান্ট-শার্ট করা হয়েছে। সেকেন্ড হ্যান্ড। ওই দেখেই দু-ভাই লাফাচ্ছে। 'দাও না মা। খুব সুন্দর। আমি এ জামাটা নেব মা। আমি মা।' প্রায় দুই ভাই দোকানে হামলে পড়েছে।

বিশাখা প্যাকেট হাতে নিয়ে হাঁটা দিল। দুই ভাই দৌড়োচ্ছে। পূজার নতুন জামা প্যান্ট কী আনন্দ!

ঢাক বাজছে। ঢোল বাজছে।

মণ্ডপে দশভুজা।

বিশাখা প্রণাম করল না।

ঢাক বাজছে। ঢোল বাজছে। মণ্ডপে আলো জ্বলছে। মাইকে গান। আকাশে পঞ্চমী তিথির চাঁদ। নীল আকাশ। অজস্র নক্ষত্র।

দুই ভাই গাছকে বলল, 'জান, মা আমাদের নতুন জামা-প্যান্ট কিনে দিয়েছে। কী মজা! মামাও দেবে।'

পাখিকে বলল, 'কী মজা।'

প্রজাপতিকে বলল, 'কী মজা।'

গাছ, ফুল, পাখি, প্রজাপতি শুধু সাক্ষী থাকল দুই অবোধ শিশুর পুরোনো জামা প্যান্টে নতুনের আনন্দ খুঁজে পাবার। এদের চোখেও বোধ হয় জল ভরে আসবে এবার।

ওরা ছুটছে। বড়দি, জ্যাঠা, পিসিকে খবরটা দিতে হবে। এত বড়ো খবর গাছ, ফুল, প্রজাপতি, পাখিকে দিলে শুধু হবে কেন-সবাইকে দিতে হয়।

নিরাময়দার মাছ শিকার

নিরাময়দাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারছিলাম না। তাঁর এককথা, না, 'তোমাদের সঙ্গে নিয়ে মরি!'

ছোটোকর্তার মেজাজ খারাপ। সকাল থেকে শুরু হয়ে গেছে-'খবরদার নিরাময়, ওদের নিবি না। জ্বর-জ্বালা হলে কে দেখবে! জায়গাটাও ভালো না। রাতে-বিরেতে তেনারা দেখা দেন, কখন কার কপালে কী নিয়তি বলা যায় না। জলা দেশ-নদী উথাল-পাতাল, ঘূর্ণিতে পড়ে গেলে তো হয়েই গেল।' তারপর থেমে কী ভেবে ফের বললেন, 'তোর যে কী মতিভ্রম, বুঝি না, নিরাময়। ঋতুটাই বিশ্বাসঘাতক। খবরদার তুই ওদের সঙ্গে নিবি না।'

'আজ্ঞে না কর্তা, আমি কি পাগল, সঙ্গে নিয়ে শেষে ঢাকিসুদ্ধু বিসর্জন।'

হেমন্তের মাঝামাঝি সময়। শীত পড়ে গেছে। রাতে কুয়াশা হয়। তিনুডাঙার বিলে, দামোদরদির ঘাটে, নদীর জলে টান ধরেছে। সেই বিলে এখন ঝানু মাছ-শিকারিরা ঘুরে বেড়ায়। নদীর পাড়ে পঞ্চবটীর শ্মশান। বিল থেকে খাল নেমে গেছে মেঘনা নদীর বাদাড়ে। এই সময়টায় বর্ষার জলে টান ধরে। মাঠঘাট শস্য খেত থেকে জল নামে বিলে, বিল থেকে খালে। খালের দু-পাড়ে তখন জলোচ্ছ্বাস তৈরি হয়। ঝানু মাছশিকারিরা জানে খালের কোন জায়গায় মুলিবাঁশের বানা পুঁতে দিলে জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে বড়ো বড়ো ঢাইন বোয়াল আঁড় মাছ বানায় বাধা পেয়ে দীর্ঘ লাফ মেরে বানা অতিক্রম করে নদীর জলে টপকে যেতে পারে। হুঁশিয়ার শিকারিরা সুযোগ বুঝে মাছ টেঁটায় গেথে ফেলে।

যতদূর চোখ যায় ধানের জমি। ধানের শেকড় বাকড়। গলা সমান উঁচু জলে পাকা ধানের শিষ দোলে। ধান গাছের পোকামাকড় খেতে আলিসান সব মাছ বর্ষায় নদী থেকে উঠে আসে। নানা কিসিমের ছোটো-বড়ো মাছও ঘুরে বেড়ায় ধানের জমির অন্তহীন শেকড়ে-বাকড়ে। জল যত বাড়ে ধান গাছ যত বড়ো হয়, তত মাছেরাও পুলকিত হয়। ঘন বর্ষায় ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে মাছের পুলক দেখে কে? নদীনালা ধরে তারা তখন খালে-বিলে ছড়িয়ে পরে। শরৎ শেষে হেমন্তে জলে টান ধরলেই তেনাদের হুঁশ ফেরে-নদীর মাছ নদীতে নেমে যেতে চায়। ঝানু শিকারিরা সেই সুযোগেই বের হয়ে পড়ে। তখন গভীর রাত, কিংবা জ্যোৎস্না রাত, পুবালি হাওয়ার টান ধরে গেছে, উত্তরের হাওয়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে-মাছেরাও বোঝে সব।

ছোটোকর্তা রাজি না।

তা ছোটোকর্তারও দোষ দেওয়া যায় না। তার নাহয় তন্ত্রমন্ত্র ভরসা, এদের কী ভরসা! ছোটোকর্তা কিছুতেই রাজি না।-'বাড়ির পোলাপানের দোষ কী! আরে নিরাময়, তুই মাছ মারতে যাবি, একা চলে গেলেই হয়। ঠিক তুই তাতিয়েছিস!

'আজ্ঞে না কর্তা, ডাকেন উমারে, ডাকেন অচিন্তরে।'

'চুপ কর। আরে গত সালে মাছ শিকার করতে গিয়ে হরি বিশ্বাস কোথায় গায়েব হয়ে গেল! নদীর জলে ভেসে উঠল না, জলে ডুবলে না ভেসে উপায় আছে! আর অত বড়ো সাঁতারু, নদীর জলের সাধ্য কি তারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এত বড়ো দক্ষ মাছশিকারি যদি হাওয়া হয়ে যায়, আর বলি নিরাময় তোরই বা মাথায় মাছ ধরার ক্যাড়া কে ঢুকিয়ে দিল!'

একটু থেমে ছোটোকর্তা বললেন, 'কোন সাহসে তুই পোলাপানগুলাইরে সঙ্গে নিতে চাস বুঝি না। হরি বিশ্বাস কত বড়ো ওঝা। তারই ঘাড় মটকে দিল, তোরা তো সেদিন গুয়ে-মুতে বড়ো হলি!'

কিন্তু আমরা আড়ালে সকাল থেকে বায়না করছি, 'নিরাময়দা তুমি একা যাবে কেন, আমরা যাব। আমাদের বুঝি ইচ্ছে হয় না, মাছশিকারে যেতে! আমরা দুষ্টুমি করব না। যা বলবে, শুনব।'

নিরাময়দা কোচ, এক হলা বের করছেন, দক্ষিণের ঘর থেকে, বাঁশের বানার বান্ডিল বের করছেন, আমরা তার কাজে সাহায্য করছি। ঘাটে নৌকো বাধা আছে। কোষা নৌকোয় যাবেন কি হেঁটে চলে যাবেন বুঝতে পারছি না।

'ওই তো মুশকিল, হরি বিশ্বাস গায়েব হয়ে গেল-জানের মায়া নেই তোদের! হরি বিশ্বাস ভূতের পাল্লায় পড়তে পারে-বাদুরেও ঠুকরে সাবার করে দিতে পারে, তোদের না যাওয়াই ভালো।'

বড়দা বলল, 'একদম ভয় দেখাবে না। একা গিয়ে দেখোই না! গতবার যে বললে, তোদের শরীরে গুয়ে-মুতের গন্ধ লেগে আছে। আর একটু বড়ো হ, ঠিক নিয়ে যাব। বললে কেন বলো!' বড়দা খেপে আছে। তার এককথা-'আমাদের নিয়ে না গেলে, নিরাময়দাকেও যেতে দেব না। কী করে যায় দেখব!'

বড়দাকে নিরাময়দা সামলাতে পারে না। হেন আকাম-কুকাম নেই বড়দা করতে পারে না। 'যাবে যাও। দেখবে ফিরে কী হয়!'

কী আর হবে! বড়দা গোয়ালের গোরু-বাছুর ছেড়ে দেবে। তখন নিরাময়দার মাথায় হাত। লেজ তুলে গোরু-বাছুর ছুটবে। গোয়াল খালি। বাড়িঘর উঠোন পার হয়ে একেবারে মাঠে। কোন মাঠে কার খেতে মুখ দেবে-তারপর এই নিয়ে মারামারি-এক ধুন্ধুমার কাণ্ড, থানা আদালতও শেষ পর্যন্ত গড়াতে পারে।

'কে করেছে!'

কেউ জবাব দেবে না। নিরাময়দা ফাঁপড়ে পড়ে যায়। তাঁর জামা নেই, লুঙ্গি নেই। মাদুর হাপিস। তার ঘরে কে ঢুকল!

আমরা সবাই চুপ।

নিরাময়দা জানে, বড়দার কাজ। নিরাময়দা বারবার ঠকে শিখেছে।

বড়দা তখন কী ভালোমানুষ!

'তোমার ঘরে নিরাময়দা আমরা ঢুকিই না। তোমার গামছা-লুঙ্গি কোথায় আমরা তার কী জানি। তা ছাড়া কথা দিলে কেন, এ-সালে নিয়ে যাবে বললে, এখন এককথা ছোটোকর্তা রাজি না। 'কথা দিলে কথা রাখতে হয় জান?'

অগত্যা নিরাময়দার দরবার কাকার কাছে-'যেতে চাইছে যখন, আমি তো আছি।'

নিরাময়দারও দাপট আছে। বিশ্বাসী মানুষ। এছাড়া আমাদের দ্বিতীয় মনিব। নানা আকাম-কুকাম নিরাময়দা ঠিক ধরে ফেলেন। কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনেন বাড়িতে।

কাকা বললেন, 'বলছিস তুই।'

'তা ওদেরও ইচ্ছে হয়। ভয়ডর না ভাঙলে বড়ো হবে কী করে। খুবই ন্যায্য কথা।'

কাকা বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক।'

নিরাময়দা বললেন, 'ঠিক আছে, যাবে। হাত লাগাও।'

হাত লাগাও বলতে মাছ ধরার নানাবিধ সরঞ্জামের জোগাড়ে সাহায্য করতে বললেন।

'এই নাও বানা। পাট করে বেঁধে ফেলো।'

নিরাময়দার সহকারী সুধন্য এবারে যেতে পারছে না। ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। ঠিক ছিল সতীশ কর সঙ্গে যাবে। তারও যাওয়ার শখ অনেকদিনের। চন্দ্রকিরণ চাই-অর্থাৎ পূর্ণিমা না হলে জো হয় না। রূপালি মাছেরা চন্দ্রকিরণে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে-মাছ হাতেই ধরা যায়। সতীশ কর আসতেই নিরাময়দা বলেছিল, 'যাওয়া হবে না। আকাশ মেঘলা দেখছেন না! এবারে বোধ হয় জো পড়বে না। শিকারে গেলে মাছ যে পাওয়া যাবেই কথা নেই। ভাগ্য প্রসন্ন না থাকলে খালি হাতেও ফিরতে হতে পারে!'

তবে ওস্তাদ মাছশিকারিরা জানে, কবে কখন, যেমন নিরাময়দার কাছ থেকেই আমরা জেনেছি, অমাবস্যা পূর্ণিমার শনিবার মঙ্গলবারে চিংড়ি মাছের গায়ে জ্বর।

কথাটা যে বেঠিক না, জলা দেশে বড়ো না হয়ে উঠলে জানতে পারতাম না। জৈষ্ঠের বৃষ্টিতে নদীনালা ভরে যায়, জলে ভেসে যায় মাঠঘাট বনজঙ্গল। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো গ্রামগুলো বর্ষায় জেগে থাকে।

আষাঢ়ে বাড়ির ঘাটে জল, পুকুরপাড় ডুবে যায়। আম-জাম গাছের গোড়ায় জল, কচুর বনে জল। এবাড়ি-ওবাড়ি যেতে জল পার হতে হয়। আর ভাদ্রে জলে টান ধরে। জল খাল-বিল নদী ধরে নামতে থাকে। আর নিরাময়দার কেরামতিও শুরু তখন থেকে। এই তো সেদিন তিথি নক্ষত্র গুনে কী যে টের পেল-

'দে তো ডুলাখানা।'

'আমরা যাব।'

'কী করবি গিয়ে।' এক ধমক।

নিরাময়দা বাড়ি থেকে বের হলে আমরাও তার পেছনে। পরনে গামছা, খালি হাতে কাঠ খানেক গলদা চিংড়ি তুলতে যাচ্ছেন। কী করে যে বোঝেন, জলাঘাসের অন্তরালে ঘাপটি মেরে আছে তেনারা। পুকুরপাড়ের জলে-জঙ্গলে তিনি হেঁটে বেড়ান। খালের পাড়ে পাড়ে বকের মতো পা ফেলে হেঁটে বেড়ান। আমরাও বকের মতো পা ফেলে হাঁটি। একেবারে টুঁ শব্দ নেই মুখে। এত সকালে মানুষজও ওঠে না। রাত ভালো করে কাবার না হতেই-'দে তো ডুলখানা যাই।'

পিছন নিলেই নিরাময়দা হাতে ইশারায় চলে যেতে বলেন। শুনি না।

দেখি, খপ খপ করে জলে ডাঙায় বড়ো গলদা চিংড়ির মাথা চেপে ধরেছেন। নীল রং, কী বাহার তার! কী করে যে বোঝেন। জলাঘাসের মধ্যে জ্বরের ঘোরে বেহুস হয়ে আছে চিংড়ি, খপ করে ধরলেই হল।

আমরা পাড় ধরে ছুটে গেলে বিরাশি শিক্কার থাপড়। কাছেও যেতে পারি না, পায়ের শব্দে মাছ পালালে নিরাময়দার মাথা ঠিক থাকে না। 'দিলি তো তাড়িয়ে!'

অথচ অদম্য কৌতূহল।

'দেখি দেখি!'

'ওই যে জলে ডাঙায় ঘাসে তেনারা নড়াচড়া করছে।'

'ধরব।'

'ধরতে পারবি না। ফসকাবে।'

'নিরাময়দা তুমি তো মাছের রাজা।'

সঙ্গেসঙ্গে কী খুশি নিরাময়দা।

'তাই বল!'

বেজায় প্রসন্ন নিরাময়দা। কী করে কাকভোরে চিংড়ি মাছ শিকার করতে হয়, তার কৌশল বাতলাতে গিয়ে বললেন, 'আয়।'

আমরা হাঁটছি।
নিরাময়দা আগে আমরা পেছনে।
খালের পাড়ে পাড়ে হাঁটছি।
দূরে বিস্তীর্ণ ধান খেত। যতদূর চোখ যায় শুধু বিলের বিস্তার। কত মাছ তাজা বৃষ্টির জল পেয়ে যে উঠে আসে।
ঘাসে শিশির পড়েছে। আমাদের পা ভিজে যাচ্ছিল। নিরাময়দা এতটুকু অন্যমনস্ক নন, তার শ্যেনচক্ষু পাড়ের জলা ঘাসে।
'কী হল?'
'আরে চুপ কর। কথা বললে মাছ থাকে!' তারপরেই দূর থেকে হাত তুলে দিলেন, 'আয়।'
আমরা ছুটছি।
তিনি বললেন, 'আস্তে।'
আমরা সঙ্গেসঙ্গে সন্তর্পণে পা ফেলছি। কী যে আশ্চর্য অভিযান আমাদের কে বোঝে। কার্তিকের কাকভোরে জ্বরের ঘোরে তেনারা অস্থির। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চলাফেরা করছেন জলের জলজ ঘাসে।
নিরাময়দা বকের মতো পা ফেলে জলে নেমে গেলেন।
'ওই দেখ।'
'কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'
'কিছুই নজরে পড়ছে না?'
পড়ছে। বিবর্ণ পচা জল, ধান গাছ সব নেতিয়ে পড়েছে। আট-দশ হাত লম্বা ধানের গাছগুলো মাটির সঙ্গে শুয়ে আছে। পাকা ধানের গন্ধ। একেবারে যেন একখানা বিশাল দিগন্তবিস্তৃত নরম সোনালি বিস্তার। আর কুয়াশায় ভিজছে পাকা ধানের হাজার লক্ষ ছড়া। মা লক্ষ্মীর কৃপাধন্য এক জগত।
'কী দেখলি?'
'মা লক্ষ্মীকে দেখলাম।'
নিরাময়দা খেপে গেলেন, 'আমার মুণ্ডু। কাকপক্ষী কিছু উড়ছে না, জলের পোকারা নড়ছে না, এমন সময়ে মা লক্ষ্মীর কৃপা কোথায় খুঁজে পেলি!'
'পেয়েছি তো!'
'পেলি যখন, তবে ওই দেখ। মা লক্ষ্মীর কৃপাধন্য সোনালি বিস্তার দেখ। জলের নীচে মা লক্ষ্মীর চেয়ে তেনাদের কী মাছ বুঝলি না। যা বাড়ি যা!'
'বারে তোমার মাছ কোথায়!'
'আছে।'
'তবে দেখাও না।'
'জলে টান ধরেছে। জলে পচা গন্ধ। জলজ ঘাস পচছে, মাছেরা পালাচ্ছে-ওই দেখ। পচা জলে মাছ থাকবে কেন? ওই দেখ।'
'কোথায়?'
'আরে কাছে আয় না। পাড়ে দাঁড়িয়ে উঁকি মারলে কি তেনাদের দেখা যায়!'
'ওই যে ধানের ছড়াগুলো জলের ওপর হেলে আছে না, তার নীচে।'
সত্যি গোড়ালি জলে একটা নীল রঙের বিশাল চিংড়ি পড়ে আছে। বোঝা যায় না-ঘাসের রং জলের রং একরকমের। নীল-হলুদ-সবুজ।
আমাদের নিরাময়দা মাছের পোকা। তার পক্ষেই সম্ভব জলজ ঘাসের নীচে অদৃশ্য হয়ে থাকা মাছটাকে খুঁজে বের করা।

সত্যি গোড়ালি জলে একটা নীল রঙের বিশাল চিংড়ি পড়ে আছে।
মাথাখানা কী বড়ো!
মুগুরের মতো মোটা।
আর তার অবয়ব নীল জলে প্রকৃতই ছবি হয়ে আছে।
নিরাময়দা শুধু মাছের পোকাই নয়, তিনি মাছের রাজা এও জানি আমরা। কেউ কেউ বলে হরি বিশ্বাসের চেলা। ডাঙায় মাছ লাফিয়ে ওঠে নিরাময়দাকে দেখলে।
সেই শিকারি মানুষটা বললেন, ইশারায়-'পারবি?'
আমি ঘাড় কাত করে বললাম, 'পারব।'
বড়দাও ছটফট করছিল মাছটাকে ধরার জন্য-আমাকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেল। আর ধরতে যেই না ঝাঁপিয়ে পড়ল, এক ঝটকায় কোথায় ছিটকে গেল মাছটা।
নিরাময়দা খেপে লাল।
'ইস কী করলি যে অচিন্ত্য।'
'আমার কী দোষ?'
'তা না, তোর দোষ নয়। আমারই দোষ। সর দেখি-বলে তিনি ঘোলা জলে ঘাসের মধ্যে খুঁজে বেড়ালেন। ইস এত বড়ো মাছটা হাতছাড়া করলি! হাত প্রমাণ সাইজের মাছটাকে তাড়ালি। আনাড়ি আর কাকে বলে!'
শনি-মঙ্গলবারে চিংড়ি মাছের জ্বর আসে বড়দাও জানে। জ্বরে বেহুঁস, না হলে এত হাতের কাছে জলে ডাঙায় পড়ে থাকবে কেন। সেই মাছটা বড়দার খবরদারিতে পালালে কার না রাগ হয়।
কী করা! আবার কিছুদূর খালের পাড়ে পাড়ে হেঁটে গেলাম।
রাত থাকতেই বের হতে হয়। অন্তত সূর্যোদয়ের আগে জলার ধার খুঁজে দেখতে হয়। পুকুরপাড়েও খোঁজা হয়। যেখানে জলজঙ্গল সেখানেই তেনারা পড়ে থাকেন। কাঠা-ভরতি মাছের জায়গায় একটাও মাছ নেই। যত নষ্টের মূলে বড়দা।
ভোররাতের অন্ধকারে নিরাময়দা যে টের পায় কী করে! গাছপাতা জলে নড়ানড়ি করলেই নাকি টের পাওয়া যায়-তেনারা উঠে আসছেন।
কপাল মন্দ। দাদা গজগজ করছেন। বিশমিল্লায় গলদ থাকলে আর কোনো আশা থাকে না। বড়দার জন্য সব ভরাডুবি। আমরা সবাই বড়দার ওপর খেপে গেলাম। আর তখনই বড়দা গোড়ালি জলে নেমে খপাস করে একটা লম্বা চিংড়ি ধরতে গিয়ে হাতে কাঁটা খেল। দরদর করে রক্ত পড়ছে। রক্ত পড়ছে পড়ুক, কিন্তু মাছটাকে কিছুতেই হাত থেকে ফেলছে না বড়দা।
নিরাময়দা খুব খুশি মাছটা দেখে। ডুলায় মাছটা রেখে দূর্বাঘাস দাঁতে চিবিয়ে বড়দার ক্ষতস্থানে চেপে দিয়ে বলল, 'ধরে রাখ।' তারপর গোল হয়ে সবাইকে নিয়ে বসলেন। খুব সন্তর্পণে মাথার খালি গামছা খুলে হাতে প্যাঁচ দিতে থাকলেন।
মাথার ওপর গাছের ছায়া। মশার উপদ্রবে বসাও মুশকিল। তারপর হাতটা প্রসারিত করে দেখালেন।
'বুঝলি কিছু?'
'আজ্ঞে না।'
'গামছাটা না প্যাঁচিয়ে নিলে মাছ তো ডাঁড়া মারবেই। মাথায় খড়্গ আছে না করাতের মতো-মাছের কী দোষ?'
'তা ঠিক।'
'মাছেরও তো প্রাণ আছে।'
'যথার্থ কথা।'
'সে তো প্রাণ রক্ষা করতেই চাইবে। কী, ঠিক কি না।'

'সে তো ঠিকই।'

'না ঠিক না। খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। আমাদের কাছে যাদের প্রাণ থাকলেও যা, না থাকলেও তাই। গামছাটা জ্যালজ্যালে। হাতের থাবায় গামছা প্যাঁচানো। মাছের মাথায় থাবা বসালেই মাছ স্তব্ধ। নিজের অস্ত্রে নিজেই বিদ্ধ হয়।'

'মানে?'

'মানে তোমার মুণ্ডু।'

'মুণ্ডু!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। করাত আছে না মাছের মুণ্ডুতে। জ্যালজ্যালে গামছায় তাই আটকে যায়। দেখবি-' বলেই আবার কোথায় কী দেখে জলের মধ্যে সোজা নেমে গেলেন। তারপর মাছটা তুলে দেখালেন।

'কী আমি ধরে আছি?'

'না তো!'

'তবে মাছটা আটকে আছে কী করে!'

'মাছটা আটকে আছে গামছায়!'

'কেন আটকে আছে।'

'জ্যালজ্যালে গামছায় মাছটার মাথায় করাত জড়িয়ে গেছে। বুঝলি হাত সাফাই। একটা আঁচড়াও নেই। ডাঁটার একটা আঁচড়ও হাতে লাগেনি।' বলে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই গোড়ালি জল থেকে ছোটো-বড়ো চিংড়ি ধরে প্রায় আধডুলা করে দেখালেন।

তারপর বললেন, 'আজকের মতো হয়ে যাবে। সাদা ভাতের সঙ্গে চিংড়ি মাছের পাতুড়ি জমবে ভালো।'

তবে সেবারেই নিরাময়দা আমাদের সঙ্গে নিয়ে মেঘনা নদীতে রওনা হলেন। সঙ্গে একহলা বাঁশের বানা, কোচ, বড়শি এবং পোলো। এক বেলার রাস্তা, দামোদরদির ঘাটের নীচে নৌকো ভিড়িয়ে সাধুবাবার আশ্রমে রাতে খিচুড়ি লাবড়া। সকালে বানা পুঁততে হবে। বোয়াল শোল ঢাইন মাছ ধরতে গিয়ে যে প্রাণ সংশয় সেবারেই বুঝেছিলাম-অবশ্য সেই গল্পটা পরে বলা যাবে।

বিশু ডাকাতের রণ-পা

মেজোমামা শুয়ে থেকেই বললেন, 'দমলে চলবে না।'

ছোটোকাকা বললেন, 'বিয়াইমশাই পরের এক্সপেডিশানে তোমাকে নেওয়া যাবে না। সব সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট নেওয়া হবে।'

মেজোমামা বললেন, 'তাহলে তিন দিনের রাস্তা তিন ঘণ্টায় যাওয়া যায় কিন্তু আমি বিশ্বাস করব না।'

এখানেই পরম সংকট ছোটোকাকার। সব ব্যাপারে মেজোমামাকে কুপোকাত করতে না পারলে ছোটোকাকার নাওয়া-খাওয়া হয় না, চোখে ঘুম থাকে না। সব তো এই একজন বিয়াইমশাইয়ের জন্য। কী যে ভুল করে ফেলেছে রণ-পায়ে তিন দিনের পথ তিন ঘণ্টায় যাওয়া যায় বলে। বড়োই সমস্যা। ছোটোকাকা বললেন, 'কিন্তু পা তো ফুলে ঢোল হল। আমরা কিছু জানি না।'

মেজোমামা বললেন, 'প্র্যাকটিস আরও করা দরকার। তখন আর পা-ফা ফুলবে না।'

সুতরাং আমাদের আবার পুরোদমে অনুশীলন। স্কুল থেকে এসেই ছোটোকাকা বইপত্র বৈঠকখানা ঘরে রেখে হাঁক পাড়তেন, 'বড়োবউ খাবার চাই।' জেঠিমা বলতেন, 'হাত-মুখ ধুয়ে এসো।' আমাদের নিয়ে কাকা তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুতে যেতেন ঘাটে। তারপর সবাই মিলে খাওয়া।

মেজোমামা খেতে খেতেই একজন বলল, 'বিশ্বাস পাড়ায় কবে যেন মেলা বসছে?'

ছোটোকাকা হিসেব করে বলল, 'মাঘী পূর্ণিমাতে।'

'তাহলে ওটা আমাদের সেকেন্ড এক্সপেডিশানে জুড়ে দিলে হয়।'

বিশ্বাস পাড়া আমাদের গ্রাম থেকে সাত মাইল। রণ-পায়ে সাত মাইল যেতে হবে শুনে বেশ লাফিয়ে উঠতেই ছোটোকাকা বলল, 'তুই এবারে নাই গেলি। বিশু ডাকাত ওদিকটাতেই থাকে।'

মেজোমামা বললেন, 'তাহলে আমারও যেয়ে কাজ নেই বিয়াইমশাই।'

ছোটোকাকা বলল, 'সে কী করে হয়!' তারপর ছোটোকাকা আমাদের উঠোনে রণ-পায়ে চেপে হাঁটতে থাকল এবং সঙ্গে হাকলু, ককুরোদা আর আমরা। মেজোমামার হাঁটুতে ব্যথা বলে বৈঠকখানা থেকে একটা চেয়ার বের করে এনে গম্ভীর মুখে বসে থাকল।

রণ-পায়ে ভর করেই ছোটোকাকা তার বিয়াইমশাইয়ের কাছে এসে চিৎকার করে উঠল, 'কোথায় ব্যথা?'

'এই হাঁটুতে।'

ছোটোকাকা রণ-পা থেকেই উঁচু হয়ে দেখল জায়গাটা। তারপর বলল, 'বিশু ডাকাতের শ্যালক ম্যাজিক দেখাবে মেলায়, তুমি না গেলে পরে আফশোস করবে।'

মেজোমামা বলল, 'ও কি রণ-পায়ে চেপে আসবে?'

'তা আসবে কেন? সে আসবে গোরুর গাড়িতে।' ছোটোকাকা রণ-পায়ে এবার আবার কিছুটা ঘুরে সে বলল, 'তাসের খেলা, পাখির খেলা, রুমালের খেলা, কাটা মাথার খেলা কত সব তার খেলা আছে। আগে জামাইবাবুর সঙ্গে ডাকাতি করত এখন ম্যাজিশিয়ান। কেউ বলে আসলে ম্যাজিক বিশু ডাকাতই দেখায়। নকল দাড়ি-গোঁফ পরলে কে চিনতে পারবে বিয়াইমশাই!'

মেজোমামা বলল, 'আমার দাদাকে খবরটা দেবে নাকি!'

'কী খবর!'

'এই যে বিশু নকল দাড়ি-গোঁফ পরে খেলা দেখায়।'

'যদি শেষে না হয়, তোমার দাদার মুণ্ডু ছিঁড়ে খাবে। জানো না তো, যাকে বলে বিশু ডাকাত। তোমার দাদার দারোগাগিরি বের করে দেবে।'

আমাদের বাড়িটায় কত লোক থাকে, কে আসে যায় আমরা তার খবর ঠিক রাখি না। দাদুর বয়স আশি- এখনও খড়ম পায়ে পাশের গাঁয়ে চলে যান বেড়াতে। শেষ বয়সের ছেলে ছোটোকাকা। বাবা জ্যাঠারা এগারোটি ভাই। পিসির সংখ্যা গোটা সাতেক। আমাদের বাড়িতে কে আসে কে থাকে তার সীমা সংখ্যা নেই। মেজোমামা এখানে পড়তে এসেছেন গেল সালে। আমার ন-কাকির ছোটো ভাই। বাবা জ্যাঠারা সবাই দূর দেশে থাকে বলে ছোটোকাকার প্রতাপ খুব। চাকর-বাকরেরা ছোটোবাবু বলতে অজ্ঞান!

মেজোজ্যাঠা বাড়ি থাকেন-বড়ো মাছ ধরার বাতিক-তিনি এক্ষুনি হেঁটে গেলেন বারবাড়ির উঠোনের ওপর দিয়ে-গোটা দুই সাঙাত সঙ্গে। মেজোবাবুর ধরা মাছটাই বয়ে আনবে, চা-ও করবে, তামাক সেজে দেবে। যাবার সময় এতগুলি রণ-পায়ের হাঁটাহাঁটি দেখে, একবার শুধু বললেন, 'পড়াশুনো তোমরা সবাই লাটে তুলেছ। শেষ পর্যন্ত সব ক-টাকে ডাকাতি করেই খেতে হবে।'

আমাদের বাপ-জ্যাঠারা যেমন এক গোষ্ঠী আমাদের ভাই-বোন মিলেও এক গোষ্ঠী। আমাদের রণ-পা ক্লাবে বাড়ির সদস্য সংখ্যাই চোদ্দো। আর আছে হাকলু পাল। পাল সেজো জ্যাঠামশাইকে বলল, 'আমরা মেলায় যাব সেজোকত্তা। তাই রণ-পা নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছি।'

অবশ্য ছোটোকাকা কথা বলারই লোক নন। হাকলু কথা বলছে বলে খেপে যাচ্ছে। অনুশীলনের সময় এসব কী আজেবাজে বিশ্রী কথোপকথন। শুধু ছোটোকাকা বলল, 'কথা বলার সময় অনেক পাবে হাকলু। নিজের কাজটি মনোযোগ দিয়ে করো।'

শীতের শেষাশেষি মেলা। মাঘের শেষ সপ্তাহে তৃতীয়ার চাঁদ দেখে আমাদের রওনা হতে হবে। মেলায় ঘোড়দৌড় দেখব, জিলিপি খাব, বিশু ডাকাতের শ্যালকের ম্যাজিক দেখব। আর মেলা বলে কথা। লোকজন, কাচের চুড়ি, বিন্নির খই, গুড়ের বাতাসা এসব তো আছেই। আমার অবশ্য অন্য একটা মজাও আছে। যদি বিশু ডাকাতের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, ওর রণ-পা দুটো চেয়ে নেব। আমাদের কত্তাবাবার আমলে বিশু গোয়ালে কাজ করত।

নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যায় সবাই মিলে তৃতীয়ার চাঁদ দেখলাম। তারপর ছোটোকাকা আমাদের নিয়ে পুকুরে নামলেন। যতক্ষণ আকাশে চাঁদ থাকল, সাঁতার কাটা গেল। তারপর গোয়ালঘরের পাশে পিকনিক হল আমাদের! বড়ো কই মাছ ভাজা আস্ত করে একটা, কই মাছ দিয়ে ফুলকপি, কচ্ছপের মাংস আর মুগের ডাল দিয়ে ভাত, শেষে সামান্য দই এবং মিষ্টি। খেতে খেতে রাত দশটা। শুয়ে পড়তে হবে সকাল সকাল, কারণ খুব সকালে রওনা হতে হবে।

আর যখন আমরা রওনা হলাম সে দেখার মতো কাণ্ড। আমাদের একরকমের পোশাক। সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট, সাদা কেডস জুতো, সাদা মোজা। নীল রঙের অমরপল্লি ক্লাবের ব্যাজ বুকে। সবার হাতে একজোড়া রণ-পা ছোটোকাকা দৌড়ে লাইন সোজা করে বাঁশিতে ফুঁ দিল। আমরা যে যার রণ-পায়ে হেঁটে যেতে থাকলাম। সবার পেছনে ছোটোকাকা আর হাকলু পাল। বাড়ি থেকে বের হতে কোনো গাছ-টাছে লেগে যাত্রার যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য ছোটোকাকা যত গাছপালা ছিল তার সব নীচু ডাল কেটে দিয়েছে। আমরা সোজা সড়কে পড়তেই এক এলাহি কাণ্ড। বিশ-বাইশ জনের রণ-পা ক্লাব প্রায় আকাশ ছুঁয়ে দিয়ে মাঠ ভেঙে চলে যেতে থাকল। গাঁয়ের কাকপাখিও বাদ গেল না-দৃশ্যটা দেখে তাজ্জব বনে গেল।

এবারে সত্যি আমরা অনেক পটু। প্রায় মাইল দুই হেঁটে একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে বিশ্রামের বাঁশি বাজল। মেজোমামা শুধু বলল, 'বিয়াইমশাই সময় কিন্তু আধ ঘণ্টা লাগল। রেলগাড়ি আধ ঘণ্টায় দু-মাইল গেলে কোম্পানি লাটে উঠবে।'

ছোটোকাকা গুম মেরে থাকল। কথা বলল না। পাশে জলছত্র। একটি করে বাতাসা আর এক গ্লাস করে জল। জল খাওয়ার পর যারা বড়ো তাদের হাতে হাতে ছোটোকাকা নস্যির ডিবে ঘুরিয়ে আনল! এবারে গরিপরদির মঠ পর্যন্ত। ছোটোকাকা বলল, 'যাদের জল তেষ্টা পেয়েছে, তারা সবাই পেট ভরে জল খেয়ে নাও। গরিপরদি গিয়ে খাওয়ার কথা ভাবব।'

আমার আবার খিদে পেলে খুব কষ্ট হয়। বললাম, 'এখানে কিছু খেয়ে নিলে হত না ছোটোকাকা?'

তার এক কথা। ছোটোকাকা শুধু বলল, 'না।'

গরিপরদি পৌঁছে আমরা দুটো করে অমৃতি আর এক ধামা করে মুড়ি পেলাম। গরিপরদির মদন সা-র সঙ্গে কাকার খুব ভাব। টাকাপয়সার কথা কিছু বলল না। রণ-পা ক্লাবের সদস্যদের দেখার জন্য গ্রাম ভেঙে পড়েছে। কেউ কেউ নাড়ু, মোয়া, মুড়ি এনেছে। আমাদের হাকলু পাল একটা বড়ো ব্যাগে সব নাড়ু নিয়ে বলল, লাইন দাও। সবার হাতে দুটো করে দিয়ে বাকিটা ফেরত দিয়ে দিল হাকলু। বড়োই সৌজন্যপরায়ণ হাকলু-যারা আমাদের দেখতে এসেছে তাদের হাতে হাতেও দুটো করে দিয়ে সব নাড়ু, মোয়া, তিলের তক্তি শেষ করে দিল।

আর অবাক, একটা ব্যান্ড পার্টিও জুটে গেল। গরিপরদির মদন সা-ই বলল, 'যখন যাচ্ছেন, একটু জাঁকজমক করে যান। বিশু ডাকাত যদি মেলায় গুপ্তচর পাঠিয়ে থাকে তবে বুঝতে পারবে অমরপল্লি ক্লাব বড়োই জাঁদরেল ক্লাব। আশেপাশের গাঁয়ে ডাকাতি করার আর হারামজাদার সাহস হবে না।' বলেই চারপাশে তাকাল। 'কী জানি, বলা যায় না তো বিশে কোথায় কাকে গুপ্তচর করে রেখে দিয়েছে কে জানে।'

কিন্তু ব্যান্ড পার্টি যেই তালে তালে বাজতে শুরু করল আমাদের রণ-পাও তালে তালে এগোতে থাকল। কিন্তু মুশকিল আমরা তিন-পা গেলে ব্যান্ড পার্টি এক-পা এগোয়। অতদূর যেতে দিন কাবার হয়ে যাবে। তখন কথা হল ঠিক বাইশ জন ব্যান্ডের লোক যাবে। আমাদের কোমরে ঝুলে থাকবে এক-এক জন। প্রথমে আমিই বললাম, 'পড়ে যাই যদি!' কিন্তু ছোটোকাকার এক কথা-'পারিব না এ কথাটি বলিয়ো না আর।'

অগত্যা একটি সাত বছরের বালক এবং ছোট্ট ড্রাম সহ আমি কোমরে ঝুলিয়ে ডাবল সাইকলিং শুরু করতে গিয়েই চিতপটাং।

প্রায় সবারই এ-অবস্থা হওয়াতে ছোটোকাকা বলল, 'ঠিক আছে ব্যান্ড পার্টি দৌড়াও।'

ছোটোকাকার কথামতো ওরা যে-যার পিঠে বাঁশি ব্যাগপাইপ ড্রাম নিয়ে দৌড়োতে থাকল। তারপর রয়েসয়ে আমরা। মেলার কাছে যেতেই ধুন্ধুমার কাণ্ড। লোকজন ছুটে আসছে। মেলাটাই বুঝি ভেঙে যাবে। আমরা মেলা দেখতে গেছি কে বলবে! যেন মেলাটাই আমাদের দেখতে আসছে।

ছোটোকাকা বলল, 'বড়োই বিপদে পড়া গেল!'

মেজোমামা বলল, মেলায় তো আসা গেল-কিন্তু সাত মাইল আসতে শেষ পর্যন্ত সাত ঘণ্টাই লেগে গেল।'

ছোটোকাকা বলল, 'আসলে আমাদের রণ-পা খুবই ছোটো। বিশু ডাকাতের রণ-পা পাব কোথায়? ও তো শুনেছি গাছের মাথার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়।'

যাই হোক। শেষপর্যন্ত মেলায় পৌঁছোনো গেছে সেই ঢের। ফেরার সময় ঠিক হল হাকলু পাল নৌকোয় ফিরে যাবে। রণ-পা সব নৌকোয় তুলে দেওয়া হবে। অতদূরের রাস্তা আবার রণ-পায়ে গেলে কেউ আর আস্ত থাকবে না।

মেলায় ম্যাজিকের লোকটাকেই আমার মনে হয়েছিল বিশু ডাকাত। ভীষণ উঁচু লম্বা। আর যা খেলা দেখাল, তাতে করে লোকটা তো সব মানুষকেই হাপিজ করে দিতে পারে। মন্ত্র পড়ে দুটো মেয়েকে হাওয়ায় বসিয়ে রাখল। পকেট থেকে তার ফরফর করে উড়ে গেল অজস্র সাদা কবুতর। কানের পাশ দিয়ে সোঁ করে বের হয়ে গেল একটা তির। সেটা সে খপ করে ধরে ফেলল। দুটো জ্যান্ত লোককে মঞ্চে তুলে নিয়ে সবার সামনে অদৃশ্য করে দিল।

হাকলু পাল সহসা ভিড়ের মধ্যে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, বলল, 'কী হবে কর্তা, আমার ঘড়ি কে ছিনতাই করেছে!' সঙ্গেসঙ্গে সবাই-যারা হাতঘড়ি পরে এসেছিল-একটাও আর কারও হাতে নেই। তাঁবুর মধ্যে বিশুর অপদেবতা নেই তো আবার।

তখনই জাদুকর বলল, 'আপনারা হল্লা করবেন না দয়া করে। ঘড়ি চুরি গিয়ে থাকে তো কী করা যাবে।' তারপরই হাঁকল, 'হাকলু পাল, এই নাও তোমার ঘড়ি।' সে তার পকেট থেকে প্রত্যেকের ঘড়ি বের করে দিল।

আমি বললাম, 'মেজোমামা বাড়ি চলো। গতিক ভালো না। কখন তোমাকেই প্যান্টে পুরে রণ-পায়ে বাতাসের সঙ্গে ভেসে চলে যাবে।'

আর অমনি মেজোমামার পেট ব্যথা। এই গেলাম সেই গেলাম করতে থাকল। রণ-পা ক্লাবের আর ম্যাজিক দেখা হল না। মেজোমামাকে ধরাধরি করে হাকলুর সঙ্গে নৌকোয় তুলে দেওয়া গেল। হাকলু, মেজোমামা আর গুষ্টিসুদ্ধ রণ-পা নৌকোয় যাবে। কিন্তু সন্ধ্যা থেকেই পা গুড়গুড় করতে থাকল। ফুলতে থাকল। ছোটোকাকারও কেমন বিমর্ষ ভাব। হাকলুই পরামর্শটা দিল, 'কর্তা সবাই নৌকোয় চলেন। পাল তুলে দেব, পালে হাওয়া লাগলে দিনের পথ বেলায় বেলায় পাড়ি দিতে পারব।'

ছোটোকাকা শেষ পর্যন্ত কী ভেবে রাজি হলেন। আসলে মাঠের অন্ধকার রাস্তা দিয়ে আমাদের সবারই যেতে ভয় লাগছিল। কোথা থেকে বিশু ডাকাত আক্রমণ করবে কে জানে। তবে রক্ষে রণ-পা নিয়ে নদীনালা পার হওয়া যায় না। কাদায় গেঁথে যায়।

বিশু ডাকাতের কী সাধ্য আমাদের নৌকোর নাগাল পায়!

এই ভুবন

১

যত দিন যাচ্ছে, আলাভাই ততই খেপে যাচ্ছে। বড়ো ভাইয়ের কী যে দুর্মতি হল, সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে যাবে বলছে।

বড়ো বড়ো সব টিন কাঠের ঘর, চৌচালা, আটচালা। এক বৈঠকখানার লপ্তেই তিনখানা পেল্লাই ঘর। ঠাকুরঘর, গোয়ালঘর, চালাঘর। তারপর আছে বড়োঘর, দক্ষিণের ঘর, পুবের ঘর, পশ্চিমের ঘর। আর আছে কুয়োতলা। চারপাশে পেয়ারা গাছ। আরও আছে বিলের জমি, ভিটা জমি, পাটের জমি, ধানের জমি-বাড়ির চারপাশে আম-জাম গাছের ছড়াছড়ি। বাতাবি লেবুর গাছ, জামরুল গাছ আর আমলকী গাছও আছে বাড়ির অন্দরের দিকে। নিরামিষ ঘর, আমিষ ঘর আর আছে দুটো লক্ষ্মীপ্যাঁচা এবং একজোড়া ভুতুম। দুটো সাপ তার গণ্ডা খানেক ছানা আর পোষা কুকুর সতীনাথ। বিঘা তিনেক জমি জুড়ে এই বাড়ি। ঘরবাড়ি, মানুষজন, জঙ্গল আর পাখপাখালি নিয়ে এই বসতবাটি।

সামনে দিঘি, দু-পাড়ে লটকন ফলের গাছ, জলে বিস্তৃত প্রমাণ রুই মাছ, একজোড়া গজার মাছ, ভাসলে দু-খানা গজারির খুঁটির মতো। বিশাল অতিকায় এই মাছ দিঘিতে কোন আমল থেকে আছে কেউ জানে না। তারপর ছাড়াবাড়ি-বনজঙ্গলে ভরতি। সাপখোপও মেলা। পাখপাখালি অজস্র। প্রজাপতিরা নির্বিঘ্নে উড়ে বেড়ায়-খালবিল নদীর জল নিয়ে এই ভুবন। এমন ভুবন ছেড়ে কেউ চলে যায়!

আলাভাই সহ্য করতে পারছে না। গেরস্থের বাড়ি দিন দিন খালি হয়ে গেলে কষ্ট হয় না! বড়ো বউঠান ধনবউঠান দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে পাড়ি দিল হে-পাড়ে। বড়ো গয়না নৌকোয় নারায়ণগঞ্জে। দুই পিসি গেল সঙ্গে। বাড়ির সব পোলাপান। একজনও রইল না।

রাগ হয় না!

আর জলের দরে জমি বিক্রি, গাছ বিক্রি, পুকুর বিক্রি মন মানে!

বাড়িটা যে তার কাছে একেবারে খালি হয়নি, কারণ অবিন। ছেলেটাকে কোলে-পিঠে করে সে মানুষ করেছে। ওর মা সুতিকা রোগে মরে গেল, বাবা নিখোঁজ। সে আর বড়ো বউঠানই তাকে বলতে গেলে বড়ো

করে তুলেছে। বাড়ির ছোটোকর্তা টুকাভাই অবশ্য আছে, একদম বনিবনা হয় না দু-জনে। সেই কবে পুবাইলের জমিদারি সেরেস্তার ভুঁইয়ামশাইয়ের পিছু পিছু সে এ-বাড়িতে এসে উঠেছিল। তখন দেশে যুদ্ধ চলছে। কর্মিটোলায় ক্যান্টনমেন্ট-দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ যে কত খারাপ, সে তখনই বুঝেছে।

নদী নৌকা, হাতি, ঘোড়া যুদ্ধের জন্য সব ইংরেজ সরকার ইজারা নিয়ে নিচ্ছে। তারকবাবুর হাতিকে কবজা করতে পারল না। আর শীতলক্ষার চর, বাঁশবন, নদীর মোহনায় যে গড়, অর্থাৎ বর্ষায় একরকম, শীতে একরকম, বর্ষায় নদীর ইলিশ মাছ তো ছিলই। সেসব ফেলে কেউ যেতে চায়! হাতি যাবে কেন?

অবশ্য হাতি ইলিশ মাছ খায় না। তবে নদীতে ইলিশের ঝাঁক ভেসে এলে, খড়াজালে পর্যন্ত ইলিশ ধরা পড়ে। এত ইলিশ, বাবুদের বাড়ির ঝি-বউরা কেটে সামলাতে পারছে না। ইলিশ মাছ ভাজা, আর চাক চাক করে কাটা মুলার খণ্ড, এবং তখন বাবুদের শরিফ, হাতির সেবাযত্নও বেড়ে যায়, হাতির খোরাকি বাবদ বেশি টাকা সরকারমশাই আনন্দের চোটে খরচ করে ফেলেন। দানাশস্য এক বস্তার সঙ্গে কলা গাছ, মাদারের ডাল অপর্যাপ্ত, কখনো ছোলার ডালও দানা শস্যের মধ্যে থাকে।

তখন তো আলা নদীর চরে মাছ ধরে বেড়ায়। ইস্কুলে যায় না। খবর হয়েছে, জোয়ান ছেলে পেলেই পল্টনের সিপাইরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সেই আতঙ্কে আলা, আলা মানে আলাউদ্দিনের চোখে ঘুম নেই। তবে হাতির কাছে কেউ যায় না। পল্টনের সিপাইরা শুনেছে, হাতির মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। কেউ কাছে গেলেই শুঁড় উঁচিয়ে পদপিষ্ট করছে। আলা এখন সেখান থেকে মাঁদারের ডাল নিয়ে গিয়ে আদর করে হাতিটাকে খাওয়ায়। কারণ হাতির এই বাসস্থান পিলখানার জঙ্গল পালিয়ে যাবার পক্ষে বেশি নিরাপদ। হাতির সেই মনোহর ভোজনের মনোহর বিবরণ দিতে গেলে কত কথা বলতে হয়। মাঁদারের ডাল শুঁড়ে তুলে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে খট করে ভেঙে ফেলে। তারপর যেন নারকেল খাচ্ছে, সে জানে হাতি নারকেল খেতে খুব ভালোবাসে। মাদারের ডালও খেতে ভালোবাসে। আর সে দেখেছে, আদর করে খেতে দিলে, হাতিও শুঁড়ে তুলে তাকে পিঠে বসিয়ে দেয়-বেশি আতঙ্কে পড়ে গেলে আলা হাতির পায়ের কাছে বসে থাকত। হাতে দু-তিন জোড়া নারকেল-হাতির আনন্দের আর সীমা থাকে না-পল্টনের সিপাইরা তাকে ধরতে এসে দেখে সে হাতির পিঠে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

আলার নানা, সোহরাবের দুশ্চিন্তা, কর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের কাছে থাকা আর ঠিক নয়। আলাকে দূর দেশে পাঠিয়ে দিলে এ যাত্রায় সে রক্ষা পাবে। একদিন পুবাইলের কাছারি বাড়িতে গিয়ে সোহরাব হাজির। সঙ্গে আলা।

'কী খবর মিঁয়াসাহেব?'

'সালাম ভুঁইয়ামশায়। আলারে নিয়া আইলাম, অরে যদি আপনার সঙ্গে দেশের বাড়িতে নিয়া যান তবে তার এ যাত্রায় প্রাণ রক্ষা পায়। গোরাদের ক্যান যে অর উপর নজর পড়ছে!'

'মিলিটারি তো ভালো ব্যাপার। ভয় পায় কেন!'

'সে জানি না ভুঁইয়ামশায়। কোনো এক গোরা সিপাইর ওকে খুব পছন্দ।'

ভুঁইয়ামশায় মাথা চুলকে বললেন, 'যদি যেতে চায় যাবে। কারণ কাজের লোক রামলোচন বুড়ো হয়েছে। জমিজমা দেখাশোনা করা মেলা হ্যাপা।'

সোহরাব বলল, 'আপনেরা পাঁচ ভাই। আপনে বড়ো ভুঁইয়ামশায়! আপনেরে সকলে মানে।'

সোহরাব বলল, 'টুকাভাই কেমন আছেন?'

'সেই ত কথা। অর ঘরে আলা থাকতে পারে।' আলাকে ডেকে বললেন, 'খবরদার তুই অর কোচ, পলো একহলাতে হাত দিবি না। হাত দিলেই কিন্তু দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে।'

আলার তখন প্রাণ বাঁচানো নিয়ে দায়। সে যেকোনো শর্তেই দূরে চলে যেতে পারলে বেঁচে যায়। সে যুদ্ধে যেতে চায় না। সে যাইহোক, সেই আলার গল্পই শুরু করা যাক।

শেষে দেশের এ হেন পরিস্থিতি হবে, জমিদারি উচ্ছেদ হবে-দেশ ভাগ হবে, একটা দেশ ভেঙে দুটো দেশ হবে খোয়াবেও কেউ ভাবেনি। দেশে তো পাগলছাগল মানুষের অভাব নাই। খোয়াব দেখছে, ইংরেজদের দেশছাড়া করে স্বাধীন হবে। এইসব নানা বিশ্বাসের মধ্যেই আলা এবাড়িতে এসে উঠেছিল। সাবালক আলা এখন কত বড়ো হয়েও গেছে। সোনা বউঠান কী খুবসুরত ছিলেন-সুতিকা রোগে ভুগে ভুগে মরে গেলেন। আলাকে যখন-তখন ডেকে পাঠাতেন-

'এই আলা।'

আলা বারান্দায়।

'কইবেন কিছু?'

'আমি আর পারি না। তুই অবিনরে দিঘির পাড়ে একটু ঘুরিয়ে আন বাবা। বড়ো ঘ্যান ঘ্যান করছে।'

আলা সানন্দে অবিনকে কোলে নিতে গেলে একেবারে দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার কোলে।

২

সেই আলা আর আলা নেই, সেই অবিন আর অবিন নেই। আলা বাড়ির ছেলেপুলেদের মোটামুটি শাসনভার পেয়েছিল। পুকুরে কিংবা দিঘির জলে কে কতক্ষণ সাঁতার কাটবে, কে ক-টা ডুব দেবে, বাতাবি লেবু টুর্নামেন্টে বাড়ির ছেলেরা কে ক-টা গোল দেবে সেই ঠিক করে দিত।

আর অবিন টেস্ট দেবে। সামনে তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। অবিন সোনারগাঁ স্কুলে পড়ে। তার দাদারাও পড়ে। তার ভাইয়েরাও পড়ে। ঠাকুরভাই, ধনভাই, সোনাভাই, চিনিভাই, এরাও যে-যার মতো বড়ো হয়ে পরীক্ষা দিয়েছে, পাশ করেছে। রাঙাকাকা গুষ্টিসুদ্ধু পাশকরা অবিনের এই ভাইদের কোথাকার এক মোকামায় রেলে কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কেবল ঠাকুরভাই শঙ্করের কপাল খারাপ।

সেই কবে থেকে পরীক্ষা দিয়েই চলেছে।

টেস্টে এলাউ হচ্ছে না।

এবারেও সে অবিনের সঙ্গে টেস্ট দেবে।

বাড়িতে এখন আছেন বলতে বড়োজ্যাঠামশাই।

তিনি আছেন, কারণ জমিজমা বিক্রি হচ্ছে। আর আছে এক বিধবা পিসি।

আলাকে রাঙাকাকা বলেছিলেন, 'তুই যাবি। রেলে ঢুকিয়ে দেব। দেশে থাকলে পচে মরবি।'

রাঙাকাকা বাড়ি এলে আলাভাই কোথায় যে থাকত, কেউ টের পেত না। রাঙ্গাকাকা ডাকলেও সে সাড়া দিত না।

'আরে আলা কোথায়! খাবে না।' পিসি কাকি জেঠিরা উদ্বেগে পড়ে যেতেন।

'আরে আলা তুই কোথায় গেলি। তুই না খেলে আমরা খাই কী করে!'

রাঙাকাকা আমলকী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ফিক ফিক করে হাসতেন। বলতেন, 'ওর যে ভয়, রেলে ঢুকিয়ে দিলে সে আর দেশে ফিরতে পারবে না। রাস্তা হারিয়ে ফেলবে।' বলেই তিনি ফের হাসতেন। 'কতরকমের যে পাগল থাকে!'

রাঙাকাকা অবিনের ছোটোঠাকুরদার বড়ো ছেলে। তার সাহেবি কেতাকে আলাভাই মোটেই পছন্দ করত না। কোথায় লামডিং-এ রেল ওয়ার্কশপের জেনারেল ম্যানেজার। তার অসীম ক্ষমতা। ধরে নিয়ে গিয়ে রেলে ঢুকিয়ে দিলে দেশে আর ফিরতে পারবে না। সেই আতঙ্কেই যে আলা কোনো গাছের তলায় কিংবা ছাড়াবাড়ির জঙ্গলে পালিয়ে থাকত টের পেতাম।

আর তখন বাড়িতে একজনকেই সে ভয় পায়। অবিন দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাকলেই হল, 'আলা তুমি কোথায়। সবার খাওয়া হয়ে গেছে। কাকি-জেঠিরা খেতে বসতে পারছে না। যখন-তখন হাওয়া হয়ে গেলে

চলে!' তখনই হয়তো চিনিভাইয়ের চ্যাঁচামেচি, 'এই তো আলাভাই। গাছের নীচে ঘাসের মধ্যে গামছা বিছিয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছে।'

সে ধরফর করে উঠেই বলবে, 'অবিনের খাওয়া হয়েছে?'

'সবারই হয়েছে। কাকি-জেঠিরা খায়নি। তুমি না খেলে ওঁরা খায় কী করে!'

অবিনের মনে আছে টুকাইকাকা যেদিন বাড়ি ছেড়ে গেল, সেদিন কেউ চোখের জল রোধ করতে পারেনি। বড়োকর্তার অর্থাৎ আমার বড়োজেঠু ডেকে বলে দিয়েছেন, 'বোঝলা টুকাই তোমারও ডাক আইসা গ্যাছে।'

মাইনকা অর্থাৎ আমার রাঙাকাকার চিঠি এলেই আমরা কেউ-না-কেউ বলি হচ্ছি। সেবারে টুকাইকাকার পালা। টুকাইকাকা আমার ছোটোঠাকুরদার ছোটো পুত্র, তারও এক সকালে একটা টিনের সুটকেশ হাতে বের হয়ে যেতে হল। যাবার সময় আলা কাকাকে ডেকে বলল, 'বাড়ির সব দেইখা শুইনা রাখবি। ঠাকুরভাইয়ের বয়স হয়েছে মনে রাখবি।' তারপর কী ভেবে কাকা বললেন, 'মাছ শিকারের বঁড়শি একহলা, কোচ, খেপলা জাল তোরে দিয়া গেলাম। তর পয়লা নম্বরের শত্রু টুকাই ঠাকুরও দেশ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তারপর দু-জনে জড়াজড়ি করে সে কী কান্নাকাটি! চোখে দেখা যায় না।'

টুকাইকাকার সঙ্গে আলাকাকার একদম বনিবনা হত না।

'এই আলা!'

'কন।'

'আবার আমার ছিপে হাত দিছস।'

'আজ্ঞে না।'

'মিছা কথা কস ফের।'

"মিছা কথা কই না। বড়োভাই হাট থাইকা একটা ছিপ আনতে পয়সা দিছিল। বড়োভাইরে জিগান।'

আলাকাকাও যে এক প্রস্ত কোচ পলো হুইল একহলা-মাছশিকারের যাবতীয় যন্ত্রপাতি ততদিনে আমদানি করে ফেলেছেন, টুকাইকাকা তা জানতেন। অর্থাৎ এই সংসারে আলাকাকা এবং টুকাইকাকার সমান গুরুত্ব। সোহরাব মিঁয়া হাজির একদিন।

বড়োজেঠুকে বললেন, 'ভুঁইয়ামশাই দিনকাল ভালো বুঝছি না। ঢাকায় দাঙ্গা লাগছে।'

'ঢাকায় দাঙ্গা! তা লাগুক। গাঁয়েগঞ্জে তো লাগেনি।'

'ভাবছিলাম আলাকে দেশে নিয়া যামু। আপনের যদি হুকুম হয়।'

আড়াল থেকে সোহরাব হোসেনের কথা শুনেই আবার আলাকাকা নিখোঁজ। সকালে খায়নি-গোরু-বাছুর নিয়ে মাঠেও যায়নি। স্কুল থেকে ফিরে শুনছি আলাকাকার সারাদিন দেখা নাই।

আমার ঠাকুরভাই, ওরফে বড়দা, অর্থাৎ শঙ্করকে বললাম, 'ঠাকুরভাই, কী হইছে রে?'

'আলাকাকার জ্যাঠা আইছিল। কইছে-নিয়া যাইব।'

'তাই তো কথা। সারাদিন কিছু খায়নি, জমিতেও নাই। মৎস্যশিকারেও যায় নাই। সে তার জ্যাঠাকে দেখেই ভেগেছে।'

'নিয়া যাইব ক্যান?'

'কইল তো দেশের অবস্থা ভালো না। ঘরের পোলা ঘরে না গেলে হয়!'

সোহরাবজি আরও বলেছিলেন, 'আপনেরা নাকি সব চইলা যাইতাছেন।'

'সোহরাবজি, চলে যাওয়া কি সোজা কথা! কত স্মৃতি এই ঘরবাড়ির। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ-সবাইকে ছাড়াবাড়িতেই দাহ করা হয়েছে। এই তো ছোটোকাকা চলে গেলেন আলা তো সারাদিন নাওয়া-খাওয়ার সময় পায় নাই। হাটবাজার থেকে হবিষ্যান্নের ঘি আতপচাল ফলমূল, সব ব্যাপারেই আলা। পারেও। চৈত্রমাস, বাঙ্গি তরমুজ ছাড়া কিছু মেলে না। আলা দশ ক্রোশ হেঁটে

সেই গোপালদির হাটে চলে গেল, হেন ফলমূল নেই যা সে নিয়ে আসেনি। আপনেও তো আবার হিন্দু বাড়িতে খান না। স্বপাকে খান। স্বপাকের ব্যবস্থা করছি।'

'আরে না না। আমি যাইতাছি আমার এক ফুফার বাড়িতে। ফুফার ইন্তেকাল হইছে। যাওনের পথে খবরটা দিয়া গেলাম।'

ভুঁইয়ামশাই কেমন কাতর গলায় বললেন, 'বাড়িতে আলা থাকলে জোর থাকে। কোথায় থাকে, কোথায় যে যায়! অনেক বেলা হয়ে গেল, আপনে নাহয় যান, আলা আইলে অরে কমুনে।'

অবিন ঠাকুরভাইয়ের মুখে সব শুনে বলল, 'আরে আলাকাকা যাইব কোথায়? কতদূরে যাইব! ডাকলেই সাড়া দিব।'

'আলা কা-কা!'

'ও আ...লা কা-কা। তোমার জ্যাঠা চইলা গেছে। তোমার জ্যাঠার এক ফুফার নাকি ইন্তেকাল হইছে। তার দেরি করার সময় নাই। তোমারে দেশে ফিরা যাইতে কইছে।'

আলাকাকা জঙ্গল থেকে বের হয়ে গামছাখানা ততক্ষণে ফেট্টি বেঁধে ফেলেছে।

তারপর আমার দিকে কেন যে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর চারপাশ দেখল-গাছপালা, আকাশ, দিঘির জল, তারিণী কবিরাজের ডিসপেনসারি এবং কোনো এক দূরাগত ইগল পাখির ডাক-সব মিলে কাকা এই জীবনে এত অভিভূত যে, তিনি শুধু বললেন, 'কইলেই বুঝি যাওয়ান যায়!'

৩

ছোটোবেলা থেকেই অবিন আলাকে আলা বলেই ডাকে। আলাকাকা বললেই আলার রাগ হয়। রাগ হলেও তো কিছু করার নেই! তার জ্যাঠা বাড়িতে বলে গেছে, 'অরে দ্যাশে পাঠাইয়া দিবেন।' আলা চলে গেলে যে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা অবিনের। তার যত বায়না কিংবা আবদার সবই আলার কাছে।

'আলা।'

'কিছু কবি?'

'আলা টেস্ট পরীক্ষার পর চলে যাচ্ছি জানিস?'

'জানি না আবার। বাড়িটার দশা তরা সবাই মিলা যা করলি! টেস্ট পরীক্ষার তো দেরি আছে। আসল কথাখান কইয়া ফ্যাল সোনা।'

'এক জোড়া চামড়ার জুতা দিবা কইছিলা।'

'মনে আছে।'

অবিন জানে বাড়িতে নানারকম সংস্কার আছে। এই বৈঠকখানা ছাড়া চামড়ার জুতো পরে বাড়ির কোথাও হাঁটা যায় না। ঘরে ঢোকা যায় না। হয় রবারের জুতা না হয় কাপড়ের জুতা। অলপিসির বিয়েতে কলকাতা থেকে বরযাত্রী এসেছিল। বরের ভাইজি অনিতা, রনিতা বরযাত্রী। মেয়েছেলে জুতা পরে সেটাই এক বিস্ময়! টেস্ট পরীক্ষার পর কলকাতায় অলপিসির বাড়িতেই তার ওঠার কথা। অনিতা, রনিতা ফ্রক গায়ে দেয়, লেস দেওয়া ফ্রক। আবার চামড়ার জুতাও পরে। বিয়ের সময় অনিতা, রনিতা তাকে দেখলেই হাসাহাসি করত আড়ালে। কাপড়ের জুতা পরলে হাসির কী থাকে সে বুঝেই উঠতে পারে না।

সে যাই হোক, কলকাতায় গেলে চামড়ার জুতা পরে না গেলে যে মান থাকে না।

কিন্তু বড়োজেঠুর এককথা, 'তুমি বামুনের পোলা। এই আলা খবরদার অবিনরে চামড়ার জুতা কিনা দিবি না। আমাদের বংশে চামড়ার জুতা পরার চল নাই। খবরদার।'

শত হলেও বড়োজেঠু পুবাইলের জমিদারি সেরেস্তার ভুঁইয়ামশায়-গাঁয়ে-গঞ্জে বড়োকর্তা, তার নির্দেশ অবহেলা করে কী করে! কিনে দেব দেব করছে, কিন্তু কিনে দিচ্ছে না। বড়োজেঠুর নিষেধ। চামড়ার জুতো

পরে হাঁটাহাটি করলে বাড়িঘর অশুচি হয়। তা ছাড়া বাড়িতে গৃহদেবতা জনার্দনের নিত্য পূজা হয়ে থাকে। কী অনাচারে যে দেশছাড়া হতে হচ্ছে কে জানে!

সে যাই হোক, গোল বাধল আমার যাওয়া নিয়ে। সাতচল্লিশ সালের ১৫ আগস্ট দেশভাগ, তার পনেরো দিনের মধ্যে গয়না নৌকোয় জেঠুর নির্দেশে বাড়ির সবাই হিন্দুস্থানে পাচার। কেবল আমার আর ঠাকুরভাইয়ের অর্থাৎ আমার বড়দার যাওয়া হল না। টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে আমরা রওনা হব।

আর টেস্ট পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে আমার কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। হিন্দুস্থানে গিয়ে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হবে। এখনই গেলে কী হয়! ফাইনাল পরীক্ষা তো অনেক দেরি।

আলা বলল, 'কীরে অবিন, তুই নাকি কান্নাকাটি করছিস। আমার কথা ভাবলি না। তরা সবাই চইলা গেলে আমি একা থাকি কী কইরা!'

আলার কথায় যে কিছু হয় না আমি জানি। ভুঁইয়ামশায় না বললে এবাড়ির কুটোগাছটি নড়ে না।

জেঠুর জমিদারবাবুরাও দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সেরেস্তায় কাজের চাপ, তবু সময় করে দেশে এসে জেঠু জানতে পারলেন, বড়োজেঠিমার জন্য আমার মন খারাপ।

তা খারাপ হতেই পারে। লালনপালন বলে কথা। জেঠু আমাকে ডেকে বললেন, 'আরে আর দুটো মাস। তারপরই তোরা রওনা হয়ে যাবি। তুই, শঙ্কর আর বড়দি। মন খারাপ করলেই তো হয় না-তুই একা যাবি কী করে।'

'আমার যে কী হয়!'

আমি একাই যেতে পারব। জেঠিমাকে কতদিন দেখি না।'

'তোর জেঠিরও তো মন খারাপ। চিঠি দিয়েছে, অবিনের টেস্ট পরীক্ষা হলেই পাঠিয়ে দেবে। ওকে ছেড়ে আমার থাকতে খুব কষ্ট হয়।'

আলার এক ধমক।

'তুই একলা যাইতে পারবি। কলকাতা কি কাছের পথ!'

'পারমু। যতদূরেই হোক।'

আলা বলল, 'সবাই তোরা নিমকহারাম। কত দূরের দেশ। নারানগঞ্জ শহরে গিয়ে মেল ধরতে হবে। তারপর পদ্মানদীর ঢেউ। তারপর গোয়ালন্দ, তারপর ট্রেন। দর্শনায় ট্রেন বদল করতে হবে। আবার রানাঘাটে নেমেও ট্রেন বদল করতে হবে।'

কিন্তু আদেশ, 'আলা তুই অবিনরে গোয়ালন্দ মেলে তুলে দিয়ে আসবি।' দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে। বড়দি, শঙ্কর আপাতত থাকছে।

ফাইনাল পরীক্ষার দু-চারদিন আগে শঙ্কর বড়দিরে নিয়ে চলে যাবে।

শুরু হয়ে গেল। 'বড়োভাই, এতটুকুন পোলারে একলা পাঠাইবেন! কেউ তার সঙ্গে যাইব না।' সেই যে মুখ ব্যাজার আলার, কেমন অবাধ্য সব কথায়।

'এই আলা।'

'কহেন।'

'তুই হাসেম মিঁয়ারে খবর দিছিলি? তার তো আসার কথা। জমিজমা সেই নিব কইছে।'

আলা খবর দিয়েছে।

হাসেমভাই তোমারে বড়োকর্তা ডাইকা পাঠাইছে। জমিজমার বন্দোবস্তকরণ। তারপরই বলেছে, 'জলের দামে জমি নিবা মিয়া? খবরদার ঠ্যাং ভাইঙ্গা দিমু।'

হাসেম এই কথার পর আর আসে কী করে। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। আলার মাথা গরম। তাকে একা ফেলে সবাই চলে যাচ্ছে, আর জলের দরে জমি না পেলে হাসেম কিনবেনই বা কেন? আর ভুঁইয়ামশাইয়ের

কাছে গেলে আলা যদি সত্যি ঠ্যাং ভেঙে দেয়-রামলোচনই ফিরে এসে হাসেম মিয়ার না আসার রহস্য ফাঁস করে দিল। বড়োকর্তা ডাকলেন, 'আলা!'

'আজ্ঞে কন।'

'তুই হাসেমকে হুমকি দিয়েছিস?'

সে চুপ।

'কী বল! চুপ করে থাকলি কেন?'

আলা ফুঁসছে রাগে। বেশি হলে আলা কেঁদে ফেলে।

'আপনের কি মায়াদয়া নাই। এতটুকু পোলারে একা পাঠাইতে রাজি হয়ে গেলেন! রাস্তায় যদি কিছু হয়। রাস্তা যদি হারিয়ে ফেলে। মা-মরা পোলাডার কখন কী হইব!' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

আমি আলাকে প্রবোধ দিলাম। 'আমি ঠিক যেতে পারব। আমারে স্টিমারে তুলে দিলেই হবে। আমি যথেষ্ট বড়ো হয়েছি।'

আলা আর কোনো কথা বলল না আমার সঙ্গে। যাবার দিন দু-জনে সকাল সকাল রওনা হয়ে গেলাম। মাঠে পড়তেই আলাকাকা বললেন, 'এই ধর। চামড়ার জুতা। পইরা দ্যাখ ঠিক লাগে কি না।'

হেমন্তের শেষ, শীতের শুরু। আর পক্ষকাল, দামোদরদি ঘাটে স্টিমার পাওয়া যাবে। শেষপর্যন্ত সেই স্টিমারে নারানগঞ্জে। তারপর গোয়ালন্দ মেল।

তিন ক্রোশের মতো রাস্তা হেঁটে যাওয়া। আলার হাতে আবার টিনের সুটকেশ। যত এগোচ্ছি, তত আলা কেমন নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। কুকুর সতীনাথ আমাদের অনুসরণ করছে।

'আলা।'

'বল।'

'কথা বলছ না কেন?'

'কী কথা কমু! নিজের বাড়িঘর ছেড়ে কেউ যায়! বড়ো ভাইয়ের এই দুর্মতি, নিজের বাড়িঘর জমিজমা বেইচা দিতাছে। ওদেশে গিয়া খাবি কী! ওটা একটা দেশ! জমি উরাট, নদীর দেখা নাই, বর্ষায় গ্রাম মাঠ ডুবে যায় না, পালতোলা নৌকোর দেখা মেলে না, শাপলা-শালুক নাই, মাছ নাই, মাছশিকার নাই। তোরা মরতে চললি যে দেশে তোদের কেউ চেনে না। তোদের ভুঁইয়াবাড়ির এত যে নামডাক, কেউ তগো পাত্তা দিব!'

'আলা মন খারাপ করিস না। জ্যাঠার তো এক কথা, কিছু নাই তো কী হইছে, গঙ্গা নদী আছে। নদীর পাড়ে ঘরবাড়ি। সেখানে মরলেও শান্তি। গঙ্গাপ্রাপ্তি বলে কথা।'

পাশের গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে দেখা। আর একই কথা। 'আপনেরাও চললেন।'

আলা বলল, 'আরে দ্যাখো না মিঞা, কী দুর্গতি হয় কর্তাদের। এত বড়ো বাড়ির সুনাম জলাঞ্জলি দিয়া তেনারা দেশ ছাইড়া যাইতাছেন। এইটুকু পোলারে একলা একটা অচেনা দেশে পাঠাইয়া দিলেন। থাকতে পারব না, কইলাম থাকতে পারব না। আবার দ্যাশে ফিরা আসতে হইব। যা না তোরা। দ্যাখ আমি কী করি! যেদিকে দু-চক্ষু যায় চইলা যামু।'

'কী আজেবাজে কথা! আলা, এই কথায় আমার মন খারাপ হয়।'

সে যাই হোক স্টিমারে আমার পাশে আলা বসেই থাকল। নদীর জল দেখল- দিগন্তে পাখপাখালি উড়ছে। গয়না নৌকা হাটবাজার দেখতে দেখতে বলল, 'সাবধানে থাকিস অবিন। গিয়া একটা চিঠি দিস। তুই ভালো থাকলে আমিও ভালো থাকব।'

স্টিমার ছেড়ে দিলে দেখলাম আলা নদীর পাড়ে একা দাঁড়িয়ে আছে। যতক্ষণ স্টিমারটা দেখা যায়...।

আমার এই বয়সেও মনে হয় আলা সেই নদীর পাড়েই দাঁড়িয়ে আছে। যদি আমরা ফিরি সেই আশায়। কারণ আলা আমাকে তুলে দিয়ে কোথায় যে গেল-সে দেশে ফিরে যায়নি। আমাদের বাড়িতেও না। জেঠু

বললেন-'পাগল ছেলে।'

উপন্যাস

হানস ও সাদা জাহাজ

পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঠে এলে সোনালি রঙে ঢেকে যায় চারপাশটা। পাইন গাছগুলো রঙিন ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। আর কোথা থেকে উড়ে আসে অজস্র সাদা পাখি। ম্যান্ডেলা ঘুম থেকে উঠেই টের পায় পাখিরা এসে গেছে। বাড়ির ওপাশেই পাইনের বন। অনেক নীচে নামতে নামতে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে নেমে গেছে। মা কখন জানলা খুলে, দিয়ে গেছে গরম এক কাপ দুধ। সমুদ্রের হালকা গরম ঠান্ডা বাতাস এসে সুন্দর সোনালি চুলে বিলি কেটে গেল। কিন্তু ম্যান্ডেলার কী একটা হয়েছে। গেল রাতে সে যেন শুনতে পেয়েছে, সমুদ্রের নীচে কেউ রুপোর ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে হল, সে আর কেউ নয়, সেই জাদুকর বসন্তনিবাস। সারারাত জলের নীচে সে আর বসন্তনিবাস সাঁতার কেটেছে। মাথায় তার পালক, আর সঙ্গে ছোটো ক্যাঙারুর বাচ্চা হাইতিতি। তারপরই দেখেছিল, সে আর ম্যান্ডেলা নেই। বসন্তনিবাসও আর জাদুকর নেই। সাঁতার কাটতে কাটতে গভীর সমুদ্রের তলায় কেমন একটা শ্বেতপাথরের মূর্তি হয়ে গেল। যেন সেই মূর্তিটা বলছে, 'ম্যান্ডেলা কাল আমি পাইন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি এসো।'

তখনই মনে হল, বসন্তনিবাস তাকে পালকটা দিয়ে গেছে। আসলে সে আগে বুঝতে পারেনি, পালকটা পরলে শরীর হালকা হয়ে যায়। বাতাসে ভেসে যাওয়া যায়। কেউ দেখতে পায় না। কেবল সবাই শুনতে পায়, আকাশে কে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। যদি সত্যি হয়, কী মজা?

প্রথমে সে মার কাছে পাশের ঘরে দৌড়ে এল। বলল, 'মা মা?'

লুসি বলল, 'কী হয়েছে? অমন হাঁপাচ্ছিস কেন?'

'মা, বসন্তনিবাস বলেছে সে শ্বেতপাথরের মূর্তি হয়ে যাবে। বলেছে পাইনের বনটা যেখানে শেষ হয়েছে না, সেখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

লুসির হাতে সকাল বেলায় কাজ থাকে কত। মানুষটা তার জাহাজডুবিতে কবেই নিখোঁজ হয়েছে। সম্বল বলতে এখন শুধু ম্যান্ডেলা। পাইন ফেস্টিভ্যালের ছুটি বলে স্কুল বন্ধ। তবু তো মানুষের কাজের শেষ থাকে না। সকাল বেলায় ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, হাইতিতিকে বাইরে বের করা, সিলভার ওকের নীচে বেঁধে রাখা, খেতে দেওয়া, বাজার করা-কত কাজ। তখন কিনা ম্যান্ডেলা বলছে, বসন্তনিবাস সত্যি জাদুকর হয়ে গেছে।

বসন্তনিবাস একটা সাদা পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে সমুদ্রের নির্জন একটা পাইনের ছায়ায়। লুসি বলল, 'হ্যাঁ তোকে বলেছে! থাম তো! কাজ করতে দে বাপু। দুধটা খেয়েছিস?'

ম্যান্ডেলা কেমন হতাশ হল। দুধটা খেতে হবে। কিন্তু তার যে তর সইছে না। মা বাজারে গেলে চুপিচুপি একবার পাহাড় থেকে নেমে যাবে ভাবল। সঙ্গে হাইতিতিকে নেবে।

ম্যান্ডেলার মন ভারি নরম। বাপ জাহাজডুবিতে নিখোঁজ-এখন বুঝতে শিখেছে। কতদিনের শখ, কেউ একটা যদি পালক দিয়ে যায়। মন্ত্রপূত পালক। যা পরে সে সমুদ্রে, নির্জন দ্বীপে, দূরদূরান্তে বাতাসে ভেসে ভেসে চলে যেতে পারবে। এই সেদিন এসেছিল একটা সাদা রঙের জাহাজ। তাতে থাকত একজন নাবিক। বিকেল হলেই বিচিত্র পোশাক পরে নেমে আসত। শহরের শিশুরা জমা হত ওর পায়ের কাছে। কত রকমের খেলনা সেপটিপিনে আটকানো। হাতি বাঘ ভাল্লুক, জাভা দ্বীপের মুখোশ, হাওয়াই দ্বীপের খরগোশ, সুন্দরবনের একটা বাচ্চা বাঘ। সে শিশুদের দিত টফি। হাতে দিত ঝুমঝুমি। ওয়াকা যাবার সময় একটা লম্বা পাতার বাঁশি দিয়েছিল। যে-কদিন ছিল, ছোট্ট শহরটাকে বেশ মাতিয়ে রেখেছিল। এইতো সেদিন চলে গেল জাহাজটা। সেই আশ্চর্য নাবিক চলে গেল। সে-ই নাকি বলে গেছে ম্যান্ডেলাকে, 'একটা পালক? তা দিয়েছি তোমাকে। একটা ঘণ্টা? তাও দিয়েছি।' ম্যান্ডেলারও বিশ্বাস, জাদুকর তাকে দিয়েছে ঠিক, কিন্তু সে ঘণ্টা আর পালকের গুণাগুণ বুঝতে পারেনি বলে ঠিক এখানে-সেখানে ফেলে রেখেছে। খোঁজাখুঁজি করলেই পাওয়া যাবে। আজ সকালে উঠেই আবার মনে হয়েছে সেই নাবিক জাদুকর এসে দাঁড়িয়ে আছে টিলি পাহাড়ের নীচে। ম্যান্ডেলা এখন সেখানে যেতে চায়।

লুসি বলল, 'ঠিক আছে যাবে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। দুধটুকু খাও। হাইতিতিকে ঘাস দাও খেতে। বাড়িঘর সাফসোফ করি, তারপর বাজারের পথে তোমাকে নাহয় সেখানে রেখে যাব।'

ম্যান্ডেলা পরেছে সাদা রঙের ফ্রক, মাথায় সাদা রিবন। পায়ে কারুকাজ করা জুতো। চোখ দুটো বিস্ময়ে ভরা। সরল শিশু হলে যা হয়। পাহাড়, আপেলের বাগান, গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুরের ফল বাড়িটার চারপাশে। তারই নীচে ছোটো টিলি পাহাড়। তারই নীচে দেড়চোখো তালপাতার সিপাই সেই পাইন গাছটা।

কিন্তু তার আগেই ওয়াকা হাজির। সে মামার বাগান থেকে চিৎকার করতে করতে এসেছে-'ম্যান্ডেলা ম্যান্ডেলা, শিগগির। টিলি পাহাড়ে আবার সে এসে গেছে।'

ম্যান্ডেলা জানালায় উঁকি দিয়ে দেখল, পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফিয়ে ওয়াকা ছুটছে। ঝোপজঙ্গল পার হয়ে আসছে। অনেক নীচে খাদের মতো জায়গাটা সে লাফিয়ে পার হয়ে একেবারে একটা উড়ন্ত পাখির মতো হাজির জানালায়। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সবাই চলে গেছে।'

'কোথায়?'

'বারে টিলি পাহাড়ে।'

ওমা, তাই তো! ওয়াকা জানল কী করে। ম্যান্ডেলা বলল, 'তুই জানলি কী করে?'

ওয়াকা তাজ্জব বনে গেছে। ম্যান্ডেলা এই খবরটাও রাখে না। সে বলল, 'তুই কী রে? শহরের সবাই রাতে স্বপ্ন দেখেছে, একটা শ্বেতপাথরের মূর্তি। মাথায় পালক, পায়ে জরির কারুকাজ করা নাগরাই জুতো, পরনে রাজার পোশাক। গলায় সুন্দর লাল-নীল রঙের পাথরের মালা। জাদুকর বসন্তনিবাস পাথরের মূর্তি হয়ে ফিরে এসেছে। সকালেই মূর্তিটা পাওয়া গেছে বালুবেলায়। শিশুরা তাকে তুলে খাড়া করেছে। পুলিশ, নগরপাল সবাই হাজির। কী করা যায় এমন সুন্দর মূর্তি নিয়ে!'

ম্যান্ডেলা বলল, 'মামা জানে?'

'মামা তো সেখানেই চলে গেছে।'

'ওয়াকা, আমরা কিন্তু ওকে শহরের ভিতর নিয়ে যেতে দেব না। ওখানেই রাখব। যেখানে সে আমাদের পাইন পাতার ফেস্টিভালে নাচানাচি করছিল, সেখানেই দাঁড় করিয়ে রাখব।'

ম্যান্ডেলার মামা সকালের কাগজেই খবরটা দেখেছিলেন। পৃথিবীর সব শিশুরাই নাকি গতকাল খুব মনমরা হয়েছিল। ওয়াকা, ম্যান্ডেলা সবাই গতকাল মনমরা ছিল। শুধু তারা নয়। মা-বাবাদের সবারই অভিযোগ, কিছু একটা হয়েছে। তারপর যেখানে যত নির্জন দ্বীপ আছে, যেখানে জাদুকর বসন্তনিবাস খেলা দেখিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেখানেই সেই তাজ্জব ঘটনা। দেখতে পাওয়া গেছে বালিয়াড়িতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে শ্বেতপাথরের একটা মূর্তি! ম্যান্ডেলা আর ওয়াকা এবং শহরের অন্য সব শিশুরা যখন গেল টিলি পাহাড়ের নীচে, দেখল সত্যি সেই বসন্তনিবাস। সে এই বন্দরে খেলা দেখিয়ে গেছে। হুবহু একই রকমের চোখ মুখ। ঠিক সেইরকম চোখে দুষ্টুমি। ঠিক সেইরকম পোশাক। পোশাকে মিনে করা প্রজাপতি, খরগোশ, ফড়িং, বাঘ, ভাল্লুকের ছবি। লতাপাতা ফুলফলের ছবি।

আর তখনই ম্যান্ডেলার মনে হল, যখন এতটা হয়েছে, বাকিটাও হবে। বসন্তনিবাসের কথাই ঠিক। যাবার সময় সে তো বলে গেছিল, আবার শিশুদের মাঝে সে চলে আসবে। এসেও গেল ঠিক। তবে বাকিটা আর মিছে কথা হবে কেন। বসন্তনিবাস বলেছিল, 'কোথায় রাখলে পালকটা। ঠিক হারিয়েছ! রুপোর ঘণ্টা দিলাম, তাও হারিয়েছ!'

ম্যান্ডেলা সিলভার ওক গাছটার নীচে খুব জেদি মেয়ের মতো দাঁড়িয়েছিল। 'মিছে কথা। তুমি আমাকে কিছু না দিয়েই বলছ দিয়েছি।'

'না না। তুমি খুঁজে দেখো, ঠিক পাবে। পালকটা পরলে সমুদ্র থেকে উড়ে আসবে প্রজাপতিরা, পাইনের বন থেকে পাখিরা। পালকটা পরলে বাতাসে ভেসে যাবে। কেউ দেখতে পাবে না। পালকটা পরলে, তোমার যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে।'

'আর ঘণ্টাটা! রুপোলি ঘণ্টা।'

'ওটা হাইতিতির গলায় পরিয়ে দেবে। তুমি তো হাইতিতি কাছে না থাকলে ভয় পাও। সে তোমার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যাবে। যদি যেতে চাও নদীর মোহনায় সহজেই যেতে পারবে। যদি উড়ে যেতে চাও পাহাড় ডিঙিয়ে লাল সূর্যের দেশে বাধা পাবে না। বাবার জাহাজডুবির জায়গাটাও খুঁজে বের করতে পারবে। কে জানে তিনি হয়তো এক নির্জন দ্বীপে ভাঙা পাল, হালের কাঠ জোড়া লাগিয়ে একটা নৌকো বানাবার চেষ্টা করছেন। তিনি ছোট্ট ম্যান্ডেলার কথা মনে পড়লে চুপচাপ দ্বীপে দাঁড়িয়ে থাকেন। পাখিরা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। তাদের সে হাত তুলে বলে, ম্যান্ডেলাকে বলো, আমি ভালো আছি। বলবে, নৌকোটা বানিয়ে ফেলতে পারলেই চলে যাব। এখানে আমার কোনো কষ্ট নেই। সমুদ্র থেকে ধরে আনছি চিংড়ি, কচ্ছপ আর ম্যাকরোল মাছ। তা ঝলসে খাই। এখানে পাওয়া যায় বুনো ফুলের মধু। সবুজ শস্যদানা জন্মে থাকে মাটিতে। সব কুড়িয়েবাড়িয়ে কেক তৈরি করি। মধু দিয়ে সেই পিঠে খেতে বড়ো সুস্বাদু। আমি একা খাচ্ছি ভাববে না। কিছু ম্যান্ডেলা আর তার মা-র জন্য রেখে দিয়েছি। দেশে ফিরে যাবার সময় প্রিয়জনদের জন্য কিছু নিয়ে যেতে হয়। আমার আর কী আছে! মধু আছে, পিঠে আছে। ম্যাকরোল মাছের ডিম দিয়ে তিতি পাখির দুধের সঙ্গে তৈরি করি পরিজ। খেতে ভারি সুস্বাদু। দেশে ফিরে গেলে পদ্মপাতায় তাও নিয়ে যাব।'

সারাটা দিন শহরের ছেলে-মেয়েরা যখন বসন্তনিবাসের মূর্তিটার নীচে নাচানাচি করেছে তখন ম্যান্ডেলা খুঁজে বেড়িয়েছে তার পালক, আর হাইতিতির ঘণ্টা। পাতার পাহাড় জমা হয়ে আছে পাইনের বনে। সেইসব ঘেঁটে সে দেখেছে। বাড়ির পেছনে বাবার দেশি-বিদেশি ফুল-ফলের গাছ। সেখানেও খোঁজাখুঁজি করেছে। ঘরের পুতুলের বাক্স, খাটের নীচটা, কোথাও বাদ রাখেনি। মা বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'হচ্ছেটা কী?'

কাঁদো-কাঁদো মুখে ম্যান্ডেলা বলেছে, 'আমার পালক!'

'পালক দিয়ে কী হবে?'

'ওটা আমাকে দিয়ে গেছে বসন্তনিবাস!'

মায়ের মন বলতে কথা। পৃথিবীতে কত কিছুই তো ঘটে। বসন্তনিবাস যদি সত্যি একটা পালক দিয়ে যায়। যতই আজগুবি হোক, ম্যান্ডেলার মা খুব জোরে ধমক দিতে পারে না। বলে, 'কোথায় রেখেছিস মনে করতে

পারছিস না!' যদি একটা পালক পাওয়া যায়, মেয়ের মনটা তো নরম হবে। সে একদিন, নিয়ে এল একটা ডোডো পাখির পালক। ওটা দিয়ে বলল, 'এই তো পালক।'

ম্যান্ডেলা বলল, 'ধ্যুৎ এটা হবে কেন। ওটা ময়ূরের পালক। তুমি দেখনি, বসন্তনিবাসের মাথায় থাকত। বসন্তনিবাস ইন্ডিয়ার লোক। ওখানেই অমন পালক পাওয়া যায়।'

লুসি দেখেছে সেটা। কিন্তু এখানে সে পাবে কোথায় সেই পালক। পালকটা পেলে আর কিছু না হোক, ম্যান্ডেলা শান্ত থাকত। পুতুলের আলমারিতে আর দশটা শৌখিন জিনিসের মতো ওটাও যত্ন করে রাখত ম্যান্ডেলা। তা ছাড়া রুপোর ঘণ্টা-সেটা নাহয় আনিয়ে দেবে ভাবল। এবং এক বিকেলে সে সারিম থেকে তৈরি করে আনল একটা রুপোর ঘণ্টা। সেটা দিয়ে বলল, 'এই দেখ তোর ঘণ্টা পেয়েছি।'

ম্যান্ডেলা বলল, 'ধ্যুৎ তুমি কিছু জান না মা। ঘণ্টাটার গায়ে মিনা করা বসন্তনিবাসের ছবি। এ-ঘণ্টা হবে কেন?'

লুসি খুবই বিস্মিত হয়ে যায়। যেন হুবহু সত্যি কথা বলছে ম্যান্ডেলা।

দিন যায়। ম্যান্ডেলার কিছু ভালো লাগে না। সে হাইতিতিকে নিয়ে ঝোপে জঙ্গলে, পাইনের বনে, সিলভার ওকের নীচে যখনই সময় পায় খুঁজে বেড়ায় কিছু। তারপর সেদিন এল প্রচণ্ড ঝড়। তুষার ঝড়ের সঙ্গে এল এক ঝাঁক সাদা পাখি-তারা সমুদ্রে উড়ে গেল। ম্যান্ডেলা আর হাইতিতি উইলোর ঝোপে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে, তুষার ঝড়টা কী দাপটে বয়ে গেল। কিন্তু তার কিংবা হাইতিতির গায়ে কোনো তুষার কণা লেগে নেই। গাছপালা ভেঙে গেছে। ঘরবাড়ির চাল বেড়া উড়িয়ে নিয়েছে। লাল-নীল রঙের কাঠের ঘর যেন কোথাও তুষারপাতে নাক জেগে ভেসে আছে। কেবল বসন্তনিবাসের কাছাকাছি কোনো তুষারপাত ঘটেনি। তারই কাছাকাছি একটা বড়ো বার্চগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ম্যান্ডেলা। মা তাকে ঠিক লণ্ঠন নিয়ে এবার খুঁজতে বের হবে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। আর সেই বিদ্যুতের আলোতেই দেখল আকাশ থেকে ছোট্ট কিছু ভেসে আসছে। কাছে আসছে। এগিয়ে আসছে। ক্রমশ বড়ো হচ্ছে। ছিল মুক্তোবিন্দুর মতো। কাছে আসতেই হয়ে গেল রুপোর ঘণ্টা। ঘণ্টার গায়ে তুষার কণার মতো লেগে আছে একটা পালক। ম্যান্ডেলা চিৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি।' তখনই কেউ যেন বলে দিল, সেও বিদ্যুৎ কণার মতো কর্কশ কণ্ঠস্বর, 'চুউপ। পৃথিবীর আর কেউ জানবে না। কেউ জানলে, দ্রব্যগুণ আর থাকে না।'

ম্যান্ডেলা শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমার মা?'

'না। সেও না।' এক মস্ত বড়ো পুরুষ-সেই জাদুকর বসন্তনিবাসই যেন আসলে তুষার ঝড়। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ সমান। ছোট্ট মেয়ের হাত-পা শীতে সাদা হয়ে গেছে। এবং সেই অপরূপ পুরুষের দীর্ঘ ছবি দেখতে দেখতে ম্যান্ডেলার ঘুম এসে গেল। সে সকালে জেগে দেখল, মাথার কাছে পালক, পায়ের কাছে ঘণ্টা। তাড়াতাড়ি উঠেই সে ওটা লুকিয়ে ফেলল। পৃথিবীর কেউ জানল না, ম্যান্ডেলা পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য দ্রব্যগুণটি পেয়ে গেছে।

মা তখন ঘরে কী টুকিটাকি কাজ সারছিল। ফ্রকের নীচে সে ঘণ্টা লুকিয়ে বাইরে বের হয়ে এল। প্রথমে সে নিজে পরল পালকটা। ওমা-একী, সে কি হালকা হয়ে যাচ্ছে! উড়ে যেতে চাইছে। তাড়াতাড়ি সিলভার ওকের ডাল জাপটে ধরল। পালকটা বেণিতে গুঁজে দিয়েছিল, তাতেই এই। সে এবার ধীরে ধীরে ডাল বেয়ে নীচে নামল। হাইতিতির গলা থেকে শেকলটা খুলে দিল। তারপর সে পালক আর হাইতিতিকে ঘণ্টা পরাতেই জলের নীচে মাছের মতো হয়ে গেল। যেন বাতাসে সাঁতার কাটছে। ইচ্ছে করলে নীচে ওপরে যখন যেমন খুশি। প্রথমে বাড়িটার চালের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। লুসি সহসা ঘরের চালে ঘণ্টার শব্দ পেয়েই বাইরে দৌড়ে এল। দেখল কিছু নেই কেবল ঘণ্টা বাজছে। ভারি ভূতুড়ে ব্যাপার। সে ডাকল, 'ম্যান্ডেলা।' অপদেবতাদের লুসির বড়ো ভয়।

তার সুন্দর ডলপুতুলের মতো মেয়েটার ওপর পরির নজর পড়তে পারে। সে আবার ডাকল, 'ম্যান্ডেলা।' কোনো সাড়া নেই। ম্যান্ডেলাও কথা বলতে পারছে না। তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। এবং এটা ঠিক সময়

নয়। মা ভয় পেলে সে ভারি কষ্ট পাবে। বাড়ির পেছনে সে টুপ করে নেমে এল! পালকটার মজা সে ধরতে পেরেছে। পালকটা যত শক্ত হয়ে থাকবে মাথায়, তত জোরে সে উড়ে যাবে। যত ঢিলে থাকবে তত সে মাটির কাছাকাছি নেমে আসতে পারবে। তারপর সে আরও বুঝল পালকটা আসলে রকেটের মতো কিছু। তার মধ্যে পোরা আছে এমন এক অণুর জগৎ, যার শক্তি অতীব প্রবল। এবং সে আরও বুঝল, ক-দিন ওড়াওড়ি করলে আর বাকি যা অসুবিধা আছে তাও কাটিয়ে উঠতে পারবে। সে নীচে নেমে খুব ভালো মেয়ের মতো বলল, 'আমাকে ডাকছিলে মা।'

'কী অলুক্ষণে কথা। বাড়িতে ঘণ্টা বাজে তুই শুনতে পাস না।'

'কোথায়?'

ফ্রকের নীচে ছোট্ট ঘণ্টা লুকোনো। হাইতিতি পুক পুক করছে। ভাগ্যিস কথা বলতে পারে না। পারলে যেন বলে দিত, 'মা আমরা পাখির মতো উড়ে গেছিলাম। দিদি আমাকে নিয়ে না, টিলি পাহাড়টায় যেতে চাইছিল, আমি বললাম, মা বকবে। যাইনি। দিদিটা আমাকে নিয়ে যেতে চায়।'

ম্যান্ডেলা বলল, 'মারব এক থাপ্পড়। মা না বুঝলেও সে বুঝতে পারে শয়তানটা মাকে লাগানি-ভাঙানি করতে ওস্তাদ। সে বলল, 'মা তুমি ভুল শুনেছ। আমরা তো বাগানে খেলছিলাম। ঘণ্টা বাজলে শুনতে পেতাম না!'

লুসির ভয় গেল না। রাতেও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আকাশে ঘণ্টার শব্দ। কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। লুসি ডেকে ডেকে সারা। বাড়িতে ম্যান্ডেলা নেই। হাইতিতি নেই। আকাশে অপদেবতারা ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। কেবল শিশুরা বলাবলি করছিল, আকাশে একটি ছোট্ট মেয়ে সাঁতার কেটে কোথায় চলে যাচ্ছে। পাশে পাশে ভেসে যাচ্ছে একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা। ছোট্ট বরফের মতো গলায় একটা সাদা ঘণ্টা। বড়োরা বলল, মিছে কথা। ছোটোরা বলল, না সত্যি। ছোটোরা যা দেখতে পায়, বড়োরা তা পায় না।

হানস কেমন বোকার মতো পাথরে হেলান দিয়ে বসেছিল। খুবই বিমূঢ় সে। স্বপ্ন না সত্যি সে এখনও বুঝতে পারছে না। স্বপ্ন ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, এই তো কিছুক্ষণ আগে মেয়েটা তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ক্যাঙারুর বাচ্চাটা দৌড়ঝাঁপ করেছে। নামটাও মনে আছে তার, ম্যান্ডেলা। আর ক্যাঙারুর বাচ্চাটাকে ম্যান্ডেলা ডাকত হাইতিতি। একেবারে তাজা ঘটনা। গার্ডেনার পাখিগুলোকে সে দেখাতে নিয়ে গেছে। কী খুশি! ছোট্ট বালিকা পিঠে তার মুখ গুঁজে বলেছে, 'আমাকে একটা দেবে, পুষব। কী সুন্দর দেখতে।'

সে বলেছে, 'ওরা দুঃখ পাবে। নির্জন দ্বীপটাকে পাখিগুলো ভালোবাসে। এমন সুন্দর দ্বীপ, পৃথিবীর আর কোথাও নেই। লতাপাতা ফুল-ফল কত কিছু আছে। আছে ছোটো পাহাড়-তার উপত্যকা। বিশাল বালিয়াড়ি। সূর্য উঠলে মনে হবে এক অতিকায় পদ্মফুল ফুটে আছে নীল সরোবরে।'

ম্যান্ডেলা বলেছে, 'তাহলে থাক। আমার বাবা জান কোথায় যে হারিয়ে গেল! খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা জাহাজডুবি হলে সবাই মরে যায়?'

হানস প্রবোধ দিয়েছে, 'না না কেউ মরে না। জাহাজডুবিতে কেউ মরে না। সমুদ্র ডানা মেলে দেয় তখন। বড়ো বড়ো ঢেউ তুলে মানুষজনকে কিনারায় পৌঁছে দেয়। কেউ মরে না। আমি তো জাহাজ থেকে পালিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। কী যুদ্ধ- ট্য রে রে রে রা। মেশিনগান দাগল। আমার কিছু হল না। কখন দেখি এই দ্বীপটার বেলাভূমিতে চিত হয়ে পড়ে আছি। মাথার উপর চক্রাকারে অ্যালবাট্রস পাখি, জলে হাজার হাজার ডলফিন। আমার মনে হয় জান, ওরাই আমাকে দ্বীপটায় সেই কবে পৌঁছে দিয়ে গেছে। জাহাজডুবিতে কেউ মরে না। এত সব পাখি আছে, ডলফিন আছে, ওরা মরতে দেবে কেন? তোমার বাবা কোথাও কোনো দ্বীপে আটকা পড়েছেন। ঠিক একদিন দেখবে সকাল বেলা বাড়ি গিয়ে হাজির হবে।'

'সত্যি!'

'সত্যি।'

হানসের স্পষ্ট মনে আছে-ম্যান্ডেলা তার দিকে তাকিয়ে আনন্দে দু-হাত উপরে তুলে লাফিয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'কী মজা হবে না! ওফ ভাবতে পারছি না।' তারপরই মুখ করুণ করে বলেছে, 'জান বাবা না থাকলে মানুষের কিছু থাকে না। পাইন ফেস্টিভ্যাল এলেই আমার কান্না পায়। বাবা হাত ধরে নিয়ে যেত। কত কিছু কিনে দিত, পাতার বাঁশি, কাঠের ঘোড়া, মাটির যিশু, মা মেরি। আর সারাদিন ঘুরে বেড়ানো। বালিয়াড়িতে এসে বাবা আর আমি যখন টিফিন ক্যারিয়ার থেকে খাবার নিয়ে খেতাম-ঃও তখন কীই না মজা! বাবা আমার কী সুন্দর দেখতে ছিল জান। মা না, বাবার জাহাজডুবির পরই কেমন হয়ে গেল! কোথাও যায় না। কেবল রবিবারে গির্জায় যায়। মা মেরির ফটোর নীচে হাঁটু মুড়ে কাঁদে। আমিও মা-র পাশে দাঁড়িয়ে না কেবল কাঁদি। মা কান্নাকাটি করলে আমার কষ্ট হয় না বলো?'

'খোকি কাঁদে! ছিঃ খোকি কাঁদে!'

'যাঃ, তুমি যে কী না! কান্না পেলে কী করব?'

আর তখনই মনে হয়েছিল, তার নিজের ছোট্ট মেয়ের কথা। সব বাবারাই মেয়েদের কথা মনে পড়লে চোখ ঝাপসা করে ফেলে।

হানস কেবল ভাবছিল। কিছুতেই এটা অলীক কিংবা অলৌকিক ভাবতে পারছে না। এই তো কিছুক্ষণ আগেই বলল, 'চলি হানস। সাঁজ লেগে যাচ্ছে। আমাদের তো আবার অনেক দূর যেতে হবে। তুমি তো আমার মামাকে জান না! ভারি রাগী। মা ঠিক ফোনে জানিয়ে দিয়েছে, জান, ম্যান্ডেলাকে খুঁজে পাচ্ছি না। সকালে উঠে দেখি নেই। মা তো জানে না, জাদুকরের পালকের টুপি পেলে, যে কেউ হাওয়ায় ভেসে যেতে পারে, উড়ে যেতে পারে। অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে। জান তো জাদুকর বসন্তনিবাস বলে গেছে, খবরদার তোমায় যে পালকের টুপি, রুপোর ঘণ্টা দিয়েছি কাউকে বলবে না। মাকে না, বাবাকে না, মামাকে না। কাউকে না। আমি কাউকে বলিনি। না, একবার বুঝি বলেছিলাম, তখন জাদুকরকে মনে মনে বললাম, বসন্তনিবাস তুমি আমার দোষ নিয়ো না। আমি তো ছেলেমানুষ, সব ঠিক মনে রাখতে পারি না। আর কাউকে বলব না।'

তারপরই রুপোলি ঘণ্টা দেখিয়ে বলেছিল, 'এটা দিয়েছে হাইতিতিকে। বসন্তনিবাস তো জানে, আমি একা গেলে কোথাও ভয় পেতে পারি। ক্যাঙারুর বাচ্চাটা থাকলে ভয় পাব না।'

আকাশে একটা-দুটো করে নক্ষত্র ফুটতে শুরু করেছে। হানস উঠে দাঁড়াল। সারাটা দিন সে কেমন ভূতুড়ে কাণ্ড করে বেড়িয়েছে। মেয়েটাকে নিয়ে সরোবরে স্নান করেছে। সে যে তার মেয়ের জন্য একটা পাতার পোশাক বানিয়েছিল, ম্যান্ডেলাকে তা পরতে দিয়েছে। দু-জনে সাঁতার কেটেছে অনেকক্ষণ ধরে। অথচ তার কেন জানি এখন মনে হয় সবটাই মনের ভুল। সে এই দ্বীপে উঠে আসার পর, কতদিন পাহাড়ের মাথায় বসে থেকেছে, যদি দূরে কোনো জাহাজ দেখতে পায়। না কোনো জাহাজ, না কোনো জেলেডিঙি।

কিন্তু সব বৃথা। কারণ দ্বীপটার কথা বোধ হয় কেউ জানে না।

বছরের পর বছর এই করতে করতে সে কখন দ্বীপটাকে ভালোবেসে ফেলেছে নিজেই জানে না। দ্বীপে অসংখ্য কচ্ছপের ডিম। চিংড়ি, সারডিন মাছ পুড়িয়ে খেলেই হল। খাওয়ার কষ্ট নেই, জলের কষ্ট নেই, উত্তরে বিশাল বালিয়াড়ি, আর তার আশ্চর্য সব ক্যাকটাস, তারপর উপত্যকা সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উঠে গেছে। অনেক উঁচুতে উঠে, সমুদ্রের কাছে খাড়া নেমে গেছে। তখন কাজই ছিল তন্নতন্ন করে খোঁজা দ্বীপটায় আর কী আছে! উপত্যকার পরেও কিছু থাকতে পারে, ডানদিকে বালিয়াড়ি কিছুদূর পর্যন্ত। সেখানে সে ঝোপের মতো কিছু গাছপালা দেখতে পেয়েছিল। ওদিকটায় যেতে হবে কী করে জানে না। কারণ দ্বীপটার একটা দিক মরুভূমির মতো, অন্য দিকটা গাছপালায় ভরতি। মাঝখানে একটা ঢিবির মতো পাহাড়। সমুদ্রে নেমে সাঁতার কেটে ওদিকটায় যেতে পারে। কিন্তু একবার যে সমুদ্রে ভেসে যায়, পরে তার কাছে সেটা খুব সুখকর মনে হয় না। সে সাহস পায়নি। আর একদিন আশ্চর্য, সে উপত্যকার ভিতর দিয়েই একটা পথ পেয়ে গেল। দূর থেকে মনে হয়, ওটা একটা পাথরের দেয়াল। খাড়া পাথরের দেয়াল ভেবে ওদিকটায়

যায়নি। একদিন, তার সহসা মনে হয়েছিল, একবার ওটার কাছে গিয়ে দেখা যাক-সে গেল আর দেখতে পেল আড়াআড়ি দুটো দেয়াল। দেয়ালটার ফাঁকে মানুষ গলে যাবার মতো দরজা। সেখানে ঢুকে সে অবাক! সেখানে এক সবুজ বনভূমি, পানীয় জলের ফোয়ারা, সুস্বাদু মিষ্টি জলের হ্রদ। আর কতকালের সব প্রাচীন বৃক্ষ।

এই বনভূমিতে বিচরণ করতে করতে সে তার বাড়ির কথা ভুলে গেল। স্ত্রীর কথা ভুলে গেল। ছোট্ট মেয়েটির কথাও ভুলে গেল। সে সব প্রাচীন বৃক্ষকে বলত, 'যুদ্ধবাজ মানুষদের তুমি ক্ষমা কোরো না।'

সে সরোবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে বলত, 'তুমি যুদ্ধবাজ মানুষদের ক্ষমা কোরো না।'

আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্র, গাছ-লতাপাতা, পাখি, ফুল যা তার চোখের সামনে পড়ত, তাদের উদ্দেশ্যে বলত, 'তোমরা যুদ্ধবাজ মানুষদের ক্ষমা কোরো না। আমি যুদ্ধ করতে চাইনি। আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে তারা। যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে। সুদূর ইথিওপিয়ায় পাঠিয়ে দিল জাহাজে। কামানের গোলার সামনে সেই ধ্বংসস্তূপ, মানুষের কান্না, শিশুর পচা-গলা দেহ, ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে একটা হাত আকাশের দিকে তোলা-সব আমি দেখে কেমন ঘাবড়ে গেছিলাম। তারপর ডেজার্টার। এখনও তাই আছি। যুদ্ধবাজরা আমায় ছোট্ট খামার বাড়ি থেকে উৎখাত করে দিল। তোমরা যুদ্ধবাজদের ক্ষমা কোরো না।'

এই ছিল তার শুধু একটিমাত্র কথা।

তার একটাই পোশাক। রোদে শুকাত। বৃষ্টিতে ভিজত। এক জোড়া জুতো, রোদে শুকাত, বৃষ্টিতে ভিজত। সে এই পরে শুয়ে থাকত গাছের নীচে। কোনো আচ্ছাদন নেই। কত ঝড়-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার নামে সে প্রাচীন বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকত। সে ভুলেই গেছিল, মানুষ আচ্ছাদন তৈরি করতে পারে। পাখিরা যখন বাসায় খড়কুটো নিয়ে আসত, সে বসে বসে অপলক দেখত। এতে করে সে নিজের মাথার আচ্ছাদন, আশ্রয় গড়ে তোলার প্রেরণা পেল। তখন তার শরীর থেকে যুদ্ধের সেই মলিন পোশাক ধীরে ধীরে খসতে শুরু করেছে। ফাটাফুটা কিছুটা আছে, বাকিটা হাওয়ায় উড়ে গেল একদিন। কোমরে কিছুটা লেগে থাকল, তাও এক দুপুরে উড়ে গেল, ঝোড়ো হাওয়ায়।

ততদিন সে এই দ্বীপের সব গাছ লতাপাতার সন্ধান পেয়েছে। শীতের রাতে ভারি কষ্ট। কচ্ছপের খোলে চর্বি জমিয়ে রাখত। শুকনো লতা ফেলে সলতের ব্যবহার শিখে গেল। আগুন জ্বালিয়ে সে শীতের ঠান্ডায় আত্মরক্ষার উপায় খুঁজল। ঝুপড়িমতো গাছের অতিকায় পাতা শুকিয়ে রাখলে টের পেল, চামড়ার চেয়েও তারা শক্ত। জুড়ন গাছের আঠা দিয়ে বাহারি পাতায় সে নিজের জন্য একটা পোশাকও বানিয়ে ফেলল। সেই থেকে সে ওই পোশাকটাই পরে থাকে।

কারণ তার আগেকার অস্তিত্ব বলতে আর কিছু নেই। সে দ্বীপের গাছপালার মতো একজন।

সে সব ভুলে গেছিল। কারণ কতকাল সে এখানটায় আছে জানে না।

পাহাড়ের খাঁজে উড়ে আসে অসংখ্য পাখি, বাসা বানায়। একদিন একটা বাসা কী করে ঝড়ে উড়ে এসে একটা কচ্ছপের খোলে পড়ে গেল। সরোবরটা বেশ দূরে। বয়স হয়ে গেছে। অতদূর থেকে জল আনতে কষ্ট হয়। একটা অতিকায় গাছের ডালপালার মধ্যে সে নিজের ডেরা বানিয়ে রেখেছে। নীচে সমুদ্রের বালিয়াড়ি থেকে কুড়িয়ে আনা অতিকায় ঝিনুক অথবা কচ্ছপের খোল সব সাজানো। তাতে বৃষ্টির জল জমে থাকে। পাখির একটা বাসা সেই জলে পড়ে গেল। আর দেখল নিমেষে সেই সুন্দর বাসাটা জলে গলে গেল। সে তো অবাক!

এমন কেন হয়!

নাকের কাছে এনে দেখল, সত্যি গলে গেল না জলে ডুবে গেল। নাকের কাছে নিয়ে আসতেই সে মিষ্টি এক ঘ্রাণ পেল! কৌতূহল মানুষের আজন্ম। জিভে জল ঠেকাতেই দেখল, ভারি সুস্বাদু। স্যুপের মতো খেতে। ভয়ে ভয়ে একটু খেল। বাকিটা রেখে দিল। অসুখবিসুখের ভয়। শত হলেও একা মানুষ!

সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছিল-আগের মতো কচ্ছপের ডিম কিংবা চিংড়ি অথবা সারডিন মাছ পুড়িয়ে খাবার শক্তি লোপ পাচ্ছিল। কিন্তু সামান্য এক ঢোক স্যুপের মতো পানীয় খেয়ে আশ্চর্য শক্তি সঞ্চয় করছে শরীর। তার শরীরে আগেকার দুর্বলতা নেই। অতদূর হেঁটে সমুদ্রের ধার থেকে চিংড়ি, কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করারও দরকার হবে না। সামান্য এই স্যুপ খেয়ে সে কেমন তেজি ঘোড়া হয়ে গেল। সেই থেকে আর সে কোনো প্রাণীই বিনষ্ট করে না যেন এটাও এক পাপ। দু-চারটে পাখির বাসা কুড়িয়ে আনলে তার হপ্তা চলে যায়। সে তার খাবার অন্বেষণের জন্য আর সারাটা দিন দ্বীপের চারপাশে ঘোরাফেরা করে না। বরং এই দ্বীপ এবং তার গাছপালা, পাখি প্রজাপতি দেখে দেখে, সে একটা প্রাচীন সচল বৃক্ষ হয়ে গেছিল। গায়ে পাতার পোশাক। জোব্বার মতো লম্বা। ওটা ছেঁড়ে না। নষ্ট হয় না। বৃষ্টিতে ভেজে না। রোদে শুকোবার দরকার হয় না। আর তখনই কিনা ভূতুড়ে কাণ্ড-ছোট্ট মেয়ে ম্যান্ডেলা এসে তার কাছে হাজির। সে তার বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছে জাদুকরের পালকের টুপি সম্বল করে!

হানস বুঝেছিল, পাখির বাসাগুলি খড়কুটো দিয়ে তৈরি নয়। এ এক রকমের পাখি, ডিম পাড়ার সময় হলে মুখের লালা দিয়ে তারা বাসাগুলি বানায়। পাহাড়টার গায়ে অজস্র খোঁদল। এই সব খোঁদলে তারা বাসা বানায়। ডিম পাড়ে। বাচ্চা ফুটে বের হলে সে ছানাগুলিকে পাখিদের সঙ্গে লালনপালনেও সাহায্য করে। অতিকায় অ্যালবাট্রসদের দৌরাত্ম্য বাড়ে। ছানা-পাখি উড়তে গেলেই উড়ে এসে গপ করে গিলে ফেলে। তখন কাজ তার বড়ো একটা লম্বা বাঁশ নিয়ে অতিকায় অ্যালবাট্রসদের তেড়ে যাওয়া। এত সব কাজ থাকে বলেই সে নিঃসঙ্গ বোধ করে না। আরও কত কাজ থাকে, কচ্ছপেরা বালিয়াড়িতে ডিম পেড়ে যায়। সমুদ্রের ঢেউ এসে বালি আলাদা করে দেয়। ডিমগুলি ভেসে ওঠে। পাখিরা উড়ে আসে খেতে। তার কাজ তখন ডিমগুলো সযত্নে আরও উপরে তুলে নিয়ে মাটি সরিয়ে সেগুলো রেখে দেওয়া। মাটি চাপা দেওয়া এবং কখন আবার কচ্ছপটা উঠে আসবে সেই আশায় বসে থাকা। কচ্ছপেরা ডিমের উপর বসে তা দিতে ভালোবাসেন। শত হলেও সব সন্তানসন্ততি-কার না মায় হয়! তবু তারা ডিমে তা দেয় না।

কখনো দেখতে পায়, বাচ্চা ডলফিন বালিয়াড়ির উপরে এসে পড়ে আছে। বড়ো বড়ো সব তরঙ্গমালা আছড়ে ফেলে দিয়ে যায় তাদের ডাঙায়। তার কাজ তখন আবার ওগুলোকে সমুদ্রে নামিয়ে দিয়ে আসা।

আবার কখনো দেখতে পায় দ্বীপের কোনো গাছের মাটি সরে গেছে। যে কোনো সময় সমুদ্রের জলে ভেসে যেতে পারে। তখন তার কাজ বড়ো বড়ো পাথর গড়িয়ে এনে গাছটার গোড়ায় ফেলে রাখা। ঢেউ আর তখন গাছের শেকড়বাকড় আলগা করে দিতে পারে না।

গ্রীষ্মে ক্যাকটাসে ফুল আসে। সব রংবেরঙের ক্যাকটাস। আশ্চর্য সুঘ্রাণ মধুর ভাণ্ডার ফুলগুলোয়। এ সময়টাতে তার কাজ বড়ো বড়ো ঝিনুকে মধু সংগ্রহ করে রাখা। অতিকায় সব ঝিনুকের খোলে থাকে বড়ো মুক্তো। সেসবও সে জেব ভরতি করে আস্তানায় নিয়ে যায়। ওগুলো তার কাছে কোনো মূল্য ধরে না। বিকেল বেলায় সে বালিয়াড়িতে বসে মুক্তো দিয়ে মার্বেল খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সাঁজ লাগলে পাথরের দেওয়াল ভেদ করে বনভূমিতে ঢোকে। অতিকায় ডালপালার মধ্যে তার আস্তানা। এত প্রশস্ত যে সে ডালগুলোকে বেঞ্চের মতো ব্যবহার করতে পারে। ঝড়-বৃষ্টি না হলে, সে ডালে শুয়ে থাকে। কোনো হিংস্র প্রাণী নেই দ্বীপটায়। একটা কাঠবিড়ালিও সে দেখেনি। মাকড়সা আছে সব অতিকায়। প্রথম মনে হয়েছিল, বিষাক্ত মাকড়সা, পরে সে হাত দিয়ে বুঝেছে, ওরা বড়োই নিরীহ।

সুতরাং সে রাত হলে টের পায় অজস্র তরঙ্গমালা তার চারপাশে গর্জন করছে। আকাশে এক বড়ো থালার মতো চাঁদ ঝুলে থাকে কখনো। কখনো গভীর সমুদ্রে তিমি মাছের ঝাঁক হাজির, টের পায় সে। গাছের উপরে উঠে গেলে দেখতে পায়, তারা আপন মনে পাহাড়ের ওদিকটায় ভেসে বেড়াচ্ছে। সে একদিন একটা তিমিকে দেখেছিল কিছুটা ডাঙায় কিছুটা জলে পড়ে আছে। সারাটা দিন সে তিমিটাকে ভয় দেখিয়েছে-কাছে যেতে সাহস পায়নি, কিন্তু মাছটা লেজ নাড়ছে। অতিকায় লেজ তুলে তোলপাড় করছে, কিন্তু নড়তে পারছে না। সে বুঝতে পারছিল না কিছু। অদূরে ঝাঁকের তিমিরা কেমন পাগলের মতো হানা দিচ্ছে এদিকটায়। মাছটাকে নামিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কী যে রহস্য, তিমি মাছেরা কি ডাঙার কাছে এসে বাচ্চা দেয়! সে কিছুই জানে না তিমি মাছ সম্পর্কে। লেজের দিকটায় যেতে পারলে দেখা যেত কিছু। সে সেদিনই ভেবেছিল, তার একটা ভেলার দরকার। গাছের গুঁড়ি কেটে দু-তিন দিনের মধ্যে লতা জড়িয়ে ছোট্ট ভেলা বানিয়ে লেজের দিকটায় যেতেই অবাক। একটা বিষাক্ত হারপুন বিঁধে আছে। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। সে জীবনের মায়া না করে লেজের কাছটায় এগিয়ে গেল। যেকোনো সময় লেজের বাড়ি মারলে তার ভেলা ছত্রখান হয়ে যাবে। তার হাড় নড়বড়ে হয়ে যাবে। এসব জেও তিমি মাছটার কষ্টের কথা সে ভুলতে পারেনি। খুব সতর্ক সে। লেজের দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছিল বলে তাকে দেখতে পাচ্ছে না। সে কোনোরকমে হারপুনের দড়িটার নাগাল পেয়ে গেলেই ওটা টেনে আনল। তারপর ডাঙায় উঠে হ্যাঁচকা টান মারতেই হারপুনটা খুলে গেলে সে ছিটকে পড়েছিল বালিয়াড়িতে। তারপর ভেবেছিল এবার বোধ হয় চলে যাবে। কিন্তু এ কী, লেজটা উপরে তুলতেই দেখল ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। সমুদ্রের জল লাল হয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারল ক্ষতস্থানে ক্যাকটাসের মধু দিতে পারলে আরাম পেত মাছটা। দু-একবার তার পড়ে গিয়ে হাত পা ছড়ে গেছে। মধু বড়ো কার্যকরী ওষুধ।

কিন্তু মাছটার লেজের কাছে যায় কী করে!

হানস খুবই চিন্তায় পড়ে যায়।

লেজটার কাছে যাওয়া যাবে না। গেলেও ক্ষতস্থানটা তার দু-মাথা সমান উঁচু। নাগাল পাবে না। অথচ ওর মনে হচ্ছিল বিষ ছড়িয়ে পড়ছে গায়ে। আর দু-চারদিন গেলে মাছটা মরে যাবে। সে তখন আর কী করে! তার নাওয়া-খাওয়ার কথা মনে থাকে না।

এত বড়ো প্রাণী, ওফ! যেন বালিয়াড়ির অর্ধেকটা জুড়ে পড়ে আছে। সে ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা টের পায়। এইসব গ্রহ-নক্ষত্রমালায় মানুষের আবাস আর কোথায় সে জানে না, কিন্তু তার এই পৃথিবীটা বড়ো সুন্দর। দ্বীপটা আরও সুন্দর। জীবজন্তু পাখি প্রজাপতি লতাপাতা গাছ সবই আশ্চর্য সুষমার প্রকাশ তাঁর। অতিকায় তিমি মাছটার মৃত্যু চোখের সামনে দেখতে হবে, ভাবতে গিয়ে কেন জানি তার চোখে জল এসে গেছিল।

সে তার ভেলায় তুলে নিল বড়ো বড়ো কচ্ছপের খোলা। এগুলো সবই তার মধু রাখার ভাণ্ড। ঝিনুক ভরে গেলে মধু সে কচ্ছপের খোলে তুলে রাখে-আসলে সঞ্চয়, কারণ একবার তার মনে আছে অনাবৃষ্টির ফলে ক্যাকটাস গাছগুলিতে একটাও ফুল আসেনি। আর এই মধুর কী আশ্চর্য গুণ, সে তো আজও তা চোখের সামনে দেখেছে।

ম্যান্ডেলার পালকের টুপি ছুটোছুটিতে হারিয়ে গিয়েছিল।

ম্যান্ডেলা ভেবেছিল, এটা হানসেরই কাজ।

হানস যত বলে, 'সত্যি আমি জানিই না, তোমার পালকের টুপি আছে,' সে মানতে চায় না।

ম্যান্ডেলা বলেছিল, 'তুমি আর এক জাদুকর।'

তা তাকে জাদুকর ভাবতেই পারে। কারণ সে পরে আছে লম্বা পাতার পোশাক, মাথায় লম্বা পাতার টুপি, আর সে দ্বীপটায় এমন এক আশ্চর্য সুন্দর পরির মতো মেয়েকে দেখে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও পরে ভেবেছে ঈশ্বরের করুণার তো শেষ নেই। হতেও পারে, মেয়েটা ঈশ্বরের করুণা লাভ করে বাতাসে ভেসে যেতে পারে, উড়ে যেতে পারে। উড়ে উড়ে এই দ্বীপটায় চলে এসেছিল, তার নিখোঁজ বাবাকে খুঁজতে।

হানস খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, ঈশ্বরের করুণার কথা ভেবে। সে তার বাঁশিটা জেব থেকে বের করে প্রথমে নাচতে থাকল। বাঁশিটা বাজতে থাকল-ম্যান্ডেলা জানে না, এ বাঁশির সুরের কী মহিমা, সে তো জানে না, ঈশ্বর সবাইকে কিছু না কিছু দেয়। সেটা ঠিকঠাক রাখাটাই বড়ো কথা।

ম্যান্ডেলা সহসা কী দেখে অবাক। মূর্ছা গেল।

বাঁশির মহিমার কথা আগে তার বলা উচিত ছিল। ম্যান্ডেলা জানবে কী করে বাঁশির সুর শুনে সব পাখি প্রজাপতি উড়ে আসে। সব গাছপালা মাথা দোলায়। গার্ডেনার পাখিগুলো তার চারপাশে লাফায়। আর সমুদ্রের প্রাণীরাও ভেসে আসতে থাকে। সারডিন মাছ, ম্যাকরোল মাছ, আরও কত বিচিত্র রঙের মাছেরা আসে ভেসে। ডলফিনের ঝাঁক, দুটো একটা অতিকায় সানফিস। দেখতে বড়োই কুৎসিত। তা ওদের এজন্য দোষ দেওয়া যায় না। ঈশ্বরের করুণাতেই ওরা দেখতে কুৎসিত মানুষের কাছে। ম্যান্ডেলা বাঁশির সুরে কখন নাচতে নাচতে অদূরে অতিকায় সানফিস দেখেই মূর্ছা। হানস ক্যাকটাসের ফুল থেকে আঙুলে মধু তুলে খাওয়াল, আবার যে কে সেই। কে বলবে, ম্যান্ডেলা মূর্ছা গেছিল। মধুতে আছে এমনই এক সঞ্জীবনী সুধা।

হানস ভেলায় করে নিয়ে গেছিল সেই সঞ্জীবনী সুধা। কেন যে তার মনে হয়েছিল, ঈশ্বরের এটা ইচ্ছা। না হলে একটা তিমি মাছের মৃত্যুর কথা ভেবে তার চোখে জল আসবে কেন। সে নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে ভেবেও কচ্ছপের খোলা-ভরতি মধু নিয়ে গেছিল। লম্বা একটা কোটা। তার ডগায় কার্পাসের তুলো। মধুতে ভিজিয়ে সেই কার্পাস তুলো ক্ষতস্থানে এঁটে দিতে পারলে ওর কেন জানি মনে হয়েছিল, তিমি মাছটার মধ্যে বিষক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

সে ভেলায় চড়ে সমুদ্রের দিক থেকে এগিয়ে গিয়েছিল। খুব সন্তর্পণে লেজটা থেকে গজ দশেক দূরে ভেলাটা থামিয়ে ছিল। কিন্তু যা ঢেউ তাতে করে খোলে মধু রাখা যাচ্ছে না। সব পড়ে যাচ্ছে। কী যে করে! কোনোরকমে এক গোছা কার্পাস মধুতে ডুবিয়ে নিয়ে দণ্ডটা মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে থাকল। ভেলা উলটে গেলেও সে দণ্ডের মাথায় যে মধুতে ভেজানো কার্পাস আছে তা নষ্ট হতে দেবে না। ভেলাটার দু-পাশে ভারী পাথর ঝোলানো। ঢেউয়ে খুব বেশি একটা কাবু করতে পারছে না। জল কোমর জলের কাছাকাছি। সে ভেলা থেকে নেমেই গেল। কারণ ভেলা উলটে যেতেই পারে। তবে দড়ি টেনে হারপুন খোলা যত সহজ, কাছে গিয়ে ক্ষতস্থানটায় মধু লাগানো তত সহজ কাজ নয়। আর কাছে যেতেই মনে হয়েছিল, ভেলা সে ঠিক রাখতে পারবে না। যতটা মধুর দরকার কার্পাসে ভিজিয়ে নিয়েছে। লেজটা জল থেকে খানিকটা তুললেই মধু ভেজানো কার্পাস সেখানে বসিয়ে দেওয়া। কিন্তু আশ্চর্য সে যত কাছে ভেলা টেনে এগিয়ে যাচ্ছে, মাছটা তত কেমন নিরীহ শান্ত হয়ে যাচ্ছে। হায় মরে যাচ্ছে না তো। সে তার জীবন উপেক্ষা করে আরও কাছে এগিয়ে গেল। একেবারে কাছে। আর কাছে যেতেই দেখল মাছটা তার লেজ জলের উপর তুলে দিয়েছে। মাছটা কি বুঝতে পেরেছে, সে তার ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগাতে এসেছে। সে প্রায় হাতেই চেপেচুপে ক্ষতস্থানটা কার্পাস ভেজানো মধুতে আটকে দিয়েছিল। এবং সে জানে, এটা এমন সঞ্জীবনী সুধা, একবার ঘায়ে বসে গেলে আর

খসবে না, ঘা-টা নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত খসে পড়বে না। মাছটা বেঁচে যাবে। ভাবতেই সে সেদিন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল।

ভেলাটায় উঠে আসার সময় আবার কেন জানি মনে হয়েছিল, হারপুনের বিষক্রিয়া সামান্য মধুতে নষ্ট হবে কেন! আসলে সে মনে মনে চায় নষ্ট হোক। তার বিশ্বাস, মন যখন ভেবেছে, নির্ঘাত মাছটা নিরাময় না হয়ে যায় না। তা ছাড়া সে তো সবই তাঁর করুণার কথা ভেবে করে। তার মনে যে চিন্তাটা এসেছে, এও তাঁর করুণা ছাড়া কী! তাঁর ইচ্ছে না হলে মাছটা ওষুধ লাগাবার জন্য লেজটা কখনো এগিয়ে দিত না।

আর সেদিন সে সারাদিন বালিয়াড়ির একটা পাথরে বসেছিল। একটা মাছ আর সে। কারণ সে যতই তার শুভ বোধ থেকে কাজটা করে আসুক, এত বড়ো প্রাণীর বিষক্রিয়া নষ্ট হবে ভাবতে গিয়ে মাঝে মাঝে কেমন হতাশ হয়ে পড়ছে। যদি না হয়! সিন্ধু শকুনেরা উড়ে আসতে শুরু করবে তবে। না, চোখের সামনে এমন নিষ্ঠুর দৃশ্য সে সহ্য করতে পারবে না।

সে মাছটার মঙ্গলার্থে দু-দিন উপবাস করল।

সে মাছটার মঙ্গলার্থে, চর্বিতে লতা ডুবিয়ে বালিয়াড়িতে রেখে দিল। গাছের লতাটা সলতের কাজ করে। সলতেয় আগুন ধরিয়ে সে দেবদূতদের বলল, তোমরা প্রভুকে বলো, মাছটা যেন নিরাময় হয়। মাছটা যেন তার সেই সমুদ্রের তলদেশে, গভীর নীল অন্ধকার জলরাশির মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে। সেখানে তার সন্তানসন্ততিরা আছে। আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠী সব।

হানস দেবদূতদের তুষ্ট করার জন্য এভাবে কচ্ছপের পাত্রে সারারাত আলো জ্বালিয়ে রাখল। সে নড়ল না। উপবাস, ক্লান্তিতে শেষ রাতের দিকে তার দুই চোখে কখন ঘুম লেগে এসেছিল। তখনই দু-জন দেবদূত ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'হানস ওঠো। মাছটা চলে যাবে। সে তোমার কাছে বিদায় নিতে চায়।' তারপর দেবদূত দু-জন অদৃশ্য হয়ে গেলে তার ঘুম ভেঙে গেল। সকাল হয়ে গেছে। দেখতে পেল সেই অতিকায় তিমি মাছটা জলে-ডাঙায় আর পড়ে নেই। একটু দূরেই গভীর সমুদ্র, সেখানে সে ভেসে আছে। লেজের ক্ষতস্থানে সাদা কার্পাস নীল জলরাশির মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। সে দাঁড়াতেই মাছটা তার দিকে মুখ করে ভেসে থাকল। সে যে ভালো হয়ে গেছে দেখানোর জন্য জলের মধ্যে দ্রুত ভেসে গিয়ে ফিরে এল। তারপর জলের উপরে অনেকটা লাফিয়ে উঠল। অর্থাৎ সে নিরাময় হয়ে গেছে। দেবদূত দু-জন এসে তাকে ঠিক খবরই দিয়ে গেছে তবে।

সেদিন নির্জন দ্বীপে একা দাঁড়িয়ে হানস কেন হাউহাউ করে কেঁদেছিল, তার ব্যাখ্যা আজও সে পায় না।

দেবদূতরা আছে। হানসের এটা বিশ্বাস।

ম্যান্ডেলাও আছে। ম্যান্ডেলা বলে গেছে, 'আমি যাচ্ছি। তুমি কান্নাকাটি করবে না হানস। কান্না আমার একদম ভালো লাগে না। একটা সাদা জাহাজ আসবে তোমাকে নিতে, তাতে করে দেশে চলে যেয়ো কিন্তু।'

সে এবার হাঁটা দিল তার আস্তানার দিকে।

আকাশে নক্ষত্র ফুটে আছে অজস্র। ওর কেন জানি মনে হল, কোনো একটা নক্ষত্রই নেমে এসেছিল এই দ্বীপটায়। সারাদিন একটা ছোটো মেয়ে হয়ে খেলা করে গেছে তার সঙ্গে। সঙ্গে হাইতিতি। আশ্চর্য, মাঝে মাঝেই দেখেছে, চোখের উপর থেকে ওরা কেমন নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি। ভূতুড়ে কাণ্ড ভেবে দৌড়েছিল। কিন্তু একী, দেখে সামনে আবার ম্যান্ডেলা, হাইতিতি-তার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। সকালটা এভাবে বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কেটেছে। তারপর ম্যান্ডেলা পালকের টুপি আর হাইতিতির রুপোলি ঘণ্টা খুলে দেখাতেই অবাক। ওটা খুলে ফেললেই তাদের দেখা যায়। ওটা পরলেই তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। জাদুকর বসন্তনিবাস ফিরে গেছে। জাদুকরেরা সব পারে। সে ছেলেবেলায় জাদুকরের গল্প শুনেছে। তা বড়ো জাদুকর সব আছে পৃথিবীতে। বিশেষ করে ইন্ডিয়া নামে একটা দেশে। সেখানকার জাদুকরেরা পারে না হেন কাজ নেই। পাখিকে পরি বানিয়ে দিতে পারে। পরিকে পাখি। ওরা মানুষকে শিল নোড়া বানিয়ে রাখতে পারে। থলের মধ্যে পুরে রাখতে পারে। ছেলেবেলা

দুষ্টুমি করলেই, মা ভয় দেখাত, 'ওই আসছে, দেখবি কান্নাকাটি করলে, তোকে হনুমান বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবে।' ভারতীয়রা এ ব্যাপারে, সবচেয়ে বেশি ওস্তাদ লোক। কোনো এক ভারতীয় জাদুকরই নাকি, পালকটা দিয়ে গেছে ম্যান্ডেলাকে।

তারপর বন্ধুত্ব, সরোবরে স্নান, হাইতিতির খাবার ভাবনা ছিল না। একটা আনারস-ক্যাকটাস সব সময় বগলে নিয়ে ঘুরেছে। খেতে খুবই সুস্বাদু।

সেই ম্যান্ডেলাই মনে করিয়ে দিয়েছিল যাবার সময়-'হানস তোমর মেয়ের নাম রোমি?'

সে অবাক হয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'তোমার গাঁয়ের নাম, ওবের আমের গাও?'

'হ্যাঁ।'

'সব দেখছি গাছটায় লিখে রেখেছ।'

তাইতো! সে ভুলেই গিয়েছিল, সেই প্রথম দিকে, হারপুনের ডগা দিয়ে গাছটার কাণ্ডে লিখে রেখেছিল, নিজের নাম, হানস ওটো। মেয়ের নাম, রোমি। গাঁয়ের নাম ওবের আমের গাও। নদীর নাম-রাইন। মেয়ের কথা মনে হতেই ঝরঝর করে চোখের জলে ভেসে গেছিল সে। কতকাল আগে লেখা। গাছটার মাথায় তার থাকার আস্তানা। সে রোজ সকাল হলে, নীচে নেমে আসে। বনভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। পাখি প্রজাপতি দেখে। ওরা তাকে ভালোবাসে। সে বের হলেই তারা উড়তে থাকে তার মাথার উপর। সে বসে থাকলে, প্রজাপতিরা তার গায়ে এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। তখন তাকে একটা বিচিত্র জীব মনে হয়। মনে হয় সে মানুষ না। একটা বুনো ঝোপ। ঝোপের পাতায় ডালে প্রজাপতিরা বসে আছে। সে উঠে দাঁড়ালে ওরা উড়তে থাকে। সারা গায়ে লাল নীল হলুদ বর্ণমালায় সে কোনো আদিবাসী হয়ে যায়। জলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে দেখতে পায় সে আর হানস ওটো নয়। দ্বীপের কিংবা বনভূমির দেবতা সে। কারণ মানুষের শরীরে এত বিচিত্র রং কে কবে দেখছে! রোদ উঠলে, কিংবা জ্যোৎস্নায় সারা শরীর তার রঙের বাহারে ঝিকমিক করতে থাকে।

এসবই তার দ্বীপটায় বেঁচে থাকার উপকরণ। মজার মজার খেলা আছে তার। কখনো মৃত ঝিনুকের মাংস সংগ্রহ করে একটা পাথরে চুপচাপ বসে থাকে। মাংসের গন্ধে সিন্ধু শকুনেরা উড়ে আসে। সে এক-এক টুকরো বাতাসে ছুড়ে দেয়। ওরা দূর থেকে উড়ে এসে ঠোঁটে লুফে নেয়। এই দ্বীপটায় সারাদিন এভাবে কাটিয়ে দিতেও তার মজা লাগে।

কিন্তু প্রথমে দ্বীপটায় উঠে এসে কী একাকী আর নিঃসঙ্গ মনে হত! জীবনেও সে আর তার গাঁয়ে যেতে পারবে না। দেশে যেতে পারবে না। এমন একটা অজানা নির্জন দ্বীপে কোনো মানুষ পালিয়ে আছে কে বিশ্বাস করবে। তখনই কিছু ভালো না লাগলে হারপুনের ডগা দিয়ে অতিকায় গাছটার কাণ্ডে লিখে রেখেছিল, নিজের নাম, বাড়ির নাম, গাঁয়ের নাম, নদীর নাম। সব শেষে লিখেছিল, আমার মেয়ে রোমি। গাছের গায়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে সে লিখেছে। একটা অক্ষর লিখতেই কোনো দিন তার সারাটা সকাল কেটে গেছে।

ম্যান্ডেলা এসে আজ আবার সব মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

অথচ আগের দিকে, সকাল হলেই একবার গাছটার কাণ্ডের সামনে এসে দাঁড়াত। লেখাগুলি পড়ত। চোখ তার ঝাপসা হয়ে উঠত। সে তখন যুবক। মাথায় তার সোনালি চুল। শক্ত মজবুত মানুষ সে। যুদ্ধের দিনগুলির বিভীষিকার কথা ভাবলেই সে কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। রাগে দুঃখে ক্ষোভে সে তার মাথার চুল ছিড়ত। সেই ধূর্ত সেনাপতিকে পেলে সে তার গলা কামড়ে ধরত। তারা ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে আফ্রিকার উপকূলে। ট্যাঙ্ক গুলিগোলা, বারুদের গন্ধে তারা কেমন পাগল হয়ে যেত। নির্বিচারে শহরের পর শহর ধ্বংস করে, মৃতের উপর দিয়ে ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। আর বিজয় উল্লাস।

সে একদিন শুধু একটি শিশুর হাত দেখেছিল।

আর কিছুই দেখা যায় না।

ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে শিশুটি আকাশের দিকে হাত তুলে দিয়েছে।

সে নতজানু হয়ে বসেছিল।

ঠান্ডা মৃত হাত।

'রোমি!' বলে সে চিৎকার করে উঠেছিল।

তারপর কী হল কে জানে! ছাউনিতে ফিরে, সে সব ছুড়ে ফেলে দিল। প্রায় উলঙ্গ হয়ে হাঁটা দিল কাঁটাতারের বেড়ার দিকে। যুদ্ধে এসব হয়। জেনারেলরা জানেন। কিছু লোক তাকে জোর করে তুলে নিয়ে ঘরে আটকে রাখল।

এ-সব কবেকার কথা! ম্যান্ডেলা বলে গেছে, একটা সাদা জাহাজ আসবে। তাকে জাহাজটা দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কত যুগ আগে যেন ঘটনাটা। সে নিজের দিকে তাকাল। চর্বির সলতের আগুন জ্বলছে। আলোতে হাতের চামড়া দেখে বুঝল সে সত্যি খুব বুড়িয়ে গেছে। সে এখন তার ঠাকুরদার বয়সি মানুষ। এই দ্বীপটায় সে যৌবনে এসেছিল-এখন তার এটা মনে পড়ছে।

যদি সত্যি সাদা জাহাজটা আসে। তার তো সব মনে আছে। কোন বন্দরে নামলে, কোন ট্রেনে বাড়ি ফেরা যাবে। কোন স্টেশনে নেমে সে একটা বাসে ব্ল্যাক ফরেস্টের কাছাকাছি এক গাঁয়ে নেমে যাবে। সেখান থেকে হাঁটা পথে ঘণ্টা খানেক। গির্জার ফাদার তাকে দেখলেই, কত খবর নিতেন। তার চাষ-আবাদের খবর, রোমির খবর, স্ত্রী মারিয়ার খবর। সব খবরের পর হাত তুলে বলতেন, 'ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। তুমি সুখী হও।'

আলোর দিকে তাকিয়ে আছে হানস। ওর চোখ দুটো জ্বলছে।

সাদা জাহাজটা এলে তার সঙ্গে নেবার মতো কিছু নেই। কেবল রোমির জন্য যে পাতার পোশাকটা বানিয়েছিল, সেটা দ্বীপের পাখি প্রজাপতির কাছ থেকে চেয়ে নেবে। তারা নিশ্চয়ই অনুমতি দেবে।

তার হাই উঠছিল।

সারাটা দিন সে আর ম্যান্ডেলা এই দ্বীপে দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে। সে ম্যান্ডেলাকে নিয়ে গার্ডেনার পাখিদের দেখাতে নিয়ে গেছিল। একটা বড়ো কোরি পাইনের নীচে বসে ছিল তারা। হাইতিতি দুষ্টুমি করলে কান ধরে টেনে এনেছে। তার দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'হানস তুমি রাগ করছ না তো। একে নিয়ে আমার শতেক জ্বালা। মামাবাবু এত বকে তবু যদি ওর লজ্জা হয়। বুঝবে মজা, যাই না বাড়িতে। দুষ্টুমি বের করে দেব। জান হানস, আমাদের বাড়ির সামনে না এই এত বড়ো একটা সিলভার ওকের গাছ আছে। সকাল হলেই ওয়াকা আর আমি দুষ্টুটাকে গাছে বেঁধে রাখি। তখন কী যে হাইমাই করে। একদম বাঁধা থাকতে চায় না।'

হানস বলেছিল, 'তাই বুঝি!'

'আরে তুমি জান না, এর জন্য আমাকে কত বকুনি খেতে হয়। ছেড়ে দিলেই পাগলের মতো দৌড়োতে থাকে। আমাদের বাড়ির নীচটায় না, একটা পাইনের জঙ্গল আছে। আর ওটা পার হলেই বেলাভূমি। সেখানে সেই জাদুকরের পাথরের মূর্তি। গায়ে আলখাল্লা। সোনালি রঙের সব প্রজাপতি গায়ে বসানো। রোদে এমন চকচক করে, চোখ ঝলসে যায়। মাথায় রাজার টুপি। কত সব লাল-নীল পাথর বসানো টুপিতে।'

'খুব সুন্দর দেখতে।'

'জান হানস, এই তুমি কিন্তু আবার কাউকে বলে দেবে না।'

'বলব কেন?'

'না বলবে না। বললে আমি আর কোথাও উড়ে যেতে পারব না। বলবে না বলো।'

'কাকে বলব?'

'কাউকে না।'

'আচ্ছা কাউকে বলব না।'
'গার্ডেনার পাখিদেরও না।'
'আচ্ছা তাও বলব না।'
'তিন সত্যি করো।'
'তিন সত্যি।'
'যিশুর দিব্যি।'
'যিশুর দিব্যি।'

হানসের সব স্পষ্ট মনে আছে। আর মনে থাকবেই না কেন, এই তো কিছুক্ষণ আগে, তখনও সাঁজ লাগেনি, তাকে ম্যান্ডেলা বলল, 'আমরা যাই। না হলে আমার মা-টা না কান্নাকাটি করবে। একবার জান, আমরা উড়ে উড়ে লায়ন রকে চলে গেছিলাম। আর বাড়িতে খোঁজাখুঁজি। পুলিশে খবর দিয়ে দিয়েছে মামা। তা দিতেই পারে। এক দু-দিন কেউ না বলেকয়ে বাড়ি থেকে উধাও হলে চিন্তা তো হবেই।'

'বাড়ি থেকে বলে এলেই পার।'

'ধ্যাৎ কিছু বোঝে না! তুমি না হানস কিছু বোঝ না। বললে আমাকে বের হতে দেবে?'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'ঠিক না, তুমি বুঝছ না, মামাটা কী কড়া পাহারা রাখে। আমি শুলে মা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। স্কুলে ওয়াকা দিয়ে আসে। আবার স্কুল ছুটির আগেই ওয়াকা গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।'

'ওয়াকাটা কে?'

'আরে ওই তো সেই জাদুকরের খবর দিল। একদিন দৌড়ে এসে বলল, ম্যান্ডেলা বন্দরে না, জাহাজ থেকে না, একজন জাদুকর নেমে এসেছে। লম্বা জোব্বা গায়। মাথায় পাগড়ি। সারা শরীরে রাজ্যের সব রকমারি প্লাস্টিকের খেলনা। পকেটে বাঘ।'

'পকেটে বাঘ?'

'ইস হানস, তোমার মাথায় না কোনো বুদ্ধি নেই। জাদুকর পকেটে একটা বাঘ পুরে রাখবে খুব বেশি কথা হল।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'জানো, ওয়াকা এসে ছুটে বলল, সে নিজে চোখে দেখে এসেছে, জাদুকরের পকেট থেকে কী একটা লাফিয়ে পড়ল।'

'পকেট থেকে লাফিয়ে পড়ল!'

'হ্যাঁ। তুমি না বুড়ো হয়েছ তো, কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না।'

'না না, আমি সব বিশ্বাস করি।'

'লাফিয়ে একেবারে ওয়াকার পায়ের কাছে। বেড়ালছানা একটা ভেবে যেই না ওয়াকা ধরতে গেছে, আর সঙ্গেসঙ্গে জাদুকরের কী রাগ!'

'রাগ কেন?'

'বা রে রাগ হবে না! বাঘকে বেড়ালছানা ভাবলে তোমারও রাগ হবে। আমাকে তুমি বুড়ি ঠাকুমা ভাবলে আমার রাগ হবে না!'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'তুমি হানস বার বার তা অবশ্য ঠিক, তা অবশ্য ঠিক করবে না তো। ঠিক কী! সব সত্যি! জাদুকর রেগে গেলেই কান ফর ফর করতে থাকে। কান নড়তে থাকে। যত কান নড়ে, যত কান ফর ফর করে তত বেড়ালের বাচ্চাটা আড়মোড়া ভাঙে। যত আড়মোড়া ভাঙে তত লম্বা হয়ে যায়। ওয়াকা দেখেছে, নিমেষে বেড়ালছানাটা বাঘ হয়ে গেল। ওয়াকা সঙ্গেসঙ্গে দৌড়! কিন্তু যাবে কোথায়। দু-পা গিয়েই দেখল তার পা

মাটিতে গেঁথে গেছে। নড়তে পারছে না। জাদুকর হে হে করে হাসছে। বাঘটার কান ধরে শিরশির করে টেনে নিয়ে গিয়ে ওয়াকাকে বলল, ভয় পাচ্ছ কেন। ওকে আদর করো। ও তোমাকে ভালোবাসবে।'

হানস আর না বলে পারল না, 'ওয়াকা বুঝি তোমাকে এসব বলেছে!' তারপরই হানসের মনে হয়েছিল, বারে মেয়েটার তো একটা পালকের টুপি সত্যি আছে। আর আছে বলেই এই নির্জন দ্বীপটায় চলে আসতে পেরেছে। ঈশ্বরের করুণা কার উপর কীভাবে নেমে আসে কেউ বলতে পারে না। কারণ চোখের সামনে দেখেছে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেলেই আকাশে ঘণ্টা বাজতে থাকে। রুপোলি ঘণ্টা হাওয়ায় দোলে, আর ঢং ঢং শব্দ হয়। সে তারপর ম্যান্ডেলাকে বলল, 'আমি সব বিশ্বাস করি ম্যান্ডেলা। বাঘটা ওয়াকাকে ভালোবাসল!'

'হ্যাঁ।'

'বাঘটা ওয়াকাকে আদর করল!'

'হ্যাঁ।'

'বাঘটা ওয়াকার পায়ের কাছে শুয়ে লেজ নাড়ল!'

'হ্যাঁ।'

শুনতে শুনতে হানসের চোখে-মুখে কেমন দীপ্তি ফুটে উঠেছিল। গার্ডেনার পাখিরা তখন ঠোঁটে করে ফুল নিয়ে আসছে। ওদের ছোটো ছোটো ঘর। সকাল হলেই বাসি ফুল ঠোঁটে করে ফেলে দিয়ে আসে। বিকেল হলে তাজা ফুল এনে তাদের ঘরের পাশে মালার মতো সাজিয়ে রাখে। বনভূমির এদিকটায় ছোটো ছোটো ঘাস। ঘাসের মাথায় ছাউনি দেওয়া সব লিলিপুট ঘরবাড়ি তাদের। পাখির বিচিত্র এই সৌন্দর্যবোধ হানসকে পৃথিবীতে কিছুই অবিশ্বাস্য নয় শিখিয়েছে।

'পাখিগুলির খুব মজা, না হানস।'

হানস বলল, 'ভারি মজা।'

'তুমি রোজ এখানটায় আস?'

'রোজ। আমার তো এই কাজ! খাওয়ার ভাবনা নেই, বেঁচে থাকার ভাবনা নেই। সারাটা দিন দ্বীপে ঘুরতে ঘুরতে আমার সময় কেটে যায়।'

'আচ্ছা হানস, আমার বাবা সত্যি কোনো দ্বীপে আটকা পড়েছে তোমার মনে হয়।'

'তাই হবে। নইলে বাড়ি ফিরে যেত না!'

'সেই তো! মামা কিছুতেই বোঝে না। লায়ন রকে সেজন্যই তো গেছিলাম। তবে জান দ্বীপটা আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূর না। আমাদের বাড়িটা না একটা পাহাড়ের উপত্যকায়। উঠোনে দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই। ঝড়ের সমুদ্র দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। আমাদের বাড়িটার চারপাশে বড়ো বড়ো কাচের জানালা। ঝড়ের সময় সমুদ্র কেমন খ্যাপা মোষের মতো। ঢেউগুলি আকাশের দিকে হাত তুলে দিয়ে ছুটতে থাকে। রাতে মনে হয় কালো অন্ধকার এক অতিকায় দৈত্য বালিয়াড়িতে এসে আছড়ে পড়ছে। আমার বড়ো ভয় করে। ঝড়ের সমুদ্রে পড়ে গিয়ে বাবার জাহাজডুবি-কী জানি, কী যে হল না! বাড়ি থেকে ছোট্ট দ্বীপটা দেখা যায়। কিছুতেই লোভ সামলাতে পারলাম না। হাইতিতিকে নিয়ে এক রাতে উড়ে দ্বীপটায় চলে গেলাম। আমি হারিয়ে গেছি ভেবে মার কী কান্নাকাটি। কেন জানি মনে হয়েছিল-ওখানে গেলেই বাবাকে খুঁজে পাব।'

'সে তো কাঁদবেই। মার প্রাণ। মন মানবে কেন?'

'তা ঠিক। কিন্তু তুমিই বলো, যার বাবা নেই তার আর কী আছে!'

'সে তো সত্যি কথা।'

'বাড়ি ফিরে এলে মামার কী বকুনি। পুলিশের লোকদের জেরা। ওরা তো জানে না, জাদুকর বসন্তনিবাস আমাকে পালকের টুপি, রুপোর ঘণ্টা দিয়ে গেছে। মামা ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, বল কোথায়

পালিয়েছিলি সারাটা দিন? যত বলি লায়ন রকে গেছিলাম। কিছুতেই বিশ্বাস করে না। এমন অগম্য জায়গায় কে যায়, আর এ তো পনেরো-বিশ মাইল দূরের দ্বীপ। ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না।'

'মামা বুঝি তোমার গার্জিয়ান?'

'আমার শুধু হবে কেন! মারও গার্জিয়ান।'

'তারপর কী হল!' বলে হানস ঘাসে কনুইতে ভর করে এলিয়ে দিয়েছিল শরীর।

'তারপর কী হবে! সঙ্গী বলতে, হাইতিতি। বললাম, হাইতিতিকে জিজ্ঞেস করো। ও তো সঙ্গে ছিল। আমি দুষ্টুমি করেছি কি না, জিজ্ঞেস করে দেখো।

'হাইতিতি বলল?'

'যা বাবা, কিছু তুমি বোঝ না হানস। তুমি খুব বোকা।'

হানস ম্যান্ডেলার কথায় হা-হা করে হেসে উঠেছিল। তারপর জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে আদরে আদরে পাগল করে তুলেছিল ম্যান্ডেলাকে! ম্যান্ডেলা দৌড়ে পালাতে চাইলে খপ করে কোলে তুলে নিয়েছিল।

ম্যান্ডেলা বলেছিল, 'ইস কী সুড়সুড়ি লাগছে। তোমার নোখ কী বড়ো। তুমি নোখ কাটতে পার না! কী নোংরা তুমি। জান মা, রোববার রোববার আমার নোখ কেটে দেয়। তুমি কী ফাদার। এত বড়ো বড়ো দাড়ি কেন তোমার? তুমি আমাকে ছাড়ো। ছাড়ো বলছি।'

হানস চুপসে গেছিল, আসলে সহসা যেন তার যৌবনে ফিরে গিয়েছিল। ম্যান্ডেলা তার কাছে তো আর পরি কিংবা অন্য কেউ ছিল না। যেন তার রোমি কতকাল পরে বাবার কাছে ফিরে এসেছে। কিন্তু রোমি তো তাকে সবসময় গলা জড়িয়ে ঘুরে বেড়াত, ভালোবাসত। ম্যান্ডেলা রোমি হবে কেন। কী যে এক অভিমানে চোখ জলে ভার হয়ে এসেছিল। সে ম্যান্ডেলাকে কোল থেকে নামিয়ে গাছের আড়ালে চলে গেছিল। সে কাঁদছে, একটা ছোট্ট মেয়ে টের পেলে ভারি লজ্জার।

ম্যান্ডেলা ডাকছিল, 'হানস!'

হানস চুপচাপ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল!

'হানস তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন! আমি কী করেছি।' বলেই গাছটার নীচে ছুটে এসে দেখেছিল সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

আর এখন কী বুঝল কে জানে, ম্যান্ডেলা দু-হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমাকে কোলে নাও। নইলে দেখবে দ্বীপটায় আমি আর কখনো আসব না।'

হানস তাকে ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিয়েছিল।

আর তারপরই ফিস ফিস গলায় কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'জান মামাটা আমার না শেষে কী জব্দ!

'চোখ বড়ো বড়ো করে, মুখ গম্ভীর করে গলায় স্বর ভারি করে মামা খুব মেজাজ দেখিয়ে বলল, ইয়ার্কি পেয়েছ! হাইতিতি কী বলবে! তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ!'

'বড়োদের সঙ্গে ওভাবে তোমার কথা বলা উচিত হয়নি ম্যান্ডেলা। শত হলেও তিনি তোমার মামা। তোমার গার্জিয়ান।'

'কী মুশকিল। তুমি কেন বুঝছ না হানস, ও ছাড়া তো আমার আর কেউ সঙ্গী থাকে না। এই যে সারাদিন তোমার সঙ্গে কাটিয়ে গেলাম কত শত মাইল দূরে, কেউ বিশ্বাস করবে! হাইতিতি ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে, তুমিই বলো!'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'আবার তুমি তা অবশ্য ঠিক বলছ!'

আসলে হানস বুঝতে পারছে 'অবশ্য' কথাটা ম্যান্ডেলার পছন্দ নয়। অবশ্য বললে, কোথায় যেন অবিশ্বাসের সুর থাকে। সে তারপর বলেছিল, 'তা ঠিক।'

ম্যান্ডেলা বলল, 'ঠিক না হয়ে যাবে কেন। দ্বীপটায় অজস্র টিউলিপ ফুল ফুটেছিল। সারাদিন হাইতিতি রাক্ষসের মতো টিউলিপ ফুল খেয়েছে। অত বড়ো টিউলিপ একমাত্র লায়ন রকেই পাওয়া যায়। মামা সেটা জানে। তার রংও আলাদা। গ্রীষ্মে স্টিমার ভাড়া করে আমাদের শহর থেকে লোকেরা পিকনিক করতে যায়। মামাও গেছে। ওখানে গেলেই কেউ আর কিছু না আনুক, সঙ্গে একরাশ টিউলিপ ফুল নিয়ে আসে।'

'সে তো আনবেই, টিউলিপ ফুল ভারি সুন্দর। ঠিক তোমার মতো।' বলে হানস কপালে চুমু খেতে গেলে আবার ম্যান্ডেলা মুখ সরিয়ে নিয়েছিল।-'আমার সুড়সুড়ি লাগে হানস। তুমি তোমার বড়ো বড়ো চুল দাড়ি কামিয়ে ফেলো হানস। তোমাকে দেখি। তুমি এমন বুড়ো সেজে আছ কেন। আমার বাবার চুল সোনালি। বাবা রোজ দাড়ি কামাতেন। তুমি কামাও না কেন। কেমন বুনো হয়ে গেছ তুমি।'

হানস বলেছিল, 'তাহলে দ্বীপের কেউ আমাকে আর চিনতে পারবে না। পাখি, প্রজাপতি, কচ্ছপ, ডলফিন সবাই ভয় পেতে শুরু করবে।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

হানস বলেছিল, 'তা অবশ্য ঠিক কী! বলো তা ঠিক।'

ম্যান্ডেলা ওর বুকে মুখ লুকিয়ে বলেছিল, 'তুমি ভারি দুষ্টু।'

হানস বলেছিল, 'তোমার মামাটাও ভারি মূর্খ। কিছুতেই তোমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না।'

'না করলে আমার বয়েই গেল। বড়ো হলে সবাই কেমন হয়ে যায় না! কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না। মামার মেজাজ দেখে বললাম, বিশ্বাস না হয় দেখো। বলেই হাইতিতিকে বললাম, এই তুই আমার সঙ্গে সারাদিন ছিলি না?'

'হাইতিতি কী বলল?'

'ঘাড় নাড়িয়ে বলল, হ্যাঁ। মামা জানে ও আমার দোসর। আমাদের তলে তলে অনেক শয়তানি বুদ্ধি আছে। কিছুতেই বিশ্বাস করে না।'

'কী করলে তখন?'

'বললাম, মামা এই দেখো, বলে হাইতিতিকে টেনে নিয়ে গেলাম মামার কাছে। বললাম, দেখা মামাকে। সারাদিন রাক্ষসের মতো টিউলিপ ফুল গিলেছিস মামাকে বের করে দেখা।'

'দেখাল?'

'বা দেখাবে না! আমি তো মিছে কথা বলিনি। উদগার তুলতেই হাইতিতির জিভের ডগায় আস্ত তাজা টিউলিপ ফুল। মামা দেখে ঘাবড়ে গেলেন। আর টু শব্দটি নেই। আস্ত তাজা টিউলিপ ফুল দেখে মামা গড় গড় করতে থাকলেন। মাকে ডাকলেন-লুসি, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার মেয়েকে অপদেবতা ভর করেছে। তুমি সাবধানে থেকো। এখনই ঝিকাকুকে ডেকে পাঠাচ্ছি। ও এসে ঝাড়ফুক করে দিয়ে যাক।'

'ঝিকাকু!'

'ও তুমি বুঝবে না। ওরা ওঝা। যেখানে যত অশুভ প্রভাব পড়েছে জানতে পারে, ছুটে যায়।'

'ঝিকাকু এল?'

'হ্যাঁ এল। এলে কী হবে, আমি পাত্তাই দিলাম না। বললাম, তোমার ভড়ং রাখো। ওসব আমার অনেক দেখা আছে। তুমি মিছিমিছি লোককে কষ্ট দাও। দাঁড়াও জাদুকরকে বলে দেব। যখন আকাশে ঘণ্টা বাজবে, তখনই তোমার মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢালা হবে।'

'তোমাদের আকাশে ঘণ্টা বাজে?'

'বারে, বাজবে না। হাইতিতিকে নিয়ে আকাশে উড়ে গেলে বাতাসে ঘণ্টাটা নড়ে। দোল খায়। ঢং ঢং করে বাজে। ভয়ে সবাই তখন দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকে। বলবে, লুসির মেয়েটা আবার বের হয়েছে। ছোটোরা শুধু জানালা খুলে দেবে। ওরা দেখতে পায় আমি হাইতিতিকে নিয়ে বাতাসে ভেসে সমুদ্র পার হয়ে

চলে যাচ্ছি। ওরা জানে, জাদুকর আমাকে পালকের টুপি আর রুপোলি ঘণ্টা দিয়ে গেছে। ওরাই শুধু বলে, জাদুকর তুমি ম্যান্ডেলাকে এত ভালোবাস, আমাদের বাস না কেন!'

হানস হাত ধরে তখন ম্যান্ডেলাকে নিয়ে পাহাড়ের উপত্যকার উপর বসেছিল। হাইতিতি নিজের মতো লাফাচ্ছে, ঘুরছে, বেড়াচ্ছে। হানস বলেছিল, 'জাদুকর ওদেরও দিতে পারতেন।'

'বারে ওদের দেবে কেন? ওদের কারও বাবা তো আর জাহাজডুবিতে নিখোঁজ হয়নি। ওদের দ্বীপে দ্বীপে উড়ে যাওয়ার কী দরকার বলো!'

'সেই!'

'আরে সেই না, তুমি বুঝছ না, পাইন ফেস্টিভ্যাল এলেই আমি লুকিয়ে থাকি। মামা নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বলো ভাল্লাগে, বাবাকে ছাড়া আমি ফেস্টিভ্যালে যাই কী করে? পাইনের জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াই। জাদুকরের মূর্তির নীচে বসে থাকি। আমার কান্না পায়। সবাই পাতার পোশাক, পাতার মুকুট বানিয়ে ফেস্টিভ্যালে যাবে বাবা-মার সঙ্গে, আর আমি একা। মামা সবসময় কেবল বকে জান!'

'শিশুদের বকতে নেই।'

'মামাটা না, তা বোঝে না। জাদুকর আমার কষ্ট বুঝেই তো পালক আর ঘণ্টা দিয়ে গেল। ওদের কী কষ্ট বলো? ওদের বাবা আছে।'

খুবই অকাট্য যুক্তি ম্যান্ডেলার। হানস বলেছিল, 'যেখানে যত কষ্ট, সেখানেই দরকার জাদুকরের পালকের টুপি! তুমি আমার জন্য একটা চেয়ে আনবে।'

'বারে তুমি কি ছোটো আছ! জাদুকর তোমাকে পালকের টুপি দেবে কেন? ও তো শুধ ছোটোরা পায়। বরং আমি একটা জাহাজ পাঠিয়ে দেব। জাহাজটা এলেই তুমি উঠে চলে যেয়ো। মনে রেখো জাহাজটা সাদা রঙের। চিমনি নীল রঙের। মাস্তুল হলুদ রঙের। মনে থাকবে তো। ওফ, তুমি দেশে ফিরে গেলে কী মজাটাই না হবে। রোমি তোমাকে দেখলেই দৌড়ে আসবে। এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ে বলবে, বাবা আমাকে কোলে নাও।'

রোমির কথায় হানসের চোখ আবার সজল হয়ে উঠেছিল।

কত আগের স্মৃতি। যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাবার পরই, রোমি, তার মা কেমন হয়ে গেল। কেবল পালিয়ে পালিয়ে দু-জনেই কাঁদত। স্টেশনে তারা এসেছিল বিদায় জানাতে। ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত সে রোমিকে কোলে নিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ট্রেন চলতে শুরু করলে, মারিয়া গলা বাড়িয়ে বলেছিল, বাড়ির জন্য চিন্তা কোরো না। আমি তো আছি। তারপরই রুমালে মুখ ঢেকে হু-হু করে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। কত আগের স্মৃতি তবু কেমন জ্বলজ্বল করছে। যেন তার এসব এ-জন্মের কথা নয়, পূর্ব জন্মের।

হানস এবার আলোটা নিভিয়ে বিছানায় পাশ ফিরে শোয়। এত সব ঘটনার পর মনে হয়েছে, সাদা জাহাজটা আসবেই। তাকে নিতে আসবে। কথায় কথায় ম্যান্ডেলা যুদ্ধের কথা জানতে চেয়েছিল। ম্যান্ডেলা ঠিক জানে না, যুদ্ধ বিষয়টা কী ভয়ংকর। বড়োদের কাছ থেকে শোনা বোধ হয় তার-যুদ্ধ বিষয়টা যে খারাপ, সেটা সে বুঝেছে। সে বলেছিল, জান বড়ো বড়ো পোস্টারে লেখা থাকে-আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। জান পোস্টারে একজন শিশুর হাতে দুটো পুতুল। দুটোই ভারি পাজি। যুদ্ধ ছাড়া কিছু বোঝে না। পোস্টারের সেই শিশুটা না, দুটো যুদ্ধবাজ পুতুলেরই মাথা ঠুকে দিচ্ছে। কী মজা না!' বলে ম্যান্ডেলা হাততালি দিল, হানসও হাততালি দিয়েছে।

'তাহলে বলছ, এখন কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে না।'

'মামা তো বলে, এই এদিক-ওদিক চোরাগোপ্তা যুদ্ধ হয়।'

হানস বিষয়টা পরিষ্কারভাবে বুঝে নেবার জন্য বলেছিল, 'আরে সেই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়েছিল, সেটা এখনও চলছে!'

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সে আবার কী?'

'না, মানে বলছিলাম, তোমার মামা কিছু বলে না?'

'কী বলবে! যুদ্ধ তো কোথাও সেভাবে হচ্ছে না। হবে কী করে। ওরা তো জানে, হলেই ওদের মাথা ঠুকে দেব। ভয়ে জুজু।'

হানসের মুখে বড়ো করুণ হাসি। ম্যান্ডেলা ছোট্ট বালিকা-সে সঠিক কিছু জানে না। সে জানেই না, হানস একজন যুদ্ধ পলাতক মানুষ। পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে কি না সেটাও জানে না। ম্যান্ডেলাকে বলেছিল, 'তোমার মামার কাছে জেনে নিয়ো। যুদ্ধ শেষ না হলে আমি যাচ্ছি না বাবা!'

'আরে বাবা, যুদ্ধ-টুদ্ধ হলে আমি টের পেতাম না! মামা টের পেতেন না!'

হানস ম্যান্ডেলার কথাবার্তা থেকে ধরে নিয়েছে, যুদ্ধটা তবে থেমে গেছে।

তার এখানে কোনো হিসাব নেই। তার সাল তারিখ মনে আছে, সেটা উনিশশো চল্লিশ একচল্লিশ হবে। কী মাস যেন, মার্চ মাস। তারপর এই দ্বীপে থাকতে থাকতে দিন তারিখ, বছর সবই তার কাছে একাকার হয়ে গেছে। সে জানেই না এটা কী মাস। কত সাল। ম্যান্ডেলাকে... ইস, কী ভুল না করে ফেলল। মাস তারিখ সাল জানতে পারলে সে বুঝতে পারত কত বছর ধরে সে এই দ্বীপটায় আছে।

তার ঘুম আসছিল না। দ্বীপটা ছেড়ে যেতেও কষ্ট। সকাল হলেই, সবার কাছে গিয়ে বলতে হবে 'জান, ম্যান্ডেলা বলে গেছে, একটা সাদা জাহাজ আসবে। ওতে আমি দেশে ফিরে যাব। তোমরা ভেবেছ, আমার ঘরবাড়ি নেই!'

যাবার আগে, সবার কাছ থেকেই তার বিদায় নিতে হবে।

তারপরই কেমন কুট করে কামড়, দ্বীপটা ছেড়ে গেলে, একেবারে জনহীন হয়ে যাবে। কিন্তু তার তো না যেয়ে উপায় নেই। রোমি কত বড়ো হয়ে গেছে না-জানি। তারপরই কেমন বুকের ভিতর থেকে তিরতির করে একটা কষ্ট তাকে নাড়া দিতে থাকল। রোমি যদি তাকে চিনতে না পারে! চিনতে না পারলে বলবে, আমি তোমার বাবা। ওর মা, মানে মারিয়া কি বুড়ি হয়ে গেছে! মারিয়ার সেই সুন্দর নীল চোখ, গভীর জলপ্রপাতের শব্দের মধ্যে, অথবা ডানা মেলে তাকালে মনে হত আশ্চর্য সুষমা মুখে। তার এতটা কাল একটা নির্জন দ্বীপে বন্দি হয়ে থাকার জন্য কাকে দায়ী করবে বুঝতে পারল না। সবই তার ভাগ্য।

এসব ভাববার সময়ই মনে হল, কীসব আজগুবি ভাবনা তার মাথায় আসছে। ঘুম আসছে না। দ্বীপের চারপাশে সে কোনোদিন সমুদ্রে একটা জেলে নৌকো দেখেনি, কোনো জাহাজ দেখেনি। দ্বীপটা অসীম সমুদ্রে একা জেগে আছে। অজ্ঞাত সবার কাছে-এমন একটা দ্বীপে সে কোনো জাহাজই দেখেনি, সামান্য বালিকা পালকের টুপি পরে আসতেই পারে না। কিন্তু পরমুহূর্তে, ম্যান্ডেলার সব কথা মনে হলে সে অবিশ্বাসই বা করে কী করে। তার মনে হল, জাহাজটা আসবেই। সবই সে ভেবে নিল, ঈশ্বরের করুণা। তিনিই ম্যান্ডেলাকে পাঠিয়েছেন।

তার ঘুম পাচ্ছিল। হাই উঠছে। তবু ঘুম আসছে না।

গাছের ডালপালার ফাঁকে অজস্র নক্ষত্র সে আজকাল চিনতে পারে। কোনো বড়ো নক্ষত্র তাকে সময়ের হদিস দেয়। রাত যত বাড়ে নক্ষত্রের অবস্থান তত দূরে সরে যায়। এক-এক ঋতুতে এমনি সব অতিকায় নক্ষত্ররা রাতে ঘড়ির কাজ করে। ডালপাতার ফাঁকে সেই নক্ষত্র আবিষ্কারের সময় বুঝল, বেশ রাত হয়েছে। সে ফের আলোটা জ্বালল। ভেবেছিল রাতে আর কিছু খাবে না। মন ভালো নেই। কিন্তু না খেলে সকালে উঠেই সবার কাছে জবাবদিহি-তুমি খাওনি কেন হানস? গাছ, লতা, ফুল, পাখি, ক্যাকটাস কেউ তাকে ছেড়ে কথা কইবে না। রাতের খাওয়া সেরে নিতে হয়। বড়ো ঝিনুকে সামান্য পাখির বাসার তৈরি স্যুপ নিল। একটু মধু নিল, তারপর হারপুনের ডগা দিয়ে ওটা নেড়ে সে একটা ডালে হেলান দিয়ে খেতে বসল। পাতার তৈরি চামচে। খাওয়ায় মনোনিবেশ করার সময় মনে হল তার, দূরে কে যেন ডাকছে, 'হানস ওটো, আমরা তোমাকে নিতে এসেছি! হানস ওটো, তুমি কোথায়?'

সে চিৎকার করে বলল, 'হানস ওটো এখানে। ম্যান্ডেলা তোমাদের পাঠিয়েছে!'

আর কোনো সাড়া নেই। আশ্চর্য, সে তো এইমাত্র শুনতে পেল দূর থেকে কারা তার নাম ধরে ডাকছে। সে তাড়াতাড়ি একটা আলো হাতে গাছ থেকে নেমে গেল। ছোটো কচ্ছপের খোলের চারপাশে চারটা ফুটো করে শুকনো লতা বেঁধে দেওয়ায় সে হ্যারিকেনের মতো আলোটা নিয়ে সহজেই নীচে চলাফেরা করতে পারে। অন্ধকার রাতে এই ঝোপজঙ্গলে সে কিছু দেখতে পায় না। পেছনে পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে বলে ঝোড়ো বাতাস আলোটার ক্ষতি করতে পারে না। বাতিটা সে পাহাড়টার আড়ালে বনভূমির মধ্যেই শুধু জ্বালাতে পারে। পাহাড়ের দরজা পার হয়ে বালিয়াড়িতে ঢুকলেই দপ করে নিভে যায়। বালিয়াড়িতে অন্ধকার এত গভীরও থাকে না। শুধু ক্যাকটাস আর ঝিনুক কিংবা ভাঙা শামুকের খোল। সে পাতার জুতো পরে থাকে-কারণ একবার শামুকের খোলে পা কেটে ক-দিন খুব কষ্ট পেয়েছিল।

সে গাছ থেকে নেমে আবার কেউ হানস ওটো বলে ডাকে কি না শোনার অধীর আগ্রহে কান পেতে আছে। ওহ কী উত্তেজনা। আবার কেউ ডাকবে, ঠিক ডাকবে, 'হানস ওটো, আমরা তোমাকে নিতে এসেছি।' উত্তেজনায় হানস কেমন হাঁপাচ্ছে। সে ছুটে যাবার চেষ্টা করছে। কিছুটা চর্বি ছলাত করে পড়ে গেল। পাহাড়ের বেড়া ডিঙিয়ে বালিয়াড়িতে এসে দেখল-না কোনো সাদা জাহাজ আসেনি। সমুদ্রে সে কোনো জাহাজ দেখতে পেল না। আলোটা ঝোড়ো বাতাসে নিভে গেছে।

সে অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে। কত দীর্ঘকাল, সে একা! তারপরই মনে হল ম্যান্ডেলার কী দরকার ছিল বলার সাদা জাহাজ আসবে একটা। জাহাজটা তাকে দেশে নিয়ে যাবে। সে তো এখানে বেশ ভালো ছিল। গাছপালা পাখি সমুদ্রের সব ডলফিন তার বন্ধু। তাদের সঙ্গে কথা বলে তার সময় কেটে যেত। সে একা পাহাড়ের উপত্যকায় উঠে গেলে প্রজাপতিরা তাকে সঙ্গ দিত। সে কথা বলত গাছের সঙ্গে, মাছের সঙ্গে, পাখি প্রজাপতির সঙ্গে। সে যখন শামুকে পা কেটে বিছানায় শয্যাশায়ী তখন কত সব বিচিত্র নীল রঙের পাখি গাছটার ডালে পাতায় ওড়াউড়ি করত। ওরিওল পাখিরা ফল পাকুড় এনে রাখত তার সামনে। সে তাই খেত। এবং আশ্চর্য, ফলের রস গড়িয়ে সহসা কিঞ্চিৎ ক্ষতস্থানে লেগে গেলে, পা-টা কেমন হালকা বোধ হয়েছিল। পা ফুলে গেছিল। সেই রস লাগাত আরাম পাবার জন্য। ধীরে ধীরে মনে হল পায়ের ফোলা ভাবটা হালকা হয়ে যাচ্ছে। ক্ষতস্থান নিরাময় হয়ে উঠছে। সে আবার ভালো হয়ে গেলে তার কেন জানি এইসব গাছপালা পাখি প্রজাপতির প্রতি মায়া আরও বেড়ে গেছিল।

তারপর থেকে সে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে খালি পায়ে হাঁটত না। বড়ো বড়ো সব ইউকন গাছের পাতা, এক-একটা পাতা প্রায় সাত-আট ফুট লম্বা, ফুট দুই চওড়া, গাছের নীচে ঝরে পড়ে থাকে। খুব শক্ত মজবুত। জুড়ন গাছের আঠা লাগিয়ে বেশ ভারী বুটজুতো তৈরি করে নিয়েছে। লতা দিয়ে সে বেঁধে দেয় বুটজুতো। শুকনো লতা ফিতার কাজ করে। এভাবেই সে শক্ত রাবারের মতো ইউকন পাতার তোশক চাদর বালিশ বানিয়ে নিয়েছে। শীতের ঠান্ডায় কী উষ্ণ রাখে শরীর!

এসময় সহসা মনে হল দূরের সমুদ্রে ঢেউয়ের মধ্যে যেন আলো ফুটে উঠছে। তবে কি সেই সাদা জাহাজ আলো জ্বালিয়ে এগিয়ে আসছে। সে দ্রুত দৌড়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল। গিয়ে দেখল, আসলে ওটা কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ ভুস করে সমুদ্রে ভেসে উঠেছে। মনের ভুল সব। কোনো সাদা জাহাজ তাকে নিতে আসেনি। সে সারাটা দিনরাত্রি মনের ভুলে বকাবকি করছে। ম্যান্ডেলা আর হাইতিতি সবই তার মনের ভুল। সে কেমন অপার বিষণ্ণতায় ডুবে গেল। ম্যান্ডেলার উপর অভিমানে চোখ ফেটে জল বের হয়ে এল। সে সবই ভুলে গেছিল। রোমিকে, মারিয়াকে, তার প্রিয় খামার বাড়ি, গির্জার ফাদার সব। গাছের কাণ্ডে সে প্রথমে দ্বীপে উঠে এসে সেই হারপুনটা দিয়ে যা যা লিখে রেখেছিল ম্যান্ডেলা সব ফের মনে করিয়ে দিয়ে তাকে বড়ো বিপদে ফেলে চলে গেল।

সে সেই অতিকায় বৃক্ষে নিজের নাম, গাঁয়ের নাম, মেয়ের নাম লিখে রেখেছিল-কারণ সে জানে, এই দ্বীপেই সে একদিন যেমন পাখি প্রজাপতিরা মরে পড়ে থাকে, সেও মরে পড়ে থাকবে। পৃথিবীর কেউ জানবেই না, হানস ওটো বলে একজন যুদ্ধ পলাতক এই দ্বীপটায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। যদি কোনোদিন

কেউ আসে, তবে এই প্রাচীন বৃক্ষে তার নাম, মেয়ের নাম, নদীর নাম দেখে বুঝতে পারবে, সে কোন দেশের লোক। কী তার নাম! মারিয়া কিংবা রোমি জানতে পারবে, তাদের সেই প্রিয় হাসিখুশি মানুষটিকে যুদ্ধবাজ মানুষেরা দ্বীপে পাথর বানিয়ে রেখেছে। সে জানে, কেউ পৃথিবীতে আসবেন-যিনি বলবেন, যুদ্ধে মানুষেরই শুধু ক্ষতি হয় না। গাছপালা কীটপতঙ্গেরও ক্ষতি হয়। মানুষের বসবাসের জায়গা এই গ্রহমণ্ডলে আর কোথাও নেই। অতি দূর নক্ষত্রে কেউ আছে কি না সে জানে না। মানুষের জন্য ঈশ্বর এই আশ্রয়ভূমি বানিয়েছেন। বেঁচে থাকার সব উপকরণ দিয়েছেন। মস্তিষ্ক এবং সব গ্রন্থি মানুষকে আজ একটা সুন্দর জীবনের খবর দিয়েছে। মানুষই সব পারে। সে এই গাছপালা কীটপতঙ্গের রক্ষাকর্তা। ঈশ্বর মানুষকে দিয়ে সব করাচ্ছেন। যুদ্ধ মানুষকে বড়ো অমানুষ করে তোলে।

একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ বলেই, হানস ওটো এই দ্বীপে নিজের মতো বসবাসের জায়গা করে নিতে পেরেছে। ম্যান্ডেলা না এলে সে ভালোই ছিল। ম্যান্ডেলা এবং হাইতিতি এখন মনে হচ্ছে তার কাছে দুঃস্বপ্ন। তাকে ঘরে ফেরার জন্য উতলা করে দিয়ে গেল।

সে পাহাড়ের উপত্যকায় অনেকক্ষণ হাঁটু মুড়ে বসে থাকল। আস্তানায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

সে পাহাড়ের মসৃণ চত্বরে শুয়ে পড়ল। কনুইয়ে মাথা রেখে আকাশের নক্ষত্রমালা দেখতে থাকল। আর ঘুমোবার চেষ্টা করতে গেলেই, কিংবা চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলেই শুনতে পেল, আবার কে ডাকছে, 'হানস ওটো, তুমি কোথায়? তোমাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না কেন?'

তার কেমন ভয় ধরে গেল।

তবে কি ম্যান্ডেলা এবং হাইতিতি কোনো দেবদূত? তার কি সময় হয়ে এসেছে? সে বুড়ো হয়ে গেছে ঠিক, কিন্তু সে তো শরীরে কোনো জড়তা অনুভব করছে না। সমুদ্র গর্জন শুনতে পাচ্ছে। তরঙ্গমালার অবিরাম ক্র্যাকার ভাঙার শব্দ বালিয়াড়িতে এসে আছড়ে পড়ছে। যেন পৃথিবীর সেই আদিকাল থেকে এইভাবে তারা দ্বীপে এসে একটুকু ভালোবাসার জন্য অবিরাম হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

দ্বীপের তারা কোনো ক্ষতি করে না।

ঢেউয়ের সঙ্গে সমুদ্র যা কিছু নিয়ে যায়, ফিরতি ঢেউ আবার দ্বীপটাকে সব ফিরিয়ে দিয়ে যায়। একটি বালুকণাও সে দ্বীপ থেকে আজ পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যায়নি। বরং সে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই বালিয়াড়ি আরও বড়ো হোক সে চায়। তবে যেন সে আরও বড়ো ঢেউ তুলে এখানে এসে ভেঙে পড়তে পারবে। ভারি মজার খেলা তার। দ্বীপে থাকতে থাকতে হানস এটা টের পেয়েছে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল ক্যাকটাস গাছগুলির কাছাকাছি চলে আসে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি এগোয় না। দ্বীপের আশ্চর্য সৌন্দর্য এই গাছগুলি। যেন সব রংবেরঙের পুতুল বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দু-হাত তুলে ছুটে আসা দেখে মজা পায়। সমুদ্রের এই খেলা দেখার একমাত্র সাক্ষী এই গাছগুলো আর হানস। সমুদ্র তাকে ভালো না বেসে পারে!

হানসের কেমন হাসি পেল। সে ভাবল, না, ম্যান্ডেলাকে নিয়ে আর ভাববে না। ম্যান্ডেলা আসার পর থেকেই সে কেমন স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। কেবল নিজের কথা ভাবছে। নিজের কথা এত ভাবতে নেই। যে দ্বীপটা তাকে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে সে তাকে ভুলে যেতে চাইছে। ভুলে যেতে চাইছে বলেই, শুনতে পাচ্ছে 'হানস ওটো, তুমি কোথায়! আমরা তোমাকে নিতে এসেছি। দেখো, সেই সাদা জাহাজ, নীল রঙের চিমনি, হলুদ রঙের মাস্তুল। ম্যান্ডেলা আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে।'

কী ভূতুড়ে কাণ্ডরে বাবা। বাতাসে কেবল ঘণ্টা বাজে! কী কাণ্ডরে বাবা, কাপ্তানের ঘরে কে সুড়সুড়ি দেয়, দেখা যায় না। কী কাণ্ডরে বাবা, ডাইনিং হলের সাজানো লাঞ্চ চাদর টেনে কে ফেলে দেয়! আর মাঝে মাঝে বলে, 'আমি ম্যান্ডেলা-সামনে এগিয়ে, ডান দিকে কিছুটা ঘুরে শ-দুই মাইল উত্তরে গেলে দ্বীপটা পাবে। সেখানে হানস ওটো বলে একজন নিরপরাধ মানুষ, তোমাদের মতো ধূর্তবাজদের পাল্লায় পড়ে পালিয়ে আছে। শিগগির যাও। নাহলে আকাশে ঘণ্টা বাজবে। খাবার প্লেট বাতাসে ভেসে যাবে। মাস্তুলের পতাকা আকাশে উড়ে হাওয়া হয়ে যাবে।'

হানসের মনে হল, ম্যান্ডেলা ইচ্ছে করলেই এত সব কাণ্ড ঘটাতে পারে।
এই দ্বীপে এসেও ম্যান্ডেলা তাকে এভাবে প্রথমে প্রচণ্ড ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল।
সুতরাং সে ইচ্ছে করলেই পারে একটা জাহাজ পাঠিয়ে দিতে।
সেও তো প্রথমে ম্যান্ডেলার কাণ্ডকারখানায় কম ভয় পায়নি। পাখির বাসা খুঁজতে পাহাড়ের উপত্যকায় একটা কোটা নিয়ে উঠে গেছিল। সে নুয়ে যখন বাসা কোটার আকশিতে তুলে আনছে তখনই দেখে বাতাসে ভেসে আসছে একটা বাসা। ঠিক ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো বাসাটা দুলছে। ও বাবা কী ভূতুরে কাণ্ডড়ে বাবা! সে দৌড়ে নেমে যাবার সময় দেখেছিল আবার পাখির বাসাটা তার সামনে। সে তো তখন জানত না, জাদুকরের পালকের টুপি পেয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে বাতাসে উড়ে যেতে পারে, অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে। কেবল আকাশে তখন ভূতুড়ে ঘণ্টা বাজছে। হাইতিতি ভেসে গেলে বাতাসে গলায় ঘণ্টা তো বাজবেই।
সুতরাং সে ম্যান্ডেলার প্রথম দিকের কাণ্ডকারখানায় ভয়ে মূর্ছা গেছিল। মূর্ছা যেতেই বোধ হয় ম্যান্ডেলার মনে হয়েছে-আহা বেচারা জানেই না, পালকের টুপি আছে ম্যান্ডেলার কাছে। হাইতিতির আছে রুপোলি ঘণ্টা। ম্যান্ডেলা নাকি তখন দ্বীপে নেমে পালকের টুপি খুলে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। আর খুঁটিয়ে দেখেছে, লোকটা সত্যি তার নিখোঁজ বাবা কি না। কিন্তু বাবা তো তার কম বয়সি, মাথার চুল, মুখের দাড়ি সাদা হবার কথা নয়। এ অন্য কোনো মানুষ। তবু ম্যান্ডেলার কষ্ট হয়েছিল তাকে এভাবে ফেলে রেখে যেতে। সে ডাকছিল, 'এই শুনছ, আমি ম্যান্ডেলা। ভয় নেই। বাসা যেভাবে তুমি খোঁদল থেকে তুলে আনছিলে, তাতে ভয় করছিল, যদি সমুদ্রের জলে পড়ে যাও! এজন্য দুটো বাসা তোমাকে দিতে গেছিলাম। তুমি ভয় পেয়ে দৌড়ালে। আমার তো খেয়াল থাকে না বড়োরা আমাকে পালকের টুপি পরলে দেখতে পায় না। এই দেখো, পালকের টুপি খুলে ফেলেছি, দেখো না। আরে কী হল! বুড়ো মানুষ তুমি, বুড়োরাও কখনো ভয়ে মূর্ছা যায়? ছিঃ কী লজ্জার। ওঠো। নাহলে আমি সবাইকে বলে দেব, বুড়ো লোকটা কী ভিতু!'
হানস ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে দেখে, সত্যি একটা বাচ্চা মেয়ে, আর তার পাশে বসে একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা। তাজ্জব ঘটনা। সে আবার ভিরমি খেতে যাচ্ছিল আর কি। তখনই ম্যান্ডেলা বলল, 'আমাকে ছুঁয়ে দেখো, এই আমার হাইতিতি। আমরা দু-জনেই দু-জনের বন্ধু। আবার বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছি। তোমাকে দেখে ভেবেছিলাম, ওইতো দ্বীপে একজন মানুষ আটকা পড়ে আছে। সে আমার বাবা না হয়ে যায় না! তারপর নীচে নেমে দেখি, তুমি একটা বুড়ো বোকা মানুষ। পাখির বাসা বাতাসে ভেসে আসতে দেখলে ভয় পাও।'

হানস এবারে উঠে বসল। আস্তানায় ফিরে যাবে ভাবল। সবই মনের বিভ্রম সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি না। ঈশ্বরের করুণা পেলে কী না হয়। ম্যান্ডেলা ছেলেমানুষ, সে হয়তো জাহাজের কাপ্তানকে দ্বীপের অবস্থান সম্পর্কে ঠিকঠাক কোনো নির্দেশ দিতে পারেনি। ম্যান্ডেলার আবার বাড়ি যাবার তাড়া। শুধু ভয় দেখিয়ে কাপ্তানকে যদি বলে যায়, 'তোমার রাস্তাতে দ্বীপ পড়বে না, একটু বাঁ-দিকে আছে দ্বীপটা। এই তিন-চারশো মাইলের ভেতর, খুঁজে নেবে। যদি না নাও, দেখো আবার আমরা আসব, এসে তোমার কান মলে দিয়ে যাব। দুষ্টু বুড়ো খোকারা খুব ধুরন্ধর হয়, মামা বলেছে।'
এমন যদি হয়, সত্যি জাহাজটা কাছে কোথাও ঘুরছে, কিন্তু দ্বীপটার সন্ধান পাচ্ছে না-দূরবিনে চোখে পড়ছে না, কোথাও কোনো দ্বীপ, সুতরাং তার সঙ্গেসঙ্গে মনে হল পাহাড়টার মাথায় আগুন জ্বাললে কেমন হয়। রাতের বেলা দ্বীপটা দেখবেই বা কী করে। একমাত্র আগুনই অনেক দূর থেকে রাতের দৃশ্যমান বস্তু। তার আলো আকাশে উঠে গেলে টের পাবে, ওই সেই দ্বীপ, যেখানে একজন ফেরারি ফৌজ আত্মগোপন করে আছে।
যেই ভাবা সেই কাজ।
সে দৌড়ে নেমে গেল।

আকাশে ভাঙা চাঁদের আলো। কাকজ্যোৎস্না। এক মায়াবি পৃথিবীর এখন সে বাসিন্দা। দীর্ঘদিন পর সে আবার গভীর রাতে দ্বীপটায় হেঁটে বেড়াচ্ছে। সেই প্রথম দিকে, ছোট্ট দ্বীপটায়-যার পাহাড় একটা ঢিবির চেয়ে বেশি উঁচু নয়, যার পাখি প্রজাপতি বড়ো ক্ষুদ্রকায়, একমাত্র অতিকায় পাখি বলতে সিন্ধু শকুনেরা আছে... ওরা দ্বীপটায় ছিল উপদ্রবের সামিল। পাখির ঝাঁক থেকে থাবা মেরে তারা শিকার ধরে নিয়ে যেত- সে তখন ছিল এদের একমাত্র পাহারাদার। সারা দিনমান ঘুরে ফিরে দেখত, কোথা থেকে তারা উড়ে আসছে। হাতে ঢিল নিয়ে সে তাদের পেছনে ধাওয়া করত। দিনের পর দিন এই করে সে বুঝিয়ে দিয়েছে, এখানে কারও কোনো ধৃষ্টতা সে সহ্য করবে না। এখন সিন্ধু শকুনেরা দ্বীপটায় উড়ে আসতে ভয় পায় কারণ উড়ে এলেই দেখতে পায় অতিকায় এক মানুষ পাতার পোশাক পরে দৈত্যের মতো দ্বীপটাকে পাহারা দিচ্ছে। পাখি প্রজাপতিগুলোকে রক্ষা করছে।

হানস পাহাড়ের মাথা থেকে দৌড়ে নামতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারছে না। আসলে বয়স। হাঁফ ধরে যায়। সে তবু ইউকন গাছের জঙ্গলে ঢুকে বড়ো বড়ো সব শুকনো পাতা পাহাড়টার মাথায় তুলে জড়ো করতে থাকল। সে একসময় দেখল, যা তুলে এনেছে সারা রাতের মতো জ্বালানো যাবে। সেই চর্বির আলো একটা কচ্ছপের খোলে আড়াল দিয়ে পাহাড়ের মাথায় তুলে আনল। রাতেই সাদা জাহাজটার বেশি ঝামেলা- অন্ধকারে দ্বীপটাকে দেখবে কী করে। দিনের বেলায় এই অসুবিধাটা নেই।

সে পাতায় আগুন ধরিয়ে বসে থাকল। পাতাটা এত লম্বা আর এত বড়ো যে বেশ সময় লাগে শেষ হতে। একটা শেষ হলে, আর একটা-পাতার আগুনে ওর মুখ কেমন অলৌকিক মহিমায় ডুবে যাচ্ছে। আসলে হানস, ম্যান্ডেলাকে দেখার পরই রোমির জন্য কেমন উতলা হয়ে উঠছে। ম্যান্ডেলা তাকে বড়ো গোলমালে ফেলে দিয়ে গেল। অন্য দিনের মতো সে কোনো গাছের সঙ্গে কথা বলেনি, পাখির সঙ্গে কথা বলেনি, মাছের সঙ্গে কথা বলেনি। তার অজস্র কথা। প্রথম দিকে, সে তার গাঁয়ের কথা বলত, মেলার কথা বলত, রোমির কথা বলত। নদীর জলে সাঁতার কাটার গল্প করত। গির্জার ফাদার তাকে কী বলেছে তাও বলত। তারপর কী ভাবে যে সেসব কথা ফুরিয়ে গেল। যেতে যেতে একদিন মনে হয়েছিল তার, সে তো কেবল নিজের কথাই বলে যাচ্ছে, দ্বীপের গাছ পাখি প্রজাপতি কেমন আছে, একবারও তো জানতে চায়নি। সে এখানে আছে, থাকছে, খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে-এটা তো ওদেরই দ্বীপ। সেই দ্বীপের বাসিন্দারা যদি রাগ করে বলে, 'তুমি হানস নিজেকে ছাড়া কিছু বোঝ না। কেবল নিজের কথা। আমরাও কথা বলতে চাই।'

সেই তো-সে অবাক। একটা কৌরিপাইন বলল, 'আমাদেরও কথা আছে।'

একটা ইউকন গাছ বলল, 'আমারও।'

গার্ডেনার পাখিরা উড়ে এসে বলল, 'আমাদের বাড়ি যাবে না? কত সুন্দর সুন্দর ফুল এনে সাজিয়েছি। তুমি আমাদের অতিথি!'

সেই তো! সে তো বুঝতেই পারেনি, এরা তার জন্য বাড়িঘর সাজিয়ে রেখেছে। সে গেলে গার্ডেনার পাখিরা খুশি হবে। কারণ সে তো এইসব ছোটো ছোটো পাখিদের কখন রক্ষাকর্তা হয়ে গেছে। কাজেই ওরা যখন ঘর সাজায়, সে সেখানে গিয়ে বসে থাকে, ওরা যখন ঝগড়া করে সীমানা নিয়ে, সে তখন বলে, 'না না, ও কী হচ্ছে! এগুলো তো মানুষের স্বভাব।'

হানস এভাবে একটা ছোট্ট গাছ বাড়তে দেখলেও তখন আনন্দ পেত। নতুন গাছ জন্মাচ্ছে, পুরোনো গাছ আরও বড়ো হচ্ছে। সে যাবার সময় বলত, 'কী ব্যাপার, এত পাতা তোমার ডালপালা থেকে ঝরছে কেন!' নাম-না-জানা সব রঙিন ফুলের ঝোপজঙ্গল! কম ফুল ফুটলে বলত, 'কী ব্যাপার, মন খারাপ, ডালে পাতায় কত ফুল থাকে তোমার, ফুল নেই কেন! বেঁচে থাকো, আনন্দ করো, যতদিন এই সুন্দর পৃথিবীতে আছ শুধু ফুল ফুটিয়ে যাও। এটাই তোমার কাজ।' আর দেখত পরদিন, গাছটায় অজস্র ফুলের কুঁড়ি। সে কারও দুঃখ সহ্য করতে পারে না। ক্যাকটাস গাছগুলোর একবার কী হল কে জানে, সব মরে যেতে থাকল। সে কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। বালির গর্ত খুঁড়ে দেখত রস আছে কি না। যদি না থাকে তবে মরেই যেতে পারে। না, তাও

নয়। তবু মরে যাচ্ছে ক্যাকটাসগুলো! কী কারণ! কিছুটা বালি মুখে দিতেই হানস বুঝল, সাইক্লোনে সমুদ্রের জল গাছগুলোয় ঢুকে গেছে। নোনা বালি। সে তখন কচ্ছপের খোল ভরে জল নিয়ে আসত সেই ছোটো হ্রদ থেকে। সেখানে বৃষ্টির জল জমে থাকে। গাছের গোড়ায় মিষ্টি জল ঢেলে সে-যাত্রা হানস ক-টা মাত্র ক্যাকটাস বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল।

তারপর সে গাছগুলো বড়ো হলে ডালপালা ছেঁটে দিত। এবং ডালপালাগুলি আবার বালিয়াড়িতে গুঁজে মিষ্টি জল ঢালত। বালিয়াড়ির গাত্রে এমন সুন্দর ক্যাকটাসের বাগান ঈশ্বরের করুণায় সে-ই তৈরি করে রেখেছে।

রোমির কথা কতদিন পর মনে হতেই সে আবার স্বার্থপর হয়ে গেছে। কিন্তু সাদা জাহাজটা এলে সে না গিয়ে থাকে কী করে! ম্যান্ডেলাকে দেখে বুঝেছে, বাবা নিখোঁজ হয়ে গেলে মেয়ের কী কষ্ট! রোমির কষ্টের মুখটা মনে হতেই সে আর স্থির থাকতে পারেনি। সে চায় সাদা জাহাজটা আসুক।

সে আগুন জ্বেলে সারারাত বসে থাকল।

সকাল হলে দেখল, না কোনো সাদা জাহাজ তাকে নিতে আসেনি। সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়া সারা রাত তার শরীরের উপর বয়ে গেছে। একবার ঝির ঝির করে কিছু বৃষ্টি। সে তখন আগুন নিভে যাবে ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বৃষ্টিতে ভিজছে খেয়াল নেই। বুড়ো শরীরে বৃষ্টি ভেজা ভালো না, তাও মনে ছিল না। একটা সাদা জাহাজের জন্য সে সত্যি বুঝি পাগল হয়ে গেছে।

সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পাশে পাতাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলে দেখল, তার পাশে কিছু ছাই। সে বুঝল, আসলে তার মাথা ঠিক নেই। বুড়ো বয়সে কী না কী চোখে দেখে ফেলেছে। সব যে মরীচিকা! মরীচিকা না হলে, সারা রাত আগুন জ্বালিয়েও সেই সাদা জাহাজটাকে খোঁজ দিতে পারল না কেন-সে এই দ্বীপটায় আছে।

ওর মনটা সত্যি খুব মিইয়ে গেছে।

যাবার সময় কে যেন বলল, 'হানস তুমি চলে যাবে? আমাদের জন্য কষ্ট হবে না!'

সে পেছনে তাকাল। দেখল অতিকায় ক্যাকটাস একটা। বাহারি ফুল মাথায়। মাথাটা হাওয়ায় দুলছে।

হানস কেবল অপরাধীর মতো বলল, 'আমি চলে গেলে তোমাদের কষ্ট হবে!'

ফুলটা বাতাসে ঝাপটা খেয়ে নেচে উঠল।

আসলে নেচে উঠল না, মুখ-ঝামটা মেরে বলল, 'মানুষেরা এরকমেরই। শুধু নিজের কথাই ভাবে।'

'আরে না, আমি নিজের কথা ভাবব কেন। রোমির কথা ভাবছি। আমার ছোট্ট একমাত্র মেয়ে-কী সুন্দর ডলপুতুলের মতো দেখতে। কী চঞ্চল চাউনি! কী দাপাদাপি সারাটা দিন! মাঠের উপর দিয়ে যখন ছুটে আসত, ডাকত, বাবা বাবা, আমি যাব তোমার সঙ্গে, বাবা বাবা, আমার জন্য চকলেট এনো, বাবা বাবা, আমি স্কুলে যাব না, মাকে বলে যাও-এসব মনে হলে মন মানে?'

ক্যাকটাসের ফুলটা তির তির করে হাওয়ায় কাঁপছে। সামনে বিশাল জলরাশি, আদিগন্ত সমুদ্র ডানা মেলে আকাশে উড়ে যেতে চাইছে, অ্যালবাট্রস পাখিগুলো উড়ছে সমুদ্রের মাথায়; হানস একা একটা ক্যাকটাসের ফুলের সামনে দাঁড়িয়ে, কেন তার মন এত চঞ্চল, ফুলটাকে বোঝাচ্ছে। ফুলটা হাওয়ায় তির তির করে কাঁপতেই মনে হল তার, ফুল পাখি প্রজাপতি যেই হোক, সবার কষ্ট সমান। ফুলটা বুঝতে পেরেছ, মেয়ের কথা ভেবে হানসের মন ভালো নেই।

ফুলটা বলল, 'রোমিকে গিয়ে আমাদের কথা বোলো!'

'বলব না মানে! ও কত কিছু জানতে চাইবে-বাবা, দ্বীপটায় তুমি একা ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'আর কেউ ছিল না?'

'না।'

'তোমার ভয় করত না!'

'ভয় কীসের!'

'বা রে! একটা দ্বীপে একা থাকলে ভয় করবে না! কেউ নেই! কত কিছু থাকে, সত্যি ভয় করত না!'

'ধুস পাগলি, ওখানে কী মানুষ আছে যে ভয় থাকবে! শুধু গাছপালা কীটপতঙ্গ, মিষ্টি জলের হ্রদের জল, ইউকন গাছের গভীর বন, প্রাচীন সব কৌরিপাইনের গাছ। গার্ডেনার পাখিদের আস্তানা। আর সম্বল ছিল একটা ফ্লুট। যখন কিছু ভালো লাগত না, দ্বীপটায় ঘুরে ঘুরে ফ্লুট বাজাতাম। তখন কী আনন্দ, কেমন এক সংগীতমালা সৃষ্টি হত কে জানে। পাতার পোশাক পরে হাঁটতাম। রজনের আঠার তার সেতারের তারের মতো। ফ্লুট বাজালেই, পোশাকটা থেকে নানারকম মিউজিক বেজে উঠত। সে তুই বুঝবি না।'

মনে মনে সে কতদিন পর নিজের মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে।

'বাবা!'

'বল।'

'বাবা, আমার জন্য পাতার পোশাক আনলে না কেন? আমি পরতাম।'

'তোর জন্য তো বানিয়েছিলাম। কিন্তু জানিস জাহাজের লোকগুলি বলল এ কী সব পাগলের কাণ্ড। ডাঁই করা সব শুকনো পাতা তুলে আনছ কেন হানস। নামাও। কী নোংরা! নাও এগুলো পরো। বুনো আদমি হয়ে একটা দ্বীপে থাকা যায়। সভ্য সমাজে এসব চলে না। নাও এই প্যান্ট, শার্ট, জুতো, মোজা জাহাজে উঠে সব ছেড়ে ফেলো।'

'তোমার পাতার পোশাকটা আনতে দিল না!'

'না! পাতার পোশাকটা ওরা সমুদ্রে ফেলে দিল।'

'আমারটা?'

'ওটা তুলতেই দিল না জাহাজে।'

'তোমার ফ্লুট?'

'ওটাই পালিয়ে এনেছি। তোকে দেব বলে।'

'কই দেখি!'

সে যেন সত্যি রোমিকে ফ্লুটটা দিচ্ছে। বলছে, 'বাজাও। বাজাও না। শুনি।' তারপর রোমি বাঁশিতে ফুঁ দিল, কেমন সরল বালকের মতো মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে তার চোখে জল এসে গেল। মারিয়া দূরে দাঁড়িয়ে বাপ-বেটির কাণ্ডকারখানা দেখছে।

ফুলটা বলল, 'হানস তুমি কাঁদছ?'

'বা রে আমি কাঁদব কেন!'

চোখে জল।

সে চোখ মুছে ফেলে বোকার মতো হাসল, বলল, 'কই চোখে জল দেখাও। আমি কাঁদব কেন! তোমরা আছ, আমি কাঁদব কেন! আমি কি একা! আমি কি হারিয়ে গেছি মেলায়! আমি কাঁদব কেন! জান মিছে কথা বললে আমার রাগ হয়।'

'দেখলাম তুমি কাঁদছ! মিছে কথা বলব কেন?'

হানস কেমন মনমরা হয়ে যায়। সে তো বেশ ছিল। তবে সে রোমির জন্য আড়ালে কাঁদে। এখানে আড়ালই বা কোথায়। তার চোখে জল দেখলে সবাই টের পেয়ে যায়।

ফুলটা বলল, 'হানস তুমি আমাদের রাজা। তুমি আমাদের এই ক্যাকটাসগুলি বাঁচিয়ে রেখেছিলে। তোমার চোখে জল দেখলে আমাদের কষ্ট হয়!'

'কী জ্বালা, তা আমার মেয়ের জন্য একটু কষ্ট হলেও তোমরা সহ্য করতে পার না? আমি একটু কাঁদতে পারব না?'

'না!'

'কেন পারব না?'

'তোমার মেয়ে তো আর ছোটো নেই। তারও মেয়ে হয়েছে। তারও বিয়ে হয়ে গেছে এত দিনে। সে আর ছুটে আসবে না। বলবে না কোলে নাও।'

'কী বলছ?'

'হ্যাঁ সত্যি বলছি। জিজ্ঞেস করো না, গার্ডেনার পাখিদের। ওদের সঙ্গে তো তোমার সবচেয়ে বেশি দোস্তি।'

'না না, অমন বোলো না। আমি ভাবতে পারি না আমার মারিয়া বুড়ি হয়ে গেছে, আমার রোমি বড়ো হয়ে গেছে।'

হঠাৎ একটা কচ্ছপ বালিয়াড়িতে উঠে এসে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল।

'কী, তোমার কিছু বলার আছে? ক্যাকটাসের ফুলটা তো কত ভয় দেখাচ্ছে? কী বলো, তাকিয়ে আমাকে এত দেখছ কেন! আমাকে কি এর আগে আর দেখনি! যত্ত সব!' হানস ধমকে উঠল।

'না, দেখছিলাম হানস!'

'কী দেখছিলে!'

'দেখছিলাম, সারারাত পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বেলে বসেছিলে। বৃষ্টিতে ভিজেছ। তোমার অসুখবিসুখ হলে কী হবে! তুমি বুড়ো মানুষ, এভাবে ঠান্ডায় কেউ খোলা আকাশের নীচে বসে থাকে?'

'বা রে তোমরা জান না, একটা সাদা জাহাজ আসার কথা। আমাকে নিতে আসবে।'

'সাদা জাহাজে কোথায় যাবে?'

'আমার দেশে, আমার বাড়ি, রোমির কাছে।'

'ওরা কি আর সেখানে আছে! যুদ্ধে কে কোথায় হারিয়ে যায় কেউ জানে!'

হানস কচ্ছপটার কাছে গিয়ে বসল।

কচ্ছপটা খোলের ভিতর তার গলা ঢুকিয়ে নিল!

হানস চিৎকার করে বলল, 'মিছে কথা! মিছে কথা বলে বেশ গলাটি খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে বসে আছ। আমি বুঝি, তোমরা চাও না সাদা জাহাজটা আসুক!'

কচ্ছপটা এবার গলা বাড়িয়ে দিল, যেন হানস শুনতে পাচ্ছে, কচ্ছপটা বলছে, 'হানস তুমি কোথায় যাবে আমাদের ফেলে। আমরা তোমাকে যেতে দেব না।'

তখনই এল গার্ডেনার পাখিরা উড়ে। ওরা বলল, 'আমরা তোমায় যেতে দেব না।'

এল, অ্যালবাট্রাস পাখি, তারা বলল, 'আমরা তোমায় যেতে দেব না।'

এল সমুদ্রের ঢেউ। পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে বলল, 'হানস আমরা তোমায় যেতে দেব না।'

ইউকন গাছের জঙ্গলে গেলে শুনতে পেল, 'হানস তুমি আমাদের ফেলে কোথায় যাবে? তারা কেউ নেই। কিংবা কোথায় আছে, খুঁজে পাবে না। এক দুঃখ নিয়ে আছ। সেই থাক। জীবনে আবার একটা বড়ো ধাক্কা খাবে। হানস আমাদের ফেলে যেয়ো না।'

হানস দু-হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, 'না, আমি জাহাজ এলে চলে যাব। সাদা জাহাজ আসবে। তোমরা রাগ করছ। ঠিক আছে, যে ক-দিন জাহাজটা না আসে, আমি তোমাদের ফ্লুট বাজিয়ে শোনাব। তবু তোমরা আমাকে যেতে বারণ কোরো না। সাদা জাহাজটা এলেই খবর দিয়ো।'

সে তার আস্তানায় ফিরে তারপর শুয়ে পড়ল। আজ আর স্নান করল না। কিছু খেল না। তার কিছু ভালো লাগছে না। সে কপালে হাত দিয়ে দেখল, কেমন শরীরে সামান্য জ্বর জ্বর ভাব। আসলে সারাটা রাত খোলা

আকাশের নীচে ঠান্ডার মধ্যে বসেছিল বলে শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে। তার কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আস্তানায় ঢুকে সে শুয়ে পড়ল।

তখনই যেন এক জোড়া পাখি পায়ের কাছে উড়ে এসে বসল। বলল, 'এ কী, অবেলায় শুয়ে পড়লে। চান-টান করবে না, খাবে না?'

'শরীরটা ভালো নেই।'

'ভালো থাকবে কী করে। শরীরের কী দোষ। সারারাত ঠান্ডায় বসে থাকলে শরীর মানবে কেন! যাও চান-টান করে খেয়ে নাও।'

'ভালো লাগছে না কিছু!'

'আচ্ছা যাও তো। আমরা দেখে আসছি সাদা জাহাজটা আসছে কি না। বলেই যেন পাখি দুটো উড়ে গেল।'

স্নান করতে যাবার সময় দু-পাশে থাকে প্রাচীন সব গাছ ডালপালা। তারা আকাশ ঢেকে রেখেছে। ছায়ার ভিতর দিয়ে উঁচু-নীচু পথ। পাথর ডিঙিয়ে যেতে হয় কিছুটা। উপরে উঠে গেলেই পাহাড় আর পাথরের মধ্যে স্ফটিক জল। সেখানে লাল শাপলা ফুল ফুটে আছে। ফুলের ওপর এক জোড়া ওরিওল পাখি।

'কী, এত দেরি তোমার হানস?'

'এই এলাম।'

'অবেলায় স্নান করছ?'

'সাদা জাহাজা আসবে। তাই একটু দেরি হয়ে গেল।'

'সাদা জাহাজে চলে যাবে?'

'আর যাওয়া! কোনো পাত্তাই নেই জাহাজের। ম্যান্ডেলা বলে গেল, সাদা জাহাজ আসবে, কী যে হল বুঝছি না। আচ্ছা, আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো?'

ওরিওল পাখি দুটো এবার উড়ে এসে গাছের ডালে বসল। সোনা রঙের পাখি। যেন দুটো গাছের দুটো সোনার ফুল ডালে ফুটে আছে। ওরা বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হবে কেন হানস। সাদা জাহাজটার জন্য মন খারাপ! আচ্ছা, আমরা উড়ে দেখে আসছি। তুমি কিন্তু চান-টান করে খেয়ে নেবে। নাহলে আমরা ভারি রাগ করব।'

ওরা উড়ে চলে গেলে হানস পাড়ে পাতার পোশাক খুলে স্নান করতে নেমে গেল।

স্নান সেরে পাড়ে উঠে পাতার পোশাক পরার সময় মনে হল শরীরের ম্যাজম্যাজে ভাবটা কেটে গেছে। ঝরঝরে একেবারে। আসলে সারারাত জেগে থাকলে শরীর কার না খারাপ হয়। ভোরের দিকে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল-কিন্তু রোদ উঠতেই ঘুমটা চটকে গেছে। শরীর ক্লান্ত অবসন্ন। স্নান করায় সব আবার ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

আস্তানায় ফিরে এসে স্যুপ এবং এক ঝিনুক মধু খেয়ে শুয়ে পড়ল। সারা বিকাল ঘুমাবে। সন্ধ্যা হলে ফের পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বালবে। যেন যতদিন জাহাজটা না আসে তার এটা একটা বড়ো কাজ। এই দ্বীপটা ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে, তবু রোমির কথা মনে পড়ায় সে স্থির থাকতে পারছে না। রোমির মুখ, ভাসা ভাসা নীল চোখ, দুষ্টু হাসি-চোখ বুজলেই সে দেখতে পায় এখন।

রেন পাখিরা খবর আনতে গেছে।

ওরিওল পাখিরা উড়ে গেছে, কোনো সাদা জাহাজ এদিকে আসছে কি না দেখতে। ওরা এলে ঠিক খবর পেয়ে যাবে।

সে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। ওরা কখন যে আসবে!

ওর চোখে লেগে আসছিল। তখনই রেন পাখি দুটো ফিরে এসে ডাকল, 'হানস!'

হানস ধড়ফড় করে উঠে বসল। কেউ তাকে ডাকছে। সে দেখল, রেন পাখি দুটো কিচিরমিচির করছে।

'কোনো খবর পেলে না!'

'না।' ওদের ওড়াউড়ি দেখে হানস টের পেল, খবর ভালো না।

'কতদূর গেছিলে।'

রেন পাখি দুটো অনেক উপরে উঠে গেল। তারপর নেমে এল।

'তোমরা খুব উঁচুতে উঠে দেখলে?'

'হ্যাঁ।'

'কিছুই দেখতে পেলে না?'

'না।'

ওরিওল পাখিরাও ফিরে এল। তারা গেছিল উত্তরে। রেন পাখিরা গেছিল দক্ষিণে। দু-দিকের খবরই খারাপ।

হানস হাঁটতে থাকল।

'হানস!'

'বলো।'

'পুবে যাব? দেখে আসব?'

'যাও, যদি খোঁজখবর কিছু পাওয়া যায়।'

সুতরাং রেন পাখিরা গেল পুবে, ওরিওল পাখিরা গেল পশ্চিমে। সে উঠে গেল পাহাড়ের মাথায়। যদি সেও কিছু দেখতে পায়।

না, সাদা জাহাজের কোনো খবর নেই।

দিন যেতে লাগল এভাবে। রাতে সে পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বেলে বসে থাকে।

সে ক্রমে আরও বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। এক রাতে সে আর পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বালাতে গেল না। পরদিন সকালে দেখল, সব প্রজাপতি পাখি আর গাছপালার মধ্যে কেমন সাড়া পড়ে গেছে। এতদিন সে লক্ষ্যই করেনি, ক্যাকটাসগুলো মরে যাচ্ছিল, গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছিল, পাখিরা বাসা বানাচ্ছিল না, কচ্ছপ, ডলফিন সব কেমন তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ডাকলেও সে তাদের সাড়া পায় না।

আজ দ্বীপটা আবার আগের মতো। হাওয়ায় গাছের ডালপালা দুলছে। ক্যাকটাসগুলোতে ফের সবুজ আভা ফিরে আসছে। পাথরে পাহাড়ে আশ্চর্য সুষমা সে টের পেল। সে তার ফ্লুট বের করে অনেকদিন পর ফের পাথরে হেলান দিয়ে বাজাতে থাকল। পাখিরা উড়তে থাকল মাথার উপর। প্রজাপতিরা রংবেরঙের পাখা মেলে এসে ওর গায়ে বসল। ডলফিনরা সমুদ্রে ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে উঠতে থাকল। ভাসতে থাকল। দ্বীপটার কাছে এসে হানসের দিকে তাকিয়ে থাকল। হানসের মনেই থাকল না, রোমি বলে তার মেয়ে আছে। তার গাঁয়ের নাম ওবের আমের গাও, নদীর নাম রাইন। সে আবার দ্বীপের সচল বৃক্ষ হয়ে যেতে থাকল।

একদিন সকালে উঠে দেখল, ক্যাকটাসগুলোর ডালপালায় আবার আগের মতো সব বড়ো বড়ো ফুল। হলুদ নীল সবুজ সোনালি ফুল। ফুলে মধু। সে ঝিনুকে মধু তুলে নিয়ে গেল। পাতার পোশাক রিপু করল। পাতার তোশক বালিশ বাইরে বের করে রোদে দিল। শীত আসছে। শীতের সময়টা খুব কষ্টের। তখন দ্বীপটায় কোনো কোনো বছর দেখেছে তুষারপাত হয়। তখন পাখিরা কোথায় উড়ে যায়। প্রজাপতিরা ডালে, বনের ঝোপে লুকিয়ে থাকে। কেউ কেউ মারা পড়ে। তুষারপাতের পর তার কাজ কে কোথায় কেমন আছে খোঁজখবর নেওয়া।

সুতরাং ওর মনে হল শীত আসার আগেই, তার খাবার সংগ্রহ করে রাখতে হবে। তখন ক্যাকটাসগাছে ফুল থাকে না। মধু থাকে না। পাখিরা পাহাড়ের খোঁদল থেকে উড়ে যায়। বাসার খোঁজ পাওয়া যায় না। শীতে কচ্ছপরাও সমুদ্র থেকে উঠে আসে না। সবাই যে যার ওম খোঁজে।

এভাবে হানস জানে, শীত পার হলে সে আরও বুড়ো হয়ে যাবে, অথর্ব হয়ে যাবে। সাদা জাহাজের অপেক্ষায় সে পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বেলে বড়োই বোকামি করেছে। কোথায় সে যাবে। এ যে তার নিজের সাম্রাজ্য।

সে তার তোশক বালিশ রোদে শেষবারের মতো গরম করার সময়, শুনল, কেউ ডাকছে, 'হানস ওটো। আমরা এসেছি!'

হানস ওটো খুবই বিচলিত বোধ করে।

সে আবার শুনতে পায়, 'হানস ওটো, সেই সাদা জাহাজ আপনার এসেছে। আপনি কোথায়! সাড়া দিন।'

হানস কী করবে বুঝতে পারছে না। দেখল রেন পাখিরা, ওরিওল পাখিরা এবং গার্ডেনার পাখিরা খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওরা ওর মাথার উপর এসে ঝাপাঝাপি করছে। তবে কি শেষ পর্যন্ত সত্যি জাহাজটা এল!

সে গাছের মগডালে উঠে দেখল, বালিয়াড়ির দিকটায় একটা সাদা বোট। দূরে নোঙর করে আছে একটা সাদা জাহাজ। মানুষগুলোর পোশাক দেখে সে ঘাবড়ে গেল। সাদা হাফ শার্ট হাফ প্যান্ট, সাদা মোজা, মাথায় কালো টুপি। ওরা নেমেই চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। যেন ওরা তাকে ধরতে আসছে। সে তো এমন পোশাক দেখেছিল, সেই কবে, জাহাজের কাপ্তান, চিফ মেট সেকেন্ড মেট এমন পোশাক পরত। তার ভেতরে কেমন কাঁপুনি ধরে গেল।

ওরা কি ওকে ধরতে আসছে!

একটা লোক চোং মুখে দিয়ে বলছে, 'হানস ওটো সাড়া দিন। আপনাকে আমরা নিতে এসেছি।'

হানস দেখল সারা দ্বীপটা, তার পাখি, গাছপালা, প্রজাপতি সব কেমন নিথর হয়ে গেছে ভয়ে। ওরা কি তবে তাকে ধরে নিয়ে যাবে যুদ্ধবন্দি হিসাবে!

সে দৌড়োতে থাকল। গাছের আড়ালে, পাথরের আড়ালে সে দৌড়োতে থাকল।

ওরা একজন দু-জন নয়। অনেক। সারা দ্বীপ ছড়িয়ে পড়ছে। যেন ওরা তাকে ধরতে আসছে। কতদিন এমন মানুষজনের সঙ্গে তার দেখা নেই। কেমন ভিন্নগ্রহের জীব সব এরা। মুখে চোং, ফুঁকেই যাচ্ছে। সে গাছের আড়াল-আবডাল থেকে দেখছে। ভয়ে সাড়া দিচ্ছে না। সে তো অন্য এক জীবনের অভ্যাস গড়ে তুলেছে এই দ্বীপে। তার সঙ্গে এদের যেন কোনো মিল নেই। কেমন ভূতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার তার কাছে মনে হচ্ছে।

একজন ওদের সহসা চিৎকার করে বলল, 'কেউ নেই স্যার। দ্বীপে কোনো মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।'

কাপ্তান মানুষটি বলল, 'আবার তবে আকাশ ঘণ্টা বাজবে। সেই ভূতুড়ে মেয়েটা আর হারামজাদা ক্যাঙারুর বাচ্চাটা হাজির হলে তোমরা কেউ আর বেঁচে থাকবে না। যে করেই হোক লোকটাকে দেশে পৌঁছে দিতে হবে।'

'কী মজা! ম্যান্ডেলার কাজ! ঠিক সে তার পালকের টুপি পরে কাপ্তানকে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে। কিন্তু তার যে যেতে ইচ্ছে করছে না। সে গেলে এই দ্বীপটা জনহীন হয়ে যাবে। গাছপালা সব যেন মরে যাবে। পাখিরা ওড়াউড়ি করবে না। ক্যাকটাসে ফুল ফুটবে না।

হানস কিন্তু আর নিজেকে আড়ালে রাখতে পারছে না। একটা লোক তার আস্তানায় ঢুকে চিৎকার করে উঠল, 'স্যার আছে। এই যে এখানে একজন মানুষের ঘরবাড়ি। গাছের ডালপালার মধ্যে কিম্ভূÕতকদাকার সব তোশক বিছানা, বালিশ চাদর। স্যার, শিগগির আসুন।' পাহাড়ের মাথায় উঠে একটা লোক সহসা চিৎকার করে উঠল, 'আছে। এই তো এখানে কেউ আগুন জ্বেলেছিল রাতে। তার সব চিহ্ন।'

হানস বলল, 'কী হবে!' সে হ্রদের পাড়ে পাড়ে বনজঙ্গলের মধ্যে ছুটছে। রোমির মুখ মনে পড়ছে না। তার গাঁয়ের নাম ওবের আমের মনে পড়ছে না। তার নদীর নাম রাইন মনে পড়ছে না। এরা সবাই এখন তার কাছে ভিন্ন গ্রহের মানুষ। সে কেমন হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল। সে আর দৌড়োতে পারছে না। কেমন স্থবির হয়ে গেছে শরীর। আর তখনই দেখল অসংখ্য প্রজাপতি এসে তার গায়ে বসে পড়ছে। তার দু-হাত দু-পাশে ছড়ানো। দু-পা মোড়া। প্রজাপতিগুলো তার শরীরে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে বসে যাচ্ছে। তাকে আড়াল করে দিচ্ছে।

সহসা একটা লোক থমকে দাঁড়াল তার পাশে। সবাইকে ডাকছে। বলছে, 'শিগগির আসুন। কী সুন্দর সব প্রজাপতি রংবেরঙের। দেখুন একটা পাথরে তারা কী আশ্চর্য বুনো ঝোপ তৈরি করে বসে আছে।

তখনও চোং মুখে একটা লোক বলে যাচ্ছিল, 'হানস ওটো, আপনি সাড়া দিন। আমরা আপনার কোনো ক্ষতি করব না। যুদ্ধ কবেই থেমে গেছে। মানুষ আর যুদ্ধ চায় না। আপনি মুক্ত। আপনাকে আমরা নিতে এসেছি।'

কিন্তু সারা দ্বীপে তারা হানসকে খুঁজে পেল না। হানস এখন এই দ্বীপের একটা পাথর। তার গায়ে অসংখ্য প্রজাপতি।

টুপুর অরণ্য-অভিযান

১

কাগজটা পড়তে গিয়ে কেমন খটকা লাগল অহিভূষণের। একপাশে পাঁচের পাতায় ছোট্ট খবর। চোখে পড়লেও পড়া হয়নি। খুচরো খবর এত সকালে কে পড়ে! তারপরই কেন যে মনে হল, নতুন ট্রাম লাইন! কোনায় পড়ে-থাকা খবরটা নতুন ট্রাম লাইন হয়ে তাঁরই দিকে যেন এগিয়ে আসছে।

সকাল বেলায় তিনি ঝুলবারান্দায় এসে বসেন, কাগজ দিয়ে গেলে কাগজ পড়েন। বড়ো বড়ো খবরগুলি পড়েন, খুচরো খবরগুলি বাজার থেকে ফিরে ছেলেরা অফিস চলে গেলে পড়েন। আসলে দুপুরতক কাগজই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। তাঁর অবসর সময়টা কাগজই তাঁকে বেশি ব্যস্ত রাখে।

টুপু বারান্দায় ঝুঁকে বলল, 'দাদুমণি, বাজার যাবে না?'

'যাচ্ছি।'

তিনি কাগজ উলটে ফের খুচরো খবরটা খুঁজে বেড়ালেন। কোথায় সেই নতুন ট্রাম লাইন, ট্রাম লাইন তো তুলে দেওয়ার কথা হচ্ছে। টিকিস টিকিস করে চলে, রাস্তার অনেকটা জায়গা জুড়ে বিকল হয়ে পড়ে থাকে, রাস্তা জ্যাম করে দেয়, কোথায় সেই নতুন ট্রাম লাইন? কোথায় পাতা হচ্ছে, তিনি খুঁজেপেতে খবর পড়তে গিয়ে কিছুটা বিচলিত বোধ করলেন। ট্রাম লাইন তাঁর বাড়ির সামনেই পাতা হবে। মানিকতলা থেকে উলটোডাঙা ট্রাম লাইন পাতা হবে।

অহিভূষণ বিরক্ত হয়ে ভাবলেন, সরকারের ঘাড়ে ভূত চেপেছে। তারপরই ভাবলেন, ও একটা প্রস্তাব আছে-কত প্রস্তাবই তো সরকারের থাকে। ক-টা আর শেষপর্যন্ত হয়! তিনি কিছুটা মানসিক শক্তি যেন ফিরে পেলেন।

'কই রে টুপু, তোর মাকে ব্যাগ দিতে বল।'

'ব্যাগ তো তোমার পায়ের কাছে।'

'ও আচ্ছা, যাচ্ছি।'

ওঠার সময় ভাবলেন, এদের মাথায় কে যে বুদ্ধি দেয়। কোথায় জায়গা, ট্রাম লাইন কি মাথার ওপর দিয়ে নিয়ে যাবে? দু-দিকের আপ-ডাউন রাস্তা, মাঝখানে উলটোডাঙা পর্যন্ত গ্রিন ভার্স। গাছের চারাগুলি লাগাবার সময়কার তিনি সাক্ষী। শাল, শিরীষ, নিম, কৃষ্ণচূড়া বড়ো বড়ো গাছ বলতে এই। এদিকটায় তিনি কর্পোরেশনের বাবু মানুষটিকে হাত করে কবরখানা পর্যন্ত নিম, কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর চার কাঠা প্লটে বাড়ি করছেন, আর রাস্তায় গাছ লাগানো দেখছেন।

এক বর্ষা না কাটতেই সবুজের এক আশ্চর্য সমারোহ তাঁর বাড়ির সামনে। ফাঁকে ফাঁকে সব বোগেনভেলিয়া, চাঁপা, গন্ধরাজ, রক্তকরবীর গাছ।

'ব্যাগ দুটো নাও। কোথায় যাচ্ছ দাদুমণি!'

সত্যি তো, ব্যাগ না নিয়েই তিনি সিঁড়ি ধরে নামছিলেন। টুপু সারাদিন সময় পেলেই পায়ে পায়ে ঘোরে। আর তার অজস্র কথা।

'তোমার কি মন খারাপ দাদুমণি!'

'আমার মন খারাপ হতে যাবে কেন? পড়তে বসলি না। তোর মা কোথায়? হেমাঙ্গকে ডাক। সঙ্গে যাবে।'

'ও হেমাঙ্গদাদু, তুমি সঙ্গে যাও। দাদু একা পারে!'

'একা পারি না, তোকে বলেছি!'

দাদুমণি নামছেন। টুপুও লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে।

'তুই আবার নামছিস কেন?'

'আমি যাব।'

তা যায়।

আজকাল বাড়ি থেকে বের হলেই তাঁর সঙ্গ নেয় টুপু। এখন স্কুল ছুটি, পরীক্ষা হয়ে গেছে। পড়াশোনার চাপ নেই। এই মাসখানেক টুপু সারাদিনই তাঁর সঙ্গে থাকে। দু-জনে একসঙ্গে খায়, ঘুমোয়। টুপুই হেমাঙ্গদাদুকে ডাকডাকি করে ঘুম থেকে তুলে দেয়। দিবানিদ্রার পর সামান্য এক কাপ লিকার চা তাঁর খুব প্রিয়। টুপু সেটাও বোঝে।

তাঁর মন খারাপ, টুপু বুঝল কী করে!

মন তো খারাপই। খবরটা তাঁকে বেশ নিস্তেজ করে দিয়েছে। ট্রাম লাইন না হলে রাস্তাটার কী ক্ষতি হত! এতবড়ো চওড়া রাস্তায় এত গাছপালা কবে যে মহীরূহ হয়ে গেল! গাছ কাটা হলে বাড়িটার আর যেন কোনো অহংকার থাকবে না। রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে।

'তুই আমার সঙ্গে কী করতে যাবি? মাকে বলে এয়েছিস?'

'মা জানে।'

'কী করে জানবে? বউমা, বউমা, টুপু আমার সঙ্গে যাবে বলছে। হেমাঙ্গ ব্যাগ দুটো ধর তো।'

'ওকে নিয়ে যাবেন না। খাবার ভয়ে পালাচ্ছে। দুধ টেবিলে পড়ে আছে। কিছুতেই খাচ্ছে না।'

টুপু কোনো কথা বলছে না। সিঁড়ি ধরে নামছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। একা আর বেশিদূর যাওয়ার সাহস নেই।

'কী হল! যা। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন?'

'তুমি এসো।'

'না, আমি যাব না। তুই দুধ না খেয়ে গেলে আমার রক্ষা থাকবে!'

'দুধ খেতে ভালো লাগে না দাদুমণি।'

'কত কিছুই তো ভালো লাগে না, তাই বলে কি লোকে বসে থাকে! যা, দুধ খেয়ে আয়। দুধ না খেলে আমার সঙ্গে যাওয়া হবে না।'

'তুমি দাঁড়াও। যাবে না কিন্তু।'

টুপু ফ্রক কিছুটা তুলে লাফিয়ে ওপরে উঠে গেল। দরজায় ঢোকার মুখে একবার ফিরে তাঁকে দেখল। যদি ফেলে চলে যান!

অহিভূষণ, হেমাঙ্গ দু-জনই দাঁড়িয়ে আছেন। টুপু এলে তাঁরা রাস্তায় নেমে যাবেন। হেমাঙ্গ ব্যাগ দুটো কর্তাবাñর হাত থেকে নিয়ে বলল, 'আপনার কি শরীর খারাপ কর্তাবাবু!'

'শরীর খারাপ হবে কেন? সকাল থেকে তোরা কী আরম্ভ করলি বল তো! টুপু বলছে, তুই বলছিস, কেন আমার কি কিছু হয়েছে!'

হেমাঙ্গ কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'না, মুখ আপনার বড়ো শুকনো দেখাচ্ছে। রাতে বোধ হয় ভালো ঘুম হয়নি!'

'তোমার মাথা।'

'যাই বলুন, আপনার কিছু একটা হয়েছে।'

'হবে আবার কী! আচ্ছা, তুই খবর রাখিস?'

'আজ্ঞে, কীসের খবর?'

'সামনের রাস্তায় ট্রাম লাইন বসবে।'

'না তো, কেউ তো বলেনি!'

'বলবে।'

হেমাঙ্গ তার কর্তাবাবুকে বিলক্ষণ জানে। মনে কোনো কারণে খিঁচ ধরে গেলে রক্ষা নেই। ট্রাম লাইনের কোনো খিঁচ থাকতে পারে। ট্রাম লাইন হলে তো ভালোই। ফাঁকা ট্রামে মানিকতলা, শিয়ালদা-বসে যাওয়া যাবে। বুড়ো মানুষদের ফাঁকা ট্রামই ভালো। কর্তাবাবু ফাঁকা ট্রামে চৌরঙ্গি চলে যেতে পারবেন। ময়দানে হাওয়া খেতে পারবেন। বাসে, মিনিবাসে ভিড়, ওঠে কার সাধ্য। ফাঁকা ট্রামে উঠে পড়তে পারলে হাওয়া খাওয়ারও সুবিধে হবে। বাসে, মিনিবাসে উঠতে পারেন না, ঘরেই বসে থাকেন। বিকেলে নাতনিকে নিয়ে যে হাওয়া খেতে বের না হন, তাও নয়। তবে ওই বিধান শিশু উদ্যান, অথবা খুব দূরে গেলে বেঙ্গল কেমিক্যাল, তারপর তো সব জলা জায়গা, জমি ভরাট হচ্ছে, লবণ হ্রদে ঘরবাড়ি উঠছে। একটা নতুন রাস্তা বের করার জন্য জরিপের কাজ চলছে। ওদিকটায় বনজঙ্গল আছে। কর্তাবাবু বেশি দেরি করে ফিরলে বোঝাই যায়, তিনি জঙ্গল পার হয়ে লবণ হ্রদে ঢুকে গিয়েছিলেন।

'আজ অনেকটা হাঁটলেন।'

'কে বলল? আজ অনেক হেঁটেছি!'

'এত দেরি। বেশিদূরে না গেলে এত দেরি হওয়ার তো কথা না।'

'তা গিয়েছিলাম। জায়গা আর ফাঁকা থাকছে না হেমাঙ্গ। বনজঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে। বেঙ্গল কেমিক্যালের রাস্তায় সব বড়ো বড়ো বাড়ি উঠছে। লোকজন বেড়ে যাচ্ছে। বাস গুমটির কাছে হাউসিং এস্টেটের বোর্ড ঝুলছে।'

'কোথায় ঝুলছে না! উল্টাডাঙার দিকে যান না। দেখবেন কী ছিল, কী হয়ে গেল! অশ্বিনীবাবুর বাগান এখন প্লট করে বিক্রি হচ্ছে। লাইনের ধারে ঝুপড়ি সব উঠে গেল। মোড়ে এদিক-সেদিক সবই হাউসিং এস্টেটের। সরকার নিজেই ঘরবাড়ি বানাচ্ছে। ফাঁকা জায়গা থাকবে কী করে!'

এসব কথা অনেক আগেকার। তিনি বাড়ি করছেন, রাস্তা চওড়া হচ্ছে। বিদেশি শহরের মতো রাস্তার মাঝখানে গ্রিন ভার্স। কর্পোরেশনের লোকগুলি বলেছিল, শহরে গাছপালা নেই, এখন সরকার রাস্তার মাঝখানে বনজঙ্গল সৃষ্টি করবে। দু-ধারে রাস্তা, একদিকে যাওয়ার, একদিকে ফেরার।

এমন জায়গায় চার কাঠা জমির ওপর বাড়ি করে বেশ আত্মপ্রসাদে ভুগছিলেন অহিভূষণ। কপাল গুণে এসব জায়গায় বাড়ি করা যায়। তারপর গাছপালা রাস্তার মাঝখানে বড়ো হয়ে গেলে গিন্নি সারাদিন দোতলা থেকে গাছের ডালপালার ওড়াউড়ি দেখতেন। শরীর কোনোদিনই তাঁর বিশেষ জুতের ছিল না। শেষ দিকটায়

একেবারেই ঘরবন্দি হয়ে গেলেন। অ্যাটাচড বাথ আর সামনের ঝুলবারান্দায় যা একটু হাঁটাহাঁটি। গাছগুলো মানদাকে যে প্রসন্ন রাখত, গিন্নির মেজাজ লক্ষ করলে টের পেতেন।

'কী দেখছ?'

'কী সুন্দর সব ফুল ফুটে আছে।'

'কত লম্বা সব ডালপালা। তোমার শ্বাসের কষ্ট, গাছগুলো হাওয়ার সব দূষণ দূর করে দিচ্ছে। বাস, মিনিবাস তো কম গ্যাস ওগলায় না! গাছগুলো সব হজম করে ফেলছে।'

'আমি না থাকলেও গাছগুলি থাকবে। কী যে ভাবতে ভালো লাগে।' মানদার মুখেও সেদিন একধরনের আত্মপ্রসাদ লক্ষ করেছিলেন।

'আমরা না থাকলেও গাছগুলি থাকবে। গাছ তো কেটে না ফেললে সহজে মরে না। শাল, শিরীষ গাছগুলোর ডালপালা বড়ো হয়ে একদিন দেখবে রাস্তাটা ঢেকে দেবে। গরমের সময় গরম থাকবে না। শীতের সময় পাখিরা উড়ে আসবে। কিছু ভালো না লাগলে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখলেও মন ভরে যাবে।'

টুপু তখনই দৌড়ে নেমে আসছে। হেমাঙ্গর ইচ্ছে নয় টুপু সঙ্গে যাক। সারা রাস্তায় জ্বালাবে।

'টুপুকে সঙ্গে নেওয়া কি ঠিক হবে?' কথাটা বলে হেমাঙ্গ কর্তাবাবুর দিকে তাকাল।

'গেলে কী হবে।'

'এতটা রাস্তা হাঁটবে, তাই বলছিলাম।'

'কী রে টুপু, হাঁটতে পারবি তো?' অহিভূষণ নাতনির চুলে বিলি কেটে দিল, টুপু দাদুমণির শরীরে একেবারে মিশে গেল। হেমাঙ্গ সঙ্গে যায়, টুপুও যায়। তবে টুপু গেলে গাড়ি বের করতে হয়। গাড়িটা মেরামতের জন্য গ্যারাজে, টুপুর যাওয়া ঠিক হবে না, হেমাঙ্গ এমন ভাবতেই পারে। তখন টুপু ভাবল, মা দাদুমণিকে কিছু বলতে পারে না, টুপুর সব দুষ্টুমিকে দাদুমণি প্রশ্রয় দেন, টুপুর মাথা খাচ্ছে, আড়ালে-আবডালে সুযোগ পেলে মা বলতে ছাড়ে না।

কিন্তু হেমাঙ্গদাদুর নিস্তার নেই।

'হাঁটু ছিঁড়ে গেছে কী করে? তুমি তো সঙ্গে ছিলে হেমাঙ্গকাকা।'

'সঙ্গে তো ছিলাম। কিন্তু কথা শোনে! বললাম ওভাবে দৌড়োয় না, কে শোনে কার কথা। কর্তাবাবু চেয়ে থাকেন শুধু। আরে ছেলেমানুষ ছুটবে না, তুমি ছুটবে! তুমি ছুটলে হেমাঙ্গ, বুড়ো হাড় সহ্য করবে! ডিমের খোসার মতো নরম বুড়োমানুষের হাড় জান! বাচ্চারা ছুটবে না তো, দাঁড়িয়ে থাকবে!'

'ওঁর কথা বাদ দিন কাকা। আমি তো আপনার ভরসাতেই যেতে দিই।'

ওটা যে মিছে কথা, টুপু ভালোই জানে। দাদুর সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে বের হলে, কার সাহস আছে 'না' করে! দাদুমণি গাছপালার মধ্যে ঢুকে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন কেন, সে বোঝে না। কিছুটা জঙ্গলের বাই আছে। গাঁয়ের মানুষ, জঙ্গলে ঘোরাঘুরির অভ্যাস থাকতেই পারে। কোনো এক বয়সে গাঁয়ে ছিলেন, গায়ে কি তার গন্ধ লেগে থাকে! দেশভাগের আগের কথা সেসব। মা মুখ ব্যাজার করে কথাটা বলবে, বাঙাল কি আর সাধে বলে!

তখন টুপুর খুব রাগ হয়।

অবশ্য দাদুমণির গাছের ব্যারাম আছে সে নিজেও বোঝে! এইতো সেদিন, কবে যেন মনে নেই, তবু সে বড়ো হতে হতে বুঝেছে, দাদুর টবগুলিতে হাত দিলে খেপে যান। সারা ঘর ভরতি দাদুর শুধু টবে-লাগানো গাছ। বোগেনভেলিয়া, বট, অশ্বত্থ থেকে গোলাপের টব। একটা টবে তেঁতুল গাছও লাগিয়ে তাকে সাইজমতো শাসন করে রেখেছেন। বাড়তে দিচ্ছেন না। ছাদে পা ফেলা যায় না। বেত গাছ, কুমড়ো, লাউ, শজনে, সয়াবিনের গাছও আছে। কুমড়োর লতায় তিনি কুমড়ো ফলিয়েছেন, কাঁচা লঙ্কা, বেগুন, টমেটো গাছও তাঁর টবে বাড়ছে। ছাদে কিংবা দাদুমণির ঘরে ঢুকলে তারও কম আনন্দ হয় না। সে একদিন মহানন্দে কাঠমালতী গাছ থেকে ক-টা পাতা তুলে নিয়েছিল। রান্নাবাটি খেলার জন্য লাগে। ভাত, ডাল, মাছ, আলু-

কপির তরকারি তাকে তখন রাঁধতে হয়। গাছের নানা রঙের পাতা জড়ো করে বউ সাজে। রকমারি সব খেলনা, এই যেমন উড়োজাহাজ, বাস, মোটর, হাতি, ঘোড়া এবং একটি বেঢপ হনুমানকে নিয়ে তার সংসার। বাড়িতে সবাই খায়, তারা খাবে না, কী করে হয়! সে পাতা তুলে পা টিপে-টিপে পালাতেই ধরা পড়ে গেল।

'দেখি, হাতে কী?'

'কিছু না।'

'হাত দেখাও।'

'না, দেখাব না।'

'কী মেয়ে রে বাবা, দেখাবি না, দাঁড়া।'

দাদু রেগে গেলে সে ভয় পায়। গাছ থেকে পাতা ছিঁড়লে দাদু রাগ করেন। আড়ালে সে আরও দু-একবার টবের গাছ থেকে পাতা তুলেছে, ফুল তুলেছে। তবে ফুল তুললে দাদুর রাগ হয় না। ফুল টেবিলের ফুলদানিতে রেখে দিলে খুশিই হন। সেদিনও ভেবেছিল, দাদুমণি যখন ঘরে নেই, ক-টা পাতা তুলে নিলে আর কে দেখতে পাবে!

কিন্তু দেখে ফেলল।

'এই তো দেখো না।'

সে হাত বিছিয়ে পাতাগুলি দেখাতেই দাদু গোমড়া মুখে খাটে গিয়ে বসে পড়লেন। ডাকলেন, 'কাছে এসো।'

কাছে যেতেই হাতে চিমটি কেটে বললেন, 'কী, লাগে?'

'না, লাগে না।'

আরও জোরে চিমটি কাটলেন।

'কী, লাগে?'

তার চোখে জল চলে এসেছিল।

তবু সে বলল, 'না, লাগে না।'

শেষে এমন জোরে চিমটি কেটে দিলেন যে, সে ভ্যাক করে কেঁদে ফেলেছিল।

'তা হলে বুঝছ, লাগে।'

তার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে।

'তোমার যেমন লাগে, পাতা ছিঁড়লে গাছেরও লাগে। আর ছিঁড়বে?'

'না।'

আর দাদুমণির কী হল কে জানে, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'গাছ বড়ো হয়। জান, গাছেরও প্রাণ আছে। তাকে অকারণ কষ্ট দিতে নেই।'

তারপর সে আর কোনোদিন গাছের পাতা ছেঁড়েনি, ডাল ভাঙেনি। দাদুর সঙ্গে বসে গাছের পরিচর্যা করেছে, দাদুকে খুরপি এগিয়ে দিয়েছে, দাদুর ফুট-ফরমাশ খেটেছে। দাদুর সঙ্গে বসে গাছের পরিচর্যা করলে সে দেখেছে, দাদু খুব প্রসন্ন থাকেন।

গাছের পরিচর্যা করলে যা হয়, মায়া বাড়ে, গাছের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। কেউ কাছে না থাকলে, টুপু গাছের সঙ্গে কথাও বলে।

২

রাস্তায় নেমে দাদুমণি কাকে যেন খুঁজছেন।

হেমাঙ্গদাদুর হাতে ব্যাগ। সে বাজারের দিকে হাঁটা দিয়েছে। দাদুমণি যে কাকে খুঁজছেন! হেমাঙ্গদাদুটা কী! একবার পেছনে তাকাবে না। হনহন করে হাঁটলেই হল!

সে ডাকল, 'দাদুমণি, হেমাঙ্গদাদু চলে যাচ্ছে।'

তিনি তার কথা শুনলেন না। কাউকে তিনি খুঁজছেন।

রাস্তার দোকানপাট একটাও খোলেনি। এত সকালে খোলার দরকার হয় না। মানুষজনের ঘুম থেকে ওঠারই সময় হয়নি। দোকানের শাটার সব বন্ধ। গলির মুখে একটা উনুনে ধোঁয়া উঠছে। বদুদার তেলেভাজার দোকান এটা, সে জানে। খুব সকালে স্নান-টান সেরে বদুদা দোকানের টাটে এসে বসেন। বাড়ি বাড়ি সকালে বেগুনি, চপ, শিঙাড়া পাঠিয়ে দেন। মাসের শেষে টাকা নেন হিসেবমতো।

দাদু গলিটায় ঢুকে গেলেন।

সে বুঝল, দাদুমণি বদুদাকেই খুঁজছেন।

বদুদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। সূর্যপ্রণাম করছে।

'এই বদুদা।'

'কী রে টুপু, রাস্তায় একা!'

'দাদুমণি ঠিক তোমাকে খুঁজছে। এত সকালে কেউ তো দোকান খোলে না।'

'কোথায় অহিদা?'

'গলিতে ঢুকে গেল।'

সে গলির মুখে গলা বাড়িয়ে ডাকল, 'দাদুমণি, হেমাঙ্গদাদু চলে গেছে। তুমি বাজারে যাবে না! বদুদা রাস্তায় সূর্যপ্রণাম করছে।'

দাদুমণি ফিরে আসছেন।

'আপনি আমাকে খুঁজছিলেন অহিদা!'

'মোটেই না।'

'টুপু যে বলল।'

'হ্যাঁ, শোনো, কোনো খবর পেলে?'

'কীসের খবর বলুন তো?'

'বা রে দেখোনি? আজকের কাগজে খবরটা আছে।'

'কী খবর! খুব জরুরি খবর কি! না জানলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে!'

'সমূহ বিপদ। তুমি খবরটাই দেখোনি! বেলা তো ভাই কম হল না! ট্রাম লাইন পাতবে সরকার। ট্রাম লাইন কি মাথার ওপর দিয়ে নিয়ে যাবে?'

'ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভরসা। পাতে পাতুক না। এই নিয়ে আপনার দাদা মাথা গরম সাজে না। সকালে ঠাকুরদেবতার নাম নিন।'

'তুমি কিচ্ছু জান না বদু?'

'আজ্ঞে না।'

'ঠিক আছে, বাজার সেরে আসি। কাগজটা পাঠিয়ে দেব।'

'দাদুমণি, হেমাঙ্গদাদুকে দেখা যাচ্ছে না।'

'যাবে। কোথায় যাবে! ব্যাটা ঠিক পিতুর দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ওখানে চা খাবে। আমরা না গেলে নড়বে না।'

'এই রিকশা।'

'আজ্ঞে, যাই বাবু।'

'এই টুপু, উঠে পড়।'

টুপু লাফ দিয়ে রিকশায় উঠে পড়ল।

দাদুমণিও উঠলেন। টুপু দাদুমণিকে ধরে বসে আছে। দাদুমণির সঙ্গে বের হলে নানা মজা। এই যে রিকশা টুং টাং করে ঘন্টি বাজাবে আর কদম দেবে ঘোড়ার মতো, টুপুর খুব ভালো লাগে! একটা আতঙ্কও থাকে তার। রিকশা উলটে গেলে কী হবে, এই আতঙ্ক। মাঝে মাঝেই মনে হয় এই বুঝি উলটে গেল! সে তখন দাদুমণিকে জড়িয়ে ধরে বলবে, 'ও মা, পড়ে যাব দাদুমণি।'

'পড়বি না। ঠিক হয়ে বোস।'

রিকশাটা রেলপুলের নীচ দিয়ে বাজারের মুখে ঢুকে গেলে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ ভাই রিকশাওয়ালা, তুমি খবর রাখো?'

গামছা দিয়ে মুখ মুছে অহিভূষণের দিকে তাকাল লোকটি।

'তুমি দাঁড়াও। বাজার করে আসছি।'

'আজ্ঞে বাবু।'

টুপু হেমাঙ্গদাদুকে খুঁজছে। এদিকটায় ঘরবাড়ি উঠছে। ট্রাক থেকে ইট, রড, বালি নামানো হচ্ছে। বাস, মিনিবাস দুটো-একটা রাস্তায় দেখা যাচ্ছে। লোকজনের চলাচল বাড়ছে। শুধু সে হেমাঙ্গদাদুকে দেখতে পেল না।

'দাদুমণি এসো! দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?'

'হ্যাঁ, ভাই রিকশাওয়ালা, তুমি কি জানো, ট্রামলাইন সত্যি পাতা হবে। কোনো খবর রাখো?'

'আজ্ঞে না কর্তা।'

'বেশ ভালো। খবর না রাখলেই ভালো!'

রেলপুলের নীচ দিয়ে আসার সময় দেখেছেন, জমি খোঁড়া হচ্ছে। পুলের নীচে জমি খুঁড়ে মাটি তোলা হচ্ছে। লোকগুলো কি পাগল! এই সেদিন দেখলেন, বছর-দুই ধরে কীসব ঢালাই-ফালাই করে, পুলের দু-ধারে স্ল্যাব গেঁথে দেওয়া হল। আবার মাটি তোলা হচ্ছে কেন! জমি কি কামড়ায়! পুলের নীচ দিয়ে বাস, মিনিবাস সবই যায়। অসুবিধে হয় না। তবে বোঝাই ট্রাক যেতে পারে না। বোঝাই ট্রাক ঢোকার জন্য জমি নীচু করা হতে পারে। রাস্তাটা এই সেদিন এত প্রশস্ত করার পর, আপ-ডাউনে বাস, মিনিবাস সহজেই চলতে পারে। কেন যে ফের খোঁড়াখুঁড়ি! আরে, কাজগুলো একেবারে সেরে ফেলা যায় না! রাস্তা পাকা করার কী দরকার ছিল! খোঁড়াখুড়ি করলে রাস্তা নষ্ট হয় না!

হেমাঙ্গই তাড়া দিল এসে।

'কী দেখছেন?'

'কী হচ্ছে দেখছ না? আবার খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছে।'

'হবে। সরকারের কত দায় জানেন! আমরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমাই। সরকারের কি সে উপায় আছে! যখন যে সরকার আসে জনগণের উন্নতিকল্পে, সে তার মতো কাজ করে চলে যায়। পরের সরকার এসে ভেঙেচুরে ফের সব ভন্ডুল করে দেয়। আগের সরকারের মাথা যে পরিষ্কার ছিল না, জনগণকে বুঝতে দিতে হবে না!'

'তাই বলে এমন সুন্দর গ্রিন ভার্স নষ্ট করে ফেলা হবে!'

'নষ্ট হবে কেন?'

'লাইন না হলে পাতবে কোথায়!'

'আপনিও যেমন, কিছুই ঠিক নেই, কাগজে কী পড়ে সকাল বেলাতেই মাথা খারাপ। দেখুন কী হয়!'

'আমার কিন্তু ভালো লাগছে না হেমাঙ্গ। কবে থেকে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হল, লক্ষই করিনি।'

টুপু কিছুই বোঝে না। তবে বোঝে, দাদু তার খুবই ফ্যাসাদে পড়ে গেছেন। লাইন পাতা নিয়ে দাদুর মাথা গরম। বাড়ির সামনে এমন সুন্দর বনভূমি সরকারই বানিয়ে দিয়েছিল। আবার সরকারই সব গাছ তুলে

একেবারে খালি জমি বানিয়ে দেবে।
এই সরকার বেশ অদ্ভুত, এটাও মনে হল টুপুর। তার ধমক দিতে ইচ্ছে হল। সে দাদুর হাত ধরে চিৎকার করে বলল, 'তোমরা জমি খুঁড়ছ কেন? অমলকাকুকে বলে দেব।'
অমলকাকুকে পাড়ার লোকজন খুবই মান্য করে। দাদু পর্যন্ত।
অহিভূষণের হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, সত্যি তো, অমলকে ডেকে বললেই হবে। রাস্তায় খ্যাপা মানুষের মতো ঘোরাঘুরি পুত্ররা পছন্দ নাও করতে পারে।
লাইন কেন পাতবে, কী এত জরুরি দরকার! বাস, মিনিবাসের তো অভাব নেই। ক-টা লোকের উপকার হবে এতে! ক-টা লোক উলটোডাঙা থেকে বিবাদি বাগ কিংবা ধর্মতলা যায়, গেলেও এত রুট থাকতে আবার রাস্তা জ্যাম করে লাইন পাতা কেন, আর তার খেসারত দেবে রাস্তার মাঝখানে লাগানো সরলবর্গীয় বনভূমি-এটা যে তাঁর কত বড়ো পীড়ন, পুত্ররা ঠিক বুঝবে না! তিনি এখন যাকে দেখছেন, তাকেই প্রশ্ন করছেন, খবরটা সত্যি কি না! এত বড়ো খবর কাগজে এত ছোটো করে ছাপারও মানে হয় না। কারও নজরেই পড়েনি।
অহিভূষণ বাজার থেকে ফেরার সময়ই হেমাঙ্গকে বললেন, 'টুপুকে নিয়ে তুই বাড়ি চলে যা। আমি পরে যাচ্ছি।'
'পরে যাবে কেন! সকালে কিছু খাননি। ওষুধ খাননি। কোথায় আবার টুঁ মারবেন?'
'অমলের কাছে যাব।'
'এখন তাঁকে পাবেন?'
'এখন না পেলে কখন পাব! সকালেই বাড়ি থাকে, তারপর তো সারাদিন দেশোদ্ধার করে বেড়ায়।'
দেশোদ্ধার! তা হলেই হয়েছে। এখন আর দেশোদ্ধারের আছেটা কী, নিজের উদ্ধার কার্যটি ছাড়া এরা কিছু বোঝে!
অহিভূষণ তাঁর এই সাবেক আমলের ভৃত্যের সঙ্গে কথা বলে জুত করতে পারেন না। এখনই এমন একটা অজুহাত খাড়া করবে যে অমলের কাছে তাঁর যাওয়াই হয়ে উঠবে না। একটু ঘুরে গেলেই অমলের বাড়ি।
হেমাঙ্গ প্রায় ধমকই লাগাল।
'বাড়ি চলুন। প্রেশারের ওষুধ খেয়েছেন?'
'খাইনি। কিছু না খেয়ে খাই কী করে!'
'অমলবাবুর বাড়ি গেলে দেরি হয়ে যাবে না!'
'তা যেতে পারে।'
'যেতে পারে যখন, যেতে হবে না। অমলবাবুকে খবর দেব। আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন!'
'কখন যাবি?'
'দেখি, এত কী জরুরি কাজ ওখানে, বুঝছি না আপনার! আগে বাড়ি চলুন।'
যেন একা ছেড়ে দিলেই তার কর্তাবাবুটি হারিয়ে যাবেন।
টুপুরও কেমন ভয় ধরে গেল। সকাল থেকে দাদুমণি যা করছেন! সে বলল, 'তুমি বাড়ি চলো দাদুমণি। বাড়ি না গেলে বাবা রাগ করবে।'
বাজারের ব্যাগ হেমাঙ্গ রিকশায় তুলে দিয়ে বলল, 'টুপু দিদিমণি, কর্তাকে বুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে যান। বয়স যত বাড়ছে...' আর কিছু বলতে সাহস পেল না হেমাঙ্গ। টুপু দাদুমণির হাত ধরে টেনে আনছে, আর হাত ছুড়ে বলছে, 'তোমাকে এখন কোথাও যেতে হবে না। বাড়ি চলো।'
অহিভূষণ টুপুর আবদারে খুবই কাহিল।
'আরে তুই হেমাঙ্গর সঙ্গে চলে যা। আমি অমলের বাড়ি হয়ে যাচ্ছি। বেশিক্ষণ লাগবে না বলছি তো!'

হেমাঙ্গ বলল, 'আপনি রিকশায় উঠে বসুন। টুপু আমার সঙ্গে যাবে না বলছে।'

'কেন যাবে না?'

হেমাঙ্গ টুপুকে চোখ টিপে দিল।

টুপু খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে সহজেই সব বোঝে।

টুপু চিৎকার করে বলল, 'আমি যাব না। হেমাঙ্গদাদুর সঙ্গে যাব না। তুমি সঙ্গে চলো। তুমি সঙ্গে না গেলে যাব না।'

অগত্যা অহিভূষণ আর কী করেন! বাড়িতে কিংবা বেড়াতে বের হলে টুপুর যত আবদার তার কাছে। যা চঞ্চল, রাস্তায় কোনো বিপত্তি না বাধিয়ে বসে! হেমাঙ্গর ক্ষমতা নেই তখন টুপুকে সামলায়। বলা যায় না, রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নেমে যেতে পারে। গ্রিনভার্সের ভেতর ঢুকে গেলে খুঁজে পাওয়া কঠিন। গাছের নীচে বর্ষায় ঝোপঝাড় বেশ বেড়ে উঠেছে। ফড়িং, প্রজাপতির অভাব নেই। পাখিরাও, বিশেষ করে এই সময়টায় টুনটুনি পাখিদের ডিম পাড়ার সময়। গন্ধরাজ কিংবা রঙ্গন ফুলের পাতা জড়ো করে ছোটো বাসা বাঁধতে পাখিরা ওস্তাদ। টুনটুনি পাখির ডিম দেখার বড়ো আগ্রহ টুপুর। গত বর্ষায় তিনি খোঁজাখুঁজি করেছিলেন। পাখিরা তখন ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা উড়িয়ে দিয়েছে। পাখির বাসা অনেক খুঁজে পেয়েছিলেন, তবে ডিমের খোসা ছাড়া বাসায় কিছু পড়ে থাকতে দেখেননি।

'না রে, টুপু, সব পাখির ডিম ফুটে ছানা হয়ে গেছে। নেই।'

'ওই যে বাসাটা। উঁকি দিয়ে দেখো না।'

ডাল নামিয়ে এনে দেখিয়েছিলেন, 'নেই, দেখ। উড়ে গেছে ছানা।'

'তবে যে বললে, তুমি আমাকে টুনটুনি পাখির ডিম দেখাবে।'

'এবারে দেখছি হল না। আগামীবার দেখা যাবে।'

টুপুর স্মৃতিশক্তি প্রবল। বর্ষা আসার কথা জুন মাসের সাত তারিখ। কাগজ দেখে সেদিন হেমাঙ্গকে কথাটা বলতে গিয়ে অহিভূষণ বেকুব।

কোথা থেকে লাফিয়ে বের হয়ে এল টুপু।

'দাদুমণি, পাখির ডিম দেখাবে না?'
'হ্যাঁ, তাই তো, ভুলেই গেছি।'
'কবে যাব!'
টুপুকে একটু গোলমালে ফেলে দেওয়ার জন্যই বলা, 'বর্ষা এলই না। আগে আসুক।'
'কাগজে যে লিখেছে...'
'আরে কাগজের কথা কি সব সত্যি হয়?'
'সত্যি না হলে বললে কেন, বর্ষা আসছে।'
'কিন্তু টুপু, তুই কি জানিস বর্ষায় বনে-জঙ্গলে কত পোকামাকড় উড়ে আসে। গাছগুলোর গায়ে শুঁয়োপোকার উপদ্রবও থাকে।'

শুঁয়োপোকাকে খুবই ভয় পায় টুপু। ঘরে একবার মেঝেতে জঙ্গল থেকেই উঠে এসেছিল একটা লম্বা শুঁয়োপোকা, কী করে দোতলার মেঝেতে যে উঠে এল, বেশ লম্বা, বুড়ো শুঁয়োপোকা বোঝাই যায়। খুবই ধীরগতি। লোমগুলো কালো হয়ে গেছে। দেওয়ালে কিংবা ছাদের কোনাখামচিতে আশ্রয় পাওয়ার জন্যই যে ঘরে হাজির, তাও জানেন অহিভূষণ।

টুপু শুঁয়োপোকা দেখেই লাফ দিয়ে খাটে উঠে গিয়েছিল। আর আর্ত চিৎকার, যেন বন্যার জলে ভেসে যাচ্ছে টুপু, দু-হাত ওপরে তুলে ডাকছে, 'দাদুমণি, শিগগির এসো, শুঁয়োপোকাটা দেখো দেওয়ালে উঠে যাচ্ছে।' অহিভূষণ ঘরে ঢুকে কী যে করেন! নিরীহ পোকামাকড়, অথচ আতঙ্ক থেকেই যায়। জামাকাপড়ে ঢুকে গেলে, কিংবা টুপুর তোশক-বালিশে যদি লুকিয়ে পড়ে, বড়োই কেলেঙ্কারি ব্যাপার। গায়ে মাখামাখি হয়ে গেলে চুলকুনি আর আগুনে সেঁকা খাবার মতো জ্বালা, তিনি নিজেও সেটা ভালো জানেন। তাড়াতাড়ি কাগজ ছিঁড়ে পোকাটার ওপর ফেলে দিয়ে জুতোর ডগায় টিপে দিতে নীলমতো পেট থেকে লালা বের হয়ে গিয়েছিল। মরা শুঁয়োপোকাটাকে কাগজে চেপে তুলে নিতেই টুপু দাদুর হাঁটুর কাছে হাজির। দাদুর এত সাহস আছে বলেই, সে দাদুমণিকে টারজান কিংবা অরণ্যদেব ভেবে থাকে। বনে-জঙ্গলে যতই পোকামাকড় থাকুক, দাদু সঙ্গে থাকলে তার ভয় থাকে না। কত সহজে, এবং কত অনায়াসে, ঘর থেকে শুঁয়োপোকার ভূত দাদু নিমেষে হাওয়া করে দিলেন!

কাজেই দাদুমণি সঙ্গে থাকলে বনে-জঙ্গলে যতই ঘুরে বেড়াক-টুপু কখনো ভয় পায় না। বরং সে দাদুর দোহাই দিয়ে খুবই দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারে। হেমাঙ্গর সঙ্গে গেলে টুপু যে রিকশা থেকে লাফিয়ে নেবে যাবে না, তাও জোর দিয়ে বলা যায় না।

এই এক আপদ মাঝে মাঝে ঘাড়ে চেপে থাকে। টুপুর সাহস বেজায় বেড়ে গেছে। তার কারণও আছে। গ্রিনভার্সের গাছপালার পাতা ঝরা শুরু শীতের শেষাশেষি। তখন পলাশ, রাধাচূড়ার বিশাল গাছগুলিতে লাল-হলুদ ফুলের সমারোহ থাকে। টুপুকে নিয়ে বিকেলে ভ্রমণে বের হয়ে কী মনে হয়েছিল, গ্রিন ভার্সের ভেতর ঢুকে গিয়েছিলেন। দশ-পনেরো গজ দূরে দূরে এক-একটা গাছ। তার মাঝখানে ছোটো ছোটো ফুলের গাছ, সবারই কম-বেশি পাতা ঝরছে, হাওয়ায় পাতা উড়ছে। এই ওড়াউড়ির মোহ থেকেই হয়তো গ্রিন ভার্সে ঢুকে যাওয়া। দুটো শাল গাছের পরই একটা দেবদারু গাছ। গাছের কাণ্ডে কী ঝুলে আছে নীলমতো সরু কিছু। কাছে যেতেই বুঝলেন, লাউডগা সাপ।

শহরে বাড়িঘর বানাবার পর, চোখের সামনে লিকলিকে বেতের মতো সাপটা দেখে তাঁর আনন্দই হয়েছিল। নির্বিষ সাপ বলেই তিনি জানেন। তবে কেউ তো ঠিক কিছু জানে না, পাতার ওপর দিয়ে অনায়াসে উড়ে যেতে পারে। পলকে অদৃশ্যও হয়ে যেতে পারে। তিথি-নক্ষত্র যোগে ব্রহ্মতালুতে ছোবল বসালে বজ্রাহতের মতো মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়তে হয়-এমনও শুনেছেন। সত্যি-মিথ্যা যাচাই হয়নি। নীলকান্তমণির মতো দুটো উজ্জ্বল রক্তবর্ণ চোখ দেখলে মোহিত হয়ে যেতেই হয়।

টুপুই চিৎকার করে উঠেছিল, 'দাদু, সাপ!'

টুপুই হাত টেনে ধরেছিল, 'দাদু, সাপ!'

'আরে। সাপ কি আমাকে খেয়ে ফেলবে?'

শীত চলে যাচ্ছে তখন, তিনি মনে করতে পারছেন। তবে সাপটা তাঁকে দেখে পাতার আড়ালে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেই বললেন, 'সাপেরও ভয় আছে। তুই কী রে! একজন বুড়োমানুষের সঙ্গে সাপের বন্ধুত্বকে গুরুত্ব দিলি না! 'সাপ, সাপ' বলে চেঁচালি! কী ভাবল বল তো!'

'যদি কামড়ায়!'

'কামড়াবে কেন! সে আছে নিজের মতো। আয়, দেখবি।'

টুপুকে কোলে তুলে সাপটার গতিবিধি লক্ষ করতে থাকলেন। পাতার ওপর দিয়ে সরসর করে কোথায় লুকিয়ে পড়ল সাপটা!

'গেল কোথায়?'

'জায়গার কি অভাব আছে!'

'বাড়ি চলো দাদুমণি!'

'সাপের চোখ দুটো দেখলি?'

'দেখে কাজ নেই। বাড়ি চলো।'

'খুব ভয় পেয়ে গেছিস! আমি আছি না! ক্ষমতা আছে কোনো ক্ষতি করতে পারে!'

টুপুর সাহস বাড়ে। দাদুমণিকে কেউ কিছু করবে, ভাবাই যায় না। সে বড়োই কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'কোথায় গেল?'

'গেছে কোথাও। খুঁজে আর কাজ নেই। সবারই বাড়িঘর থাকে। সেখানে চলে যেতে পারে। বাড়ি চল।'

'কী সুন্দর দেখতে, তাই না দাদুমণি!'

'ঠিক আছে, ধরে আনব। তোর হাতে এনে দেব।'

'না, না। আমার গা শিরশির করবে। দূর থেকে দেখব।'

'ঠিক আছে, তাই দেখবি। বিকেল বেলায় নাহয় খুঁজতে বের হব।'

দু-জনেই সাপটাকে বিকেল বেলায় খুঁজতে বের হয়ে খাদগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন। দু-পাশে হাঁটুসমান লোহার রেলিং, রেলিং টপকালেই রাস্তা। বাস, মিনিবাসের ভিড়। মানুষজনের ভিড়। তিনি টুপুর হাত ধরে বললেন, 'এত ভিড়ের মধ্যে সাপটা আর দেখা দেবে না। তুই আবার কাউকে বলিস না, গাছগুলোর মধ্যে সাপও থাকে। লাউডগা সাপটা তুই যে দেখেছিস, বাড়ির কাউকে বলবি না।'

'বললে কী হবে?'

'আমার সঙ্গে তোকে তাহলে বের হতে দেবে না। তোর মা আরশোলা দেখলেই কী করে দেখিস না!'

'আমি কখনো বলি! সাপটা কেমন ঝুলে ছিল না দাদু? ওর মা, বাবা কোথায়?'

'আছে কোথাও।'

'একা একা বের হয়ে এল, ওর মা-বাবা রাগ করবে না!'

'রাগ করলে করবে! তুই তোর মা-বাবার কথা সব শুনিস? একা একা বের হোস না!'

'খুব দুষ্টু সাপটা।'

'তোর মতো দুষ্টু।'

টুপু খুব খুশি। গাছগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে, সাপটার কথা মনে হয় টুপুর। এমনকী দোতলায় ব্যালকনি থেকেও কতদিন ঝুঁকে রাস্তায় গাছপালার দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়েছে। গাছপালার ওপর দিয়ে কোনো সাপই আর বাতাসে ভেসে যায়নি।

টুপু ভাবত, দাদুমণির ইচ্ছে না হলে সে আর কখনো এমন সুন্দর সাপ দেখতে পাবে না। দাদুমণিই পারেন, গাছে সাপ ঝুলিয়ে রাখতে। দাদুমণির এমন সব অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলেই এই রাস্তায় গাছ

উপড়ে ট্রাম লাইন পাতা কঠিন হয়ে পড়বে।

সে কেন যে একদিন তার মাকেও সাপটার কথা বলে দিয়েছিল। 'মা জান, এত বড়ো একটা সাপ, গাছের ডালে ঝুলে আছে। সোনালি রং। চোখ দুটো বেদানার কোয়ার মতো লাল। দাদু আমাকে ঘাড়ে তুলে সাপটা ভালো করে দেখতে বললেন।'

মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। টুপুর সারাদিন পাড়ায় টো-টো করা স্বভাব। একদণ্ড সুস্থির হয়ে বসে না। কত যে তার কথা! আর কত সব রাজ্যের কাজ।

মা সাপটার কথায় যে বিন্দুমাত্র অবাক হয়নি, বরং বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। 'সাপের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই! এখানে আসবে মরতে।'

'জান, পেটের দিকটায় নীল রং। কাচের মতো পাতলা শরীর। শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে পেটটা উঁচু-নীচু হয়।'

'আর কিছু হয় না!'

'জিভ দুটো চেরা। জিভের রং সবুজ। ঘাস-পাতা খায়। ফড়িং, প্রজাপতি পেলে খায়। চেরা জিভে গাছ-পাতার গন্ধ পায়।'

'সাপ তো সবই খায়। যেমন দাদু, তেমনই তাঁর নাতনি। এখন সাপের গল্প শুনতে ভালো লাগছে না। দেখো, তোমার দাদু কোথায়! চান করে নিতে বলো। আগে ছিল তোমার রাজ্যের সব ভূতের গল্প, এখন সেটা এসে দাঁড়িয়েছে সাপের গল্পে। পরে শুনব। আমাকে কাজ করতে দাও। যত সব আজগুবি কথা!'

টুপু দাদুমণিকে না বলে পারেনি, 'জান, মা সব আজগুবি কথা ভেবেছে। তুমি একদিন সাপটাকে ঘরে নিয়ে আসতে পার না! বুঝবে মজা।'

টুপু জানে, মা তার খুবই ভিতু। আরশোলা দেখলে ছুটে পালান। আর চিৎকার, 'কে কোথায় আছ? ও হেমাঙ্গকাকা, দেখো এসে, ইস, ওটা মিটসেফের ভেতরে ঢুকে গেল! আমার কী হবে?'

'কী হয়েছে বউমা?'

মা আঙুল তুলে দেখান। ভয়ে বাকরোধ হয়ে গেছে-মুখে উচ্চারণ করতেও সাহস পান না, একটা আরশোলা ফরফর করে উড়ছে।

টুপুর তখন ভারি মজা। সাপটা যদি গুটিগুটি রান্নাঘরের মিটসেফে ঢুকে বসে থাকে, কিংবা দেওয়াল বেয়ে উঠতে উঠতে একটা ছবি হয়ে যায় তবে মা বুঝবেন, দাদুমণি কখনোই কোনো আজগুবি কথা বলেন না।

৩

টুপু দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সিঁড়ি ধরে কেউ উঠে আসছে। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ।

টুপু সিঁড়ির দু-ধাপ নেমে উঁকি দিয়ে দেখল। আর সঙ্গেসঙ্গে ছুটে দাদুর ঘরে।

'দাদুমণি, অমলকাকু আসছে।'

দাদুমণি বাজার থেকে এসে অবেলায় কেন যে শুয়ে ছিলেন, গায়ে তাঁর চাদর! মনটা ভালো ছিল না টুপুর, দাদু শুয়ে থাকলে তার মনখারাপ হয়ে যায়, সে দাদুমণির পাশে গিয়ে বসেছে, শিয়রে গিয়ে বসেছে, দাদুমণি একটাও কথা বলেননি তার সঙ্গে-এতেই সে বুঝেছে দাদুমণির শরীর ভালো নেই। ব্যাজার মুখে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল, সকাল থেকেই দাদুমণির মুখ শুকনো দেখেছে, তার খুবই কান্না পাচ্ছিল। কাঁদতে পারছে না, কাঁদলেই মা বকবেন, 'তোমার সময় অসময় নেই টুপু, বোকার মতো ফের কাঁদতে শুরু করলে!' আর তখন যদি অমলকাকু চলে আসেন সে স্থির থাকতে পারে!

'অমল এসেছে, টুপু?'

'হ্যাঁ, দাদুমণি। বসার ঘরে বাবার সঙ্গে কী কথা বলছে।'

'কেন এসেছে জানিস?'

'হেমাঙ্গদাদু খবর দিয়েছে।'

তখনই অমল ঘরের ভেতরে ঢুকে বলল, 'কাকা, আমাকে ডেকেছেন!'

'বোসো।'

'কী রে টুপু, তোর মা কোথায়? চা খাওয়াবি না?'

টুপু ছুটে গেল ভেতরের দিকে। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে মাকে খুঁজল। নেই। নেই যখন কোনো ঘরে, তবে ঠিক বাথরুমে মা। বাথরুমের দরজা বন্ধ। দরজা বন্ধ থাকলেই, মা ভেতরে থাকবেন এমনও কথা নেই। কাকুমণি থাকতে পারে ভেতরে। মনামাসিও যেতে পারে। দুটো বাথরুমের একটায় দাদুমণি আর হেমাঙ্গদাদু যান। টুপুও যায়। তবে আর কেউ যেতে পারে না। দাদুমণির ঘরের সঙ্গে বাথরুমটা।

সে ডাকল, 'মা, মা।'

আসলে মা যদি ভেতরে না থাকেন, এই একটা আতঙ্ক থেকেই বাথরুমের ভেতর থেকে মায়ের সাড়া পেতে চাইছে টুপু।

'কী হল?'

'মা, অমলকাকু এসেছে। চা চাইছে।'

'তোমার হেমাঙ্গদাদু কোথায়? মনামাসি কী করছে?'

অহিভূষণ উঠে বসেছেন। শিয়রে কাগজটা ছিল, ওটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ট্রাম লাইন পাতা হবে শুনছি।'

'সে তো কবে থেকেই কথা হচ্ছে। কাজটা শিগগিরই শুরু হবে।'

'কাজটা না করতে পারলে কি সরকারের ভাত হজম হচ্ছে না!'

খবরটা খুঁটিয়ে পড়তে পড়তে অমলের মনে হল, অহিকাকার তো খুশি হওয়ার কথা। 'ভাত হজম হচ্ছে না' কথাটাতে যে খোঁচা আছে, এবং অহিকাকা খবরটা পড়ে খুশি নন বিন্দুমাত্র, এমন কথায় সে তা আঁচ করতে পারল।

অহিভূষণ ফের বললেন, 'লাইন কোথা দিয়ে পাতা হবে? গাছগুলো তবে দাশ-বারো বছর আগে লাগানো কেন? কোথায় যাবে ওরা? তোমার কি মনে হয় গাছগুলো কেটে ফেলা হবে?'

'তা ছাড়া উপায় কী! বিশ ফুটের মতো জায়গা গাছগুলো দখল করে আছে। রাস্তার এই বিশ ফুট উলটোডাঙা পর্যন্ত সাফ করে দিলেই জায়গার অভাব হবে না।'

'আচ্ছা, অমল, তোমাদের কে দিব্যি দিয়েছে, ট্রাম লাইন পাততেই হবে। সুবিধেই বা কী হবে? এত রুট থাকতে আবার বাড়তি ট্রাম লাইন, বুঝি না কেন হঠাৎ হঠাৎ তোমাদের এভাবে বুদ্ধিনাশ হয়! ক-টা লোক ট্রামে উঠবে মনে করছ? ট্রাম তো তুলে দেওয়ার কথা হচ্ছে।'

'কোথাও কোথাও তুলে দেওয়া হবে কাকা। তবে এ-লাইনটা জরুরি। অফিসের ভিড় সামলাতেই এই পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে।'

'তোমাদের কি কোনো আক্কেল নেই? এমন সুন্দর গ্রিন ভার্স-' এটুকু বলেই তিনি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। আর কোনো কথা বলছেন না।

তারপর কী ভেবে বললেন, 'তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তিনি কষ্ট পেতেন। তোমরা নব্যযুগের ছেলে, ঠিক বুঝতে পারবে না, গাছগুলোর সঙ্গে এইসব বাড়িঘরের কী মায়া জড়িয়ে আছে!'

অমল হেসে ফেলল।

বুড়োমানুষদের কখন কী যে খেয়াল হয়! তা গাছগুলো সত্যি বড়ো সতেজ হয়ে উঠেছে। গাছগুলোর সঙ্গে দু-পাশের বাড়িঘরের সৌন্দর্য জড়িয়ে আছে, তাও ঠিক, তবে শহরের ভিড় সামলাবার জন্য এই পরিকল্পনা- অফিস ফেরত, কিংবা অফিসগামী যাত্রীদেরই শুধু যে সুবিধে তাও নয়, উলটোডাঙায় এখন চারটে ঢাউস রাস্তা, পাতালরেল কবে যে চলবে কিছুই বলা যাচ্ছে না, নানাদিক ভেবেই সরকার কাজটা হাতে নিয়েছে।

অমল বুঝতে পারছে, অহিকাকা চান, গাছ নিয়ে কোনো আন্দোলন যদি গড়ে তোলা যায়! এলাকার নানা সমস্যার সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে। কী ভেবে অমল না বলে পারল না, 'আপনি কাকা আগে জানতেন না! আজ কাগজ পড়ে জানলেন?'

টুপু দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় তার দু-হাত। সে কোনো গভীর কথাবার্তা শোনার সময় মাথায় দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। কাকার দিকে একবার তাকাচ্ছে, একবার দাদুমণির দিকে।

দাদুমণি বললেন, 'কিছু একটা করা যায় না!'

'কী করা যাবে!'

'অন্য কোনো জায়গা দিয়ে ট্রাম পাতলে হয় না?'

'আর জায়গা কোথায়! গাছগুলো না কেটে ফেললে জায়গা হবে কী করে?'

তারপর অমল ভাবল, মানুষ বুড়ো হলে নানা বাতিকে পায়। কাকার এখন গাছের বাতিকে পেয়েছে। কী আর করা! গাছগুলো কেটে ফেললে রাস্তাটা যে ফাঁকা হয়ে যাবে সেও বোঝে। তবে ট্রাম লাইন হলে এই এলাকারও বাড়তি সুবিধে থাকবে। এই এলাকায় থ্রি-এ বাস রুট ছাড়া কোনো বাড়তি যানবাহনের সুবিধে নেই। ট্রাম লাইন হলে খালি ট্রামে উঠে পড়তে পারবে। ভিড়ের বাস-মিনিবাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আসলে মানুষের প্রয়োজনেই এদিকটায় ট্রাম নিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু টুপুর দিকে তাকিয়ে অমল কিছুটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

টুপুর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

'আরে, তুই কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে?'

টুপু দৌড়ে পালাল। তারপর ফের এসে দরজায় দাঁড়াল কী ভেবে। খুবই রেগে আছে চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়। এই কান্না, এই রাগের কারণও অমল বুঝতে পারছে না।

'এই টুপু, ভেতরে আয়।'

'না, ভেতরে যাব না। তুমি ভালো না।'

'আমি ভালো না, কী করলাম!'

'গাছগুলো কেটে ফেলতেই পারবে না। গাছগুলোর নীচে একটা সাপ আছে জান। কাটতে গেলেই সাপে কামড়াবে।'

'সাপ, সাপ কোত্থেকে আসবে?'

'আমি দেখেছি। পাতার ওপর দিয়ে ভেসে যেতে দেখেছি। ওর ঘরবাড়ি গাছগুলোর ডালপাতায়। গাছ কেটে ফেললে সাপটা যাবে কোথায়!'

অহিভূষণও বললেন, 'শুধু গাছ না অমল, পাখি, প্রজাপতি, শুঁয়োপোকা, কাঠবেড়ালি-কত কিছুই আছে। গাছ না থাকলে তারাও থাকবে না। টুপু পর্যন্ত বোঝে, তোমার সরকার তাও বোঝে না।'

অহিকাকাও যেন একজন শিশুর মতো সরল বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছেন। বয়সেরই দোষ। টুপু আর অহিকাকার মধ্যে কোনো ফারাক নেই। দু-জনকেই যেন প্রবোধ দেওয়ার জন্য সে বলল, 'যে যার জায়গা ঠিকই পেয়ে যাবে। আপনি অযথা চিন্তা করছেন কাকা।'

আসলে অহিভূষণ ঠিক তাঁর ইচ্ছেগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে পারছেন না।

কী ভেবে বললেন, 'গাছ কাটা কবে শুরু হবে?' কথাটা বলেই কেমন হাঁপাতে থাকলেন। নিষ্ঠুর এবং বড়োই নৃশংস ঘটনা তাঁর চোখের ওপরে ঘটবে ভাবতে গিয়ে তাঁর দম নিতে কষ্ট হল।

'কী হল কাকা! চোখ আপনার স্থির হয়ে যাচ্ছে কেন?'

তিনি নিজেকে সামলে বললেন, 'না, কিছু হয়নি। হঠাৎ বুকটায় কেমন কষ্ট হচ্ছিল।'

অমল জানে, কাকার শরীর বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। তাঁকে এভাবে উদ্বেগের মধ্যে রাখাও ঠিক না। গাছ না কেটে ফেললে জায়গাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। গ্রিন ভার্সের ওপর দিয়েই লাইন পাতা হবে সে জানে।

তবে কবে হবে, জানে না।

অমল বলল, 'আপনি অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না। প্রথম প্রথম গাছ কাটলে সবারই খারাপ লাগে। আমারও লেগেছে। তবে সব সয়ে যায়। এই টুপু, তুই দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকলি?'

টুপু দৌড়ে এসে দাদুর খাটে লাফিয়ে উঠে পড়ল। কিন্তু অমলের কাছে গেল না। কেমন অপরিচিত মানুষ অমল তার কাছে। গাছ নিয়ে দাদু-নাতনির মধ্যে কি কোনো শলাপরামর্শ চলছে! টুপুরও কি গাছের জন্য কষ্ট! তবে অমল, অন্য কথায় না এলে ঘরের আবহাওয়া খুব একটা স্বাভাবিক হবে না, সে ঠিকই বোঝে। এসব ভেবেই বলল, 'আপনার একতলাটা শুনছি ব্যাঙ্ক ভাড়া নেবে।'

তিনি তার কথার জবাব দিলেন না। টুপু তার দিকে তাকাচ্ছেই না। অমল উঠে গেলে টুপু যেন খুশি হবে বেশি। টুপুকে দেখলে বুকে জড়িয়ে সবারই আদর করতে ইচ্ছে হয়। আজ টুপু তাকে বেশ এড়িয়ে চলছে। সে নিজের মতো কথা বলছে দাদুর সঙ্গে।

'দাদুমণি, আমি না গাছগুলির ছবি এঁকে দেব তোমাকে।'

'দাদুমণি, আমি না নীল রং দিয়ে আকাশ আঁকব। আমাদের ঘরবাড়ি আঁকব।'

'দাদুমণি, আমি না সোনালি সাপের বাড়িঘর ছবিতে তোমাকে এঁকে দেখাব। টুনটুনি পাখির ডিম বেগুন গাছের পাতায় জড়াজড়ি করে থাকে জান? সেই ছবিও থাকবে আমাদের দেওয়াল জুড়ে। বুকে তোমার আর কষ্ট হচ্ছে দাদু?'

টুপু অহিভূষণের বুকের কাছে আরও এগিয়ে গেল। বুকে হাত রেখে বলল, 'কোথায় কষ্ট হচ্ছে?'

অহিভূষণ টুপুর পাকামিতে না হেসে পারলেন না।

'আমার আর কোনো কষ্ট নেই টুপু। তুই ছবি এঁকে দিলে আমার আর কষ্ট থাকবে কেন? রাস্তার সব গাছপালা দেওয়ালে ছবি হয়ে থাকলে খুব মজা হবে।'

অমল দেখল, তাকে কেউ আর পাত্তা দিচ্ছে না।

'আমি উঠছি কাকা।'

'ওঠো। তবে গাছপালা কাটবে না।'

অমল কেমন নিমরাজি গলায় বলল, 'দেখি।'

অবশ্য অমল জানে, সে ইচ্ছে করলে পারে। তার গলার জোর আছে। এলাকার লোকজন তার কথার গুরুত্ব দেয়। সে যদি রুখে দাঁড়ায়, আন্দোলন গড়ে তোলে তবে ট্রাম লাইন এই রাস্তায় নিয়ে যাওয়া কঠিন। কিন্তু তার হাত-পা বাঁধা। তার পার্টির সরকার-অহিভূষণের মতো গাছপাগল মানুষ ছাড়া এমন অবান্তর ক্ষোভও কম লোকজনের মধ্যেই আছে।

তখনই টুপু চিৎকার করে উঠল, 'কাকু, সাপ।'

অমল দরজা পার হয়ে যাচ্ছিল। 'সাপ! কোথায় সাপ!' সে লাফ দিয়ে ছিটকে ভেতরে ঢুকে গেল।

'কোথায় সাপ?'

টুপু বলল, 'দেখতে পাচ্ছ না, দরজার আড়ালে লুকিয়ে আছে। আমাদের সোনালি সাপ, সে গাছের পাতায় ভেসে বেড়ায়। দেওয়ালে ভেসে বেড়ায়, মেঝেতে উঠে আসে, তুমি আর এগোবে না।'

জানলা থেকে রাস্তার গাছপালার ডাল হাত দিলেই যেন ছোঁয়া যায়। অহিভূষণও বুঝে পেলেন না, কোথায় সাপ! অমল কিছুটা বিভ্রান্ত গলায় বলল, 'সাপ আসবে কোত্থেকে!'

অহিভূষণ বললেন, 'গাছের ডালপালা বেয়ে ঘরে সাপ ঢুকে যেতেই পারে। টুপু সাপটাকে দেখেছে।'

অমল রাজনীতি-করা লোক। খানাখন্দ জীবনের কোথায় কতটা গভীর, ভালোই জানে। কীভাবে পুলটিস দিতে হয় তাও জানে। ধোঁকা দেওয়ার অভ্যাস রাজনীতির গুণে তার মধ্যেও গড়ে উঠেছে। টুপুর মতো একটা ছোট্ট মেয়ে তাকে ধোঁকা দিলে বিশ্বাস করবে কেন?

সে বলল, 'কোথায় দরজার আড়ালে? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

অহিভূষণ বললেন, 'পাল্লাটা টেনে দেখো না। পাল্লার কাছে যেতে ভয় পাচ্ছ কেন?'

চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে হেমাঙ্গও ছুটে এসে দরজার কাছে থমকে গেল। অমলকাকু খাটে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে নামছে না আতঙ্কে। সাপের পিঠে পা পড়া ভালো না। কিংবা নীচে নামলেই তেড়ে আসতে পারে। সে কিছুতেই যেন নীচে নামবে না ঠিক করেছে।

টুপু হেসে বলল, 'অমলকাকু, সাপকে তুমি ভয় পাও?'

'কোথায় সাপ?'

'বা রে দেখলে না, দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠে গেল, ওই যাচ্ছে। ওদিকে তাকাও। তাকাও, দরজার পাল্লার নীচে নেই। ঝুলবারান্দায় গলা তুলে সরসর করে চলে যাচ্ছে। ওই যে রেলিঙে উঠে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ না!'

টুপু খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। টুপুর তো বেজায় সাহস! এতটুকুন মেয়ে, সাপ নিয়ে মজাও করতে পারে না। সে তার চোখে ঠিকই দেখেছে, না হলে, এত কথা বলতে পারে না। বানিয়ে বানিয়ে বলা আরও অসম্ভব।

বেশ হওয়া দিচ্ছে। দুপুর বেলায় কী অনাসৃষ্টি কারবার! হেমাঙ্গ চিৎকার করছে, 'ভেতরে যাবেন না, ঘরে সাপ ঢুকেছে।'

টুপুর বাবা মৃদুলও এসে গেছেন, মা করবীও হাজির। মনামাসি উঁকি দিচ্ছে দূর থেকে। টুপু ঘরের সর্বত্র দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

টুপুর বাবা খুবই ক্ষিপ্ত, এতটুকুন মেয়ের বিন্দুমাত্র ভয় নেই!

'এই টুপু কী হচ্ছে। খাটে উঠে যাও।'

'খাটে উঠব কেন? রেলিঙে সোনালি সাপ ঝুলছে।'

'কোথায়?'

'ওই তো, এসো না।'

অহিভূষণ খুবই নির্বিকার। সাপেরও ভয়ডর আছে। এত লোকের উৎপাত সে সহ্য করবে কেন! সে রেলিঙে ঝুলে আছে। তারপর সেই হালকা মনোরম সাপটি কিছুটা বাতাসে উড়ে গিয়ে গাছের ডালপালার আড়ালে আশ্রয় নিতেই পারে।

'কোথায় রেলিঙে, কিছুই তো দেখছি না!' টুপুর বাবা মৃদুল ঘরে ঢুকে গেছেন। ওর মাও। মনামাসি, হেমাঙ্গদাদু সবাই। প্রবল বাতাসে গাছের ডালপালা দুলছে। গাছের ডালপালা বাড়ির রেলিঙের কাছাকাছি ঝুঁকে পড়েছে।

'ওই তো।'

'মারব থাপ্পড়। ওই তো! ভেতরে চলে এসো। আমরা কিছুই দেখছি না, ওই তো!' টুপুর বাবা খেপে গিয়ে মেয়ের হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিলে অহিভূষণ খাপ্পা।

'তুই ওকে মারছিস কেন?'

'কোথায় মারলাম! আপনি বাবা ওর মাথাটি খাচ্ছেন। কিচ্ছু বলার উপায় নেই। কিছু একটা হয়ে গেলে তখন কী হবে! কোথায় সাপ?'

'আছে। টুপু যখন দেখেছে, নিশ্চয়ই আছে।'

'আর আপনি নির্বিঘ্নে শুয়ে আছেন বাবা। সাপ কি আপনাকে কামড়াতে পারে না!'

'নিশ্চয়ই পারে। কামড়ালে বাঁচি। তোমরা কেউ ভেবে দেখেছ, এইসব গাছপালা সাফ হয়ে গেলে, কী হবে রাস্তাটার?'

টুপুর দাদুমণিকে নিয়ে এই এক মুশকিল। হেমাঙ্গকাকার কাছে সব শুনে মৃদুল অহিভূষণের হরেক রকমের খামখেয়ালের মধ্যে আর একটা নতুন উপসর্গ খুঁজে পেয়েছেন। দাদু-নাতনি বাড়িটায় যা শুরু করেছে, শেষে

যে কী হবে?

'কোথায় সাপ টুপু? হাত ছাড়িয়ে কোথায় যাবি?'

'সাপটা রেলিঙে ঝুলে আছে।'

টুপুর এক কথা। সে তার বাবার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। ছাড়া পেলেই লাফিয়ে ঝুলবারান্দায় ফের চলে যাবে।

আর গাছেরও হয়েছে! কোথা থেকে যে প্রবল বাতাস উঠে এল! ডালপালা সব উথালপাতাল। দুটো-একটা ডাল রেলিঙে এসেও ঝাপটা মারছে।

'কোথায় সাপ টুপু? রেলিঙে কোথায় ঝুলে আছে? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

অমল খাট থেকে নামছে না। একটা সাপ শেষে এতটা আতান্তরে তাকে ফেলে দেবে, স্বপ্নেও ভাবেনি।

টুপু বলল, 'অমলকাকু, খাট থেকে না নামলে দেখতে পাবে না।'

আর কী করা! সবাই টুপুর সঙ্গে ঝুলবারান্দার দরজায় উঁকি দিলে টুপু চিৎকার করে উঠল, 'ওই তো, লাফিয়ে গাছের ডালে উঠে গেল।'

যাক, বাঁচা গেল। আর তারপর প্রবল বাতাসে এবং সোনালি রোদে গাছের ডালপালা ঝিকিমিকি করে উঠলে সবাই দেখল, সারি সারি ডালপালার ঢেউয়ের মাথায় সোনালি একটা সাপ, পাতলা, নীল কাচের মতো স্বচ্ছ লম্বা কিছু প্রবল বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ডালপালায়। এত সুন্দর ছবি তারা জীবনেও কেউ দেখেনি।

টুপু অবাক হয়ে দেখছে, সেই সোনালি সাপের নৃত্য ডালপালার মাথায়। সবাই বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল। তবে এটা সাপ না অন্য কিছু, না রোদের ঝিলিমিলি স্বভাবের দোষ, কেউ কিছু বুঝেই উঠতে পারল না।

মাসখানেক পরে একদিন হঠাৎ অমলকাকু ছাতা মাথায় হাজির। খুবই খেপে আছে। কার ওপর, বোঝা যাচ্ছে না। হেমাঙ্গদাদুর সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা।

টুপু শুনতে পাচ্ছে সব, হেমাঙ্গদাদুর সঙ্গে অমলকাকুর বেশ কথা কাটাকাটি চলছে।

'এসব কী হচ্ছে হেমাঙ্গকাকা?'

'কী হচ্ছে, কিছুই তো জানি না।'

'দেখো কাকা, গাছগুলো তোমার বাবারও নয়, আমার বাবারও নয়। গাছ সরকারের। গাছ কেটে ফেলা হবে কি হবে না সরকারই ঠিক করবে।'

টুপু দৌড়ে অহিভূষণের ঘরে ছুটে গেল।

'দাদুমণি, দাদুমণি, অমুকাকু ছাতা মাথায় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। হেমাঙ্গদাদুকে বকাঝকা করছে।'

অহিভূষণের নিত্যদিনের অভ্যাস কাগজ পড়া। অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ছাটের জন্য ঝুলবারান্দায় বসতে পারেননি। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে আছে। ঘরেও বেশ অন্ধকার। ঘরে আলো জ্বালিয়ে কাগজের খুঁটিনাটি খবর দেখছেন। সকাল বেলায় এই দুর্যোগে অমল খুবই বিপদের গন্ধ না পেলে যে আসার পাত্র নয়, তিনি ভালোই জানেন। আর বিপদটা কী, তাও তাঁর ভালো জানা আছে।

অমলের খেপে যাওয়ারই কথা। তার এলাকা, কী হবে না হবে, সে-ই ঠিক করবে। সে যদি দেখে, তার নাকের ডগায় মাছি উড়ছে তবে মেজাজ অপ্রসন্ন হতেই পারে।

কাগজ থেকে অহিভূষণ চোখ না তুলেই বললেন, 'কী বলছে অমল?'

'বলছে, গাছ, হেমাঙ্গদাদুর বাবার গাছ নয়। অমলকাকুরও বাবার গাছ নয়। গাছ সরকারের।'

'ঠিকই বলেছে। তাতে কী হল!'

'কী হল কেমন করে বলব।'

অমলকাকু দরজায়। মাথায় ছাতা।

'কাকা?'

'কে? অ অমল! আরে, ছাতাটা বন্ধ করো। ছাতার জলে সব যে ভিজে গেল।'

অমলের হুঁশ ফিরে এল। মাথা গরম, কিছুই খেয়াল থাকে না। তাড়াতাড়ি ছাতা বন্ধ করে কোথাও রাখা যায় কি না ভাববার সময়ই দেখল, হেমাঙ্গকাকা হাত বাড়িয়ে ছাতাটা নিয়ে নিয়েছেন। যথাস্থানে তিনিই রেখে দেবেন।

টুপু দেখল, অমলকাকুর জামাপ্যান্টও ভিজে গেছে।

দাদু একবার চোখ তুলে শুধু বললেন, 'তোয়ালেটা দে তোর কাকুকে। সব তো ভিজে গেছে অমল। কী ব্যাপার, এত সকালে!'

টুপু দাদুর ফরমাশ খাটতে খুবই ওস্তাদ। সে ছুটে গিয়ে বাথরুম থেকে একটা শুকনো তোয়ালে নিয়ে এল। সে মজাও পাচ্ছে। সে একফাঁকে নীচেও নেমে গেছে। তারপর ফের উঠেও এসেছে। ফোন তুলে সে ফিসফিস করে কাউকে কিছু বলেও দিল। তার উত্তেজনা খুবই, মজাও কম না। অমলকাকু কেন এসেছে, তাও সে বোঝে। বেশ একটা বাহাদুরির গন্ধ পেয়ে টুপু আবার ছুটে এল দাদুর ঘরে। ঘরে আসার আগে সে তার নিজের ঘরের দরজা টেনে দিল।

দাদুমণি কী বলবেন কে জানে!

তাকে যদি আসামি ভেবে ফেলেন, তবেই মুশকিল। মা-বাবা জানতে পারলে খুব একটা সুবিধে হবে না। দরজা বন্ধ করে, সে এবং তার বন্ধুরা সকালে-বিকেলে কী করে, এই সংশয়ও কম না। একমাত্র দাদুর আশকারা আছে বলে, তাকে বেশি ঘাঁটাতেও সাহস পায় না।

সে যাই হোক, সে আবার দাদুমণির ঘরে। বাবার পাজামা হাতে হাজির। একটা গেঞ্জিও।

অমল বলল, 'না, রেখে দে। আমি বসব না। গাছে কারা পোস্টার মারছে জানিস?'

টুপু বলল, 'পোস্টার কী কাকু?'

এতটুকুন মেয়ে, বলতেই পারে, পোস্টার আবার কী! সে জানবে কী করে?

অমলের দিকে মুখ তুলে অহিভূষণ বললেন, 'বোসো, এই হেমাঙ্গ, আমাদের চা দাও।'

'না কাকা, চা খাব না। গাছে গাছে কারা পোস্টার ঝুলিয়ে দিয়েছে। কী কাণ্ড বলুন, সরকারের কানে উঠলে এটা যে খুবই বেয়াদপি কাজ মনে করবে না! আপনি কী বলেন কাকা!'

'পোস্টার আবার কেন? কী লেখা আছে ওতে।'

'গাছে হাত দিলে ঠ্যাং ভেঙে দেব। পোস্টারে আরও বিচিত্র সব স্লোগান। ট্রাম লাইন হবে না। গাছ কেটে ট্রাম লাইন পাতা হবে না। গাছেরও প্রাণ আছে। গাছকাটা জল্লাদদের ফাঁসি চাই।'

অহিভূষণ কাগজটা ছুড়ে দিলেন খাটে। তারপর চশমা চোখ থেকে নামিয়ে হেসে দিলেন, 'এতে তোমার মাথা গরমের কী আছে বুঝছি না। যারাই করুক, অন্যায় কিছু করেনি। বোসো। দাঁড়িয়েই থাকলে। সব ব্যাপারে মাথা গরম করলে চলে! যারা লিখেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখো না, কোনো রফায় আসা যায় কি না!'

'কার এত সাহস, সেটাই তো বুঝি না। আমাকে কেউ কিছু বলেওনি। এলাকাতে কারও গাছ নিয়ে মাথাব্যাথাও নেই। কেন যে মনে হল, যাই কাকার কাছে, তিনি যদি কোনো খবর রাখেন! টুপুর দিন দিন বেয়াড়াপনা বাড়ছে। টুপু আজকাল জানেন, একাই বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়!'

'খুব খারাপ! টুপু তুই বাড়ি থেকে একা বের হয়ে যাস?'

'না তো! কখন বের হলাম।'

'কারা তবে পোস্টার ঝুলিয়ে দিচ্ছে জানিস না!'

টুপু চুপ করে আছে।

'আরে আমি তো আছি। এলাকার সুবিধে-অসুবিধে আমার চেয়ে কে বেশি বোঝে। এত বড়ো একটা বিক্ষোভ দানা বাঁধছে ভেতরে ভেতরে, আমি জানব না! তবে এও বলে রাখি, আমাকে বিক্ষোভের শরিক করে না নিলে, কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। সরকারের লোকজন এসে বুলডোজার দিয়ে একদিন সব সাফ করে দেবে। কেউ রুখতে পারবে না।'

টুপুর মুখ ব্যাজার হয়ে গেল। অহিভূষণেরও।

'এটা তো দেখছি একেবারে মামাবাড়ির আবদার। যারাই করছে, ভুল করছে। আইন হাতে তুলে নিচ্ছে, নিজের হাতে।'

অহিভূষণ কী ভেবে বললেন, 'তাহলে টুপু, তোমরা অমলকেও সঙ্গে নাও। সত্যি, এটা খুব অন্যায় তোমাদের। অমল আমাদের এলাকার জন্য কী না করেছে! প্লট করে, এত যে সব বাড়িঘর উঠছে, অমল না থাকলে হত!'

অমল টুপুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আর এখন এর মধ্যে নেই। তোরা যা ভালো বুঝিস করবি। তোদের মাথায় কে এমন দুষ্টু বুদ্ধি গজিয়ে দিল। হাস্যকর ব্যাপার। ওসব লিখে রাখলেই গাছগুলো রেহাই পেয়ে যাবে, কে এমন বুদ্ধি দিল তোদের! সরকারকে অত বোকা ভাবছিস কেন? গাছের ডাল, মাথা সব কেটে দেওয়া হবে। সব গাছ গুঁড়িসুদ্ধু তুলে নিমতলায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

টুপু লাফ দিয়ে খাটে উঠে গেল। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'সাপ, সাপ!'

আরে, মেয়েটা তো বেজায় ধুরন্ধর।

'কোথায় সাপ?'

'তোমার পায়ের কাছে।'

প্রকৃতই একটা সাপ লম্বা হয়ে সুড়ুত করে যেন খাটের নীচে ঢুকে গেল। অমল লাফ দিয়ে দরজার বাইরে গেলে অহিভূষণ বললেন, 'অমল, ছাতাটা নিয়ে যেতে ভুলো না।'

টুপু 'হুররে' বলে চিৎকার করে উঠল।

অহিভূষণ বললেন, 'টুপু, কাজটা ভালো করলি না। যখন-তখন সাপ আসে কোত্থেকে! সাপেরও তো খাওয়াদাওয়া আছে। এত সময় পায় কোথায়! কোথায় সাপ?'

'সাপটা চলে গেছে।'

'রোজই চলে যায়! সেদিন নাহয় তোর কথায় তাল দিয়েছিলাম, আজ তো কোনো কারণ নেই সাপ দেখার।'

'আমি যে দেখলাম।'

'তুই দেখলি, অমল কি দেখতে পেয়েছে?'

'দেখতে না পেলে পালাল কেন?'

'তা অবশ্য ঠিক।'

বলেই অহিভূষণ আবার ব্যাজার মুখে বসে থাকলেন। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'শেষরক্ষা হবে না রে টুপু।'

'দাদুমণি জান, আমি আর একটা ছবি এঁকেছি। তুমি তো মোহনজ্যাঠাকে ডেকে পাঠালে না? তুমি যে বললে, তোর এত সুন্দর ছবি আঁকার হাত, ছবিগুলি বাঁধিয়ে রাখবে ফ্রেমে।'

'সেই তো।'

অহিভূষণ হেমাঙ্গকে ডেকে বললেন, 'টুপুর ছবিগুলো বাঁধিয়ে আনবে। কাঠের ফ্রেমে। এবারে কী আঁকলি, দেখা।'

টুপু ছুটে গিয়ে তার সব ছবি নিয়ে এল। রং পেনসিল দিয়ে আঁকা। কখনো একটা গাছ দাঁড়িয়ে। তার গায়ে অজস্র শুঁয়োপোকা, কোথাও একটা ঝোপ, দুটো ব্যাং, দুটো ইঁদুর এঁকেছে টুপু। একটা গাছের ডালপালায়

লাল রঙের পাখিরাও বসে আছে। আর সে তার প্রিয় সোনালি সাপটা এঁকেছে খুবই লম্বা করে। এঁকেবেঁকে ডাল বেয়ে উঠছে। টুপুর হাতে মেলা সময়, মা তিনটেয় কাগজের অফিসে বের হয়ে যান। ফেরেন অনেক রাতে। তার বাবাও ফেরেন রাত আটটা বাজলে। তখন বাড়িতে হেমাঙ্গ এবং তিনি। আর থাকে কাজের মেয়েরা। বাড়িটায় বিকেলে মেলার মতো বসে যায়। তারা সবাই টুপুর বন্ধু। কেউ বালিকা, কেউ কিশোরী। দাদুর দুঃখ কী তারা তাও জানে। টুপুর দুঃখও তারা টের পায়।

তারা এখন একাট্টা হয়ে গেছে। সত্যি তো, গাছগুলো কেটে ফেললে, রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে যাবে। গাছগুলো থাকায় তারা যে একা নয়, তাও বুঝেছে। এবং দুঃখ-কষ্ট বড়োই সংক্রামক ব্যাধি, গাছগুলোর মায়ায় তারাও জড়িয়ে গেছে।

সব গাছে বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়ার মূলেও তারা। টুপু আর অহিভূষণের পরামর্শমতোই সব স্লোগান লেখা হয়েছে। যে যার মতো সাদা কাগজে গোটা-গোটা অক্ষরে 'গাছ একটি প্রাণ' লিখে বোর্ডে সেঁটে দিয়েছে। সবার মিলিত প্রচেষ্টার ফল ফলতেও শুরু করেছে। হেমাঙ্গ গাছে গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছে বোর্ডগুলি। সকালে কেউ ঘুম থেকে ওঠার আগেই চুপিচুপি তিন জনেই বের হয়ে গেছে। সঙ্গে টুপু না থাকলে অহিভূষণ কিংবা হেমাঙ্গ যেন সাহসও পেতেন না। অমল যে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে গেল, ওই বোর্ড সব চোখে পড়াতেই।

কিন্তু মুশকিল, সরকার তো ভবি ভুলবার নয়।

চাউর হয়ে গেছে, ট্রাম লাইন এদিকটায় আসছেই। কিছুতেই আর গাছগুলিকে রক্ষা করা যাবে না। আর কীই-বা করা যায়!

টুপু একদিন বলল, 'দাদুমণি, এই দেখো মুখোশ।'

সত্যি তো, মুখোশ।

'আন দেখি।'

টুপু দাদুমণির কোল ঘেঁষে বসল।

'কীসের মুখোশ!'

'হনুমানের। বুঝতে পারছ না! এই তো চোখ, এই তো কান। নাকটা ভোঁতা থাকলে সুবিধে। মুখে সেঁটে যাবে।'

টুপু যে নানা ফন্দিফিকির মাথায় রেখেছে, সে যে সহজে দমবার পাত্র নয়, এই মুখোশটি দেখে অহিভূষণ টের পেলেন। আরও টের পেলেন, যখন টুপু বলল, 'কাগজ এনে দাও। মোটা কাগজ। আমরা মুখোশ তৈরি করব।'

পাশের বাড়ির দিবানাথের মেয়েটাও বলল, 'এনে দিন না, আমরা তো খারাপ কিছু করছি না।'

অহিভূষণ বললেন, 'তোমরা খারাপ কিছু করতেই পার না।' হেমাঙ্গকে ডেকে, যা-যা লাগবে এনে দিতে বললেন। হেমাঙ্গকে তিনি সতর্কও করে দিয়েছেন, 'বাড়িতে মৃদুল, করবী ফেরার আগেই ঘরদোর সাফসুফ করে রাখবে। এত মেয়ে একসঙ্গে থাকলে, মারামারি, দৌড়ঝাঁপ, কাগজ নিয়ে টানাটানি হতেই পারে। কাজের মেয়েটিকেও ডেকে বলে দিয়েছিলেন, 'বিকেলে বাড়িটায় এত যে ভিড়, তোমার নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। বাড়ির আর কেউ কিছু যেন টের না পায়। যেখানে যা থাকে ঠিকঠাক সাজিয়ে রাখবে। ওরা তো খারাপ কিছু করছে না।'

আসলে বাড়িতে টুপু সকালের দিকে এত ভালো মেয়ে যে, তার বিরুদ্ধে কারও কোনো অভিযোগই থাকে না। সকাল হলে হাত-মুখ ধুয়ে নিজেই বলবে, 'ও, কী খিদে পেয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে টুপুর মা এত খুশি যে, গরম দুধ, ডিমের পোচ রেডি। টুপু খাওয়া নিয়ে আর বায়নাই করে না। পড়াশোনায়ও মনোযোগ বেড়েছে।নিজের বইপত্র জায়গারটা জায়গায় নিজেই রেখে দেয়। নিজের জামাপ্যান্ট নিজেই পরে ফেলে। দাঁত মাজতে বেশি সময় নেয় না। কিংবা ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার মানুষজনও সে আজকাল দেখে না। টিফিনের বাক্স নিজেই সাজিয়ে নেয়। স্কুল থেকে টিফিন বক্সে কোনো অভুক্ত খাবারই আর ফিরে আসে না।

টুপুর মা বলবেন, 'হ্যাঁর রে টুপু, কতদিন?'

'কেন মা?'

'তোর যে কী হয়েছে! এত সুখ আমার কপালে সইবে তো!'

টুপু মাকে জড়িয়ে বলবে তখন, 'আদর করো মা। আদর করো।' টুপুর মা জড়িয়ে ধরে চুমু খাবেন। একটাই মেয়ে, সে যদি আদর খাওয়ার জন্য বায়না করে, তবে তাঁর ভালো না লেগে পারে!

ঠিক তিনটেয় টুপুর স্কুলের গাড়ি এসে তাকে নামিয়ে দিয়ে যায়। আর সঙ্গে- সঙ্গে গোটা বাড়িটা জেগে ওঠে। চারটের সময় সতর্ক পায়ে পাড়ার মেয়েরাও এসে জড়ো হয়। অহিভূষণের ভালোই লাগে। তারা যে যার মতো নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনি রঙের বাক্স কিনে দিয়েছেন-ছবি আঁকার হাত তাঁরও খারাপ না। যেমন ভাল্লুকের মুখোশ কিংবা বাঘের মুখোশে আর কিছু ঠিক না থাকলেও চোখ দুটো ঠিক থাকবেই। কারণ চোখের ফুটো অহিভূষণ নিজের হাতে করে দেন।

সেদিন সব মেয়ে তাঁর ঘরে হাজির। টুপুর ছবি সব দেওয়ালে টাঙানো হবে। টুপু হেমাঙ্গদাদুকে ডেকে নিয়ে এসেছে। একটা কাঠের চেয়ার লাগবে। ফুলের টবগুলো ঘরের একদিকে রেখে টুপু নিজেই চেয়ারে উঠে গেলে, অহিভূষণ বললেন, 'তুই পারবি না টুপু। হাতে লেগে যাবে। হেমাঙ্গকে দে।'

কোন ছবি কোথায় টাঙানো হবে টুপু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। টুপু ভাবছে, গ্রিন ভার্সের সবটাই সে এঁকে ফেলেছে। এক-একটা ছবিতে এক-এক দৃশ্য। গাছগুলো যদি সত্যি কেটে ফেলা হয়, দাদুমণি খুবই মুষড়ে পড়বে। অন্তত সে দাদুমণির নিঃসঙ্গতা যে টের পায়, এই ছবিগুলোই তার প্রমাণ।

গাছগুলো রাস্তায় না থাকুক, এই দেওয়ালের ছবিতে বেঁচে থাকবে। গাছগুলো যে গাছই হতে হবে, তার কোনো মানে নেই। টুপু দুটো টান দিয়ে, কিছু গোলমতো ফুটকি দিয়ে এক-একটা গাছ এঁকেছে। নীচে লিখে রেখেছে, 'শাল'। কোথাও লিখেছে 'নিম', কোথাও 'শিরীষ'। আবার কোথাও দুটো টান দিয়ে লম্বা একটা লেজ ঝুলিয়ে দিয়ে লিখেছে, 'টুনটুনি পাখি।' পেটের কাছে হলুদ-নীল, লাল-সবুজ গোল-গোল চিহ্নগুলো যে পাখির ডিম অনুমানে ভেবে না নিলে চলবে না।

শুধু সোনালি সাপটা যেন ঠিক ঠিক এঁকেছে। সাদা পাতার ওপর এঁকেবেঁকে লম্বা টান ওপরের দিকে তুলে দিয়েছে। মাথায় ফুটকিরি, এবং সত্যি যে লাউডগা সাপটা দেওয়াল বেয়ে উঠছে তা ভাবতে কষ্ট হয় না। তার এই নিঃসঙ্গতা নিয়ে টুপু এত ভাবে! এমন মনে হতেই অহিভূষণের চোখে জল এসে গেল। তিনি গাছগুলিকে সংহার করা হবে ভাবলেই মাথা কেমন ঠিক রাখতে পারেন না। মাঝে-মাঝে আজকাল অসুস্থও হয়ে পড়ছেন।

'ও দাদুমণি, তোমার কী হল?'

'কিছু হয়নি।'

'অবেলায় শুয়ে আছে কেন?'

তারপর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে।

ছড়া শোনাবে, 'বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস বাপুরে আয় বাবা দেখে যা...'।

শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকলে অহিভূষণের আর দুঃখ থাকে না ঠিক, তবু রাতে যখন শুয়ে থাকেন, গাছের এক নিরিবিলি ফিসফিসানি যেন শুনতে পান। গভীর কোনো এক হেতুর মধ্যে তারা জড়িয়ে আছে। তিনি রাতে মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠেন, ঠিক শিশুদের কোনো 'রাইম'-'ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ', অথবা 'মেরি হ্যাভ এ লিটল ল্যাম্প'। পাশের ঘর থেকে টুপু ঠিক শুনতে পায়। সে ঘুম থেকে জেগে যায়। পাশাপাশি দুটো ঘর। দরজা খোলা থাকলে সবই দেখা যায়। সে ছুটে এসে ডাকে, 'ও দাদুমণি, তোমার কি ভয় করছে? তুমি আমার নার্সারি রাইম আওড়াচ্ছ কেন?' সে গুটিসুটি খাটে উঠে গিয়ে দাদুর পাশে শুয়ে পড়ে।

সে শুলেই দাদুমণির আর ভয় থাকে না।

দাদুমণি এত ভিতু হয়ে পড়বেন গাছগুলি কেটে ফেলার আতঙ্কে, সে ভাবতেই পারে না!

সে যে কী করে!

ওরা আসবেই।

অমলকাকু বলেছে, কোনো উপায় নেই।

এক বিকেলে দেখা গেল, টুপু তার বন্ধুদের নিয়ে মিছিল বের করেছে। সবার মুখে মুখোশ। সাদা স্কার্ট, সাদা জুতো পায়ে। মুখোশগুলো শালিখ পাখির, কাকের, কোনোটা কাঠবিড়ালির। সাপের মুখোশও আছে। টুপু পরেছে হনুমানের মুখোশ। বিচিত্র সব মুখোশ পরে পাড়ার কচি-কাঁচারা বের হয়ে পড়লে তামাশা দেখারও লোকের অভাব হয় না।

বুকে সবার ব্যাজের মতো চারকোনা বোর্ড ছুলছে।

কোনোটায় লেখা, 'গাছ কাটা চলবে না।' কেউ লিখে নিয়েছে, 'গাছ কাটলে পাপ হয়।' কারও বোর্ডে লেখা, 'গাছ একটি প্রাণ।'

কেউ লম্বা হাইফেন দিয়ে লিখেছে, 'গাছের কী দোষ? সে বড়ো হয়, নিজের মতো বাঁচে। কারও অনিষ্ট করে না।'

'গাছ কাটা চলবে না। গাছের ডালপালার পাখিরা যাবে কোথায়? টুনটুনি পাখিদের কী হবে!'

রাস্তায় এমনিতেই লোকজন মেলা। বাস, মিনিবাসও কম না। বাসস্টপে যাত্রীদের ভিড়ও আছে। তারপর সব বাস থেমে গেলে, বাসযাত্রীরাও কম কৌতূহলী হয়ে উঠল না। তরতর করে সবাই নেমে পড়ল।

ওরা সবাই সমস্বরে গান গাইছে, 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ হ্যাভ ইউ এনি উল...'?

যাত্রীরা, কিংবা ভিড় করে যারা দাঁড়িয়েছে, তারা বুঝল গাছ-কাটিয়েদের চোখের চামড়া নেই। হ্যাভ ইউ এনি উল? তার মানে, গায়ের চামড়া আছে কি না তাতেও তাদের সংশয়।

ওরা মিছিল করে উলটোডাঙা পর্যন্ত গেল। বনটাকে প্রদক্ষিণ করে ফিরে এলে সবার ঘরে ঘরে খবর, ব্যাপার খুবই গোলমেলে। সরকার ইচ্ছে করলেই বুলডোজার, কোদাল, গাঁইতি, শাবল এনে, গাছ উপড়ে ফেলতে পারবে না। বড়োরকমের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতেই হবে।

টুপুদের মিছিলটাকে কেউ হেয় চোখে দেখল না। এসব বিষয়ে যা হয়, মেয়েটার জন্য সবারই গর্ব বোধ হতে থাকে। বাবা বাড়ি ফিরে সব শুনে থ'। শত হলেও বাবা, তিনি ডেকে ধমক না দিয়ে পারলেন না, 'কী হচ্ছে সব টুপু! পড়াশোনা তোমার গোল্লায় গেছে! হেমাঙ্গকাকা, আপনারা বাড়িতে আছেন কেন? আপনাদের চোখের সামনে টুপু শেষে গোল্লায় যেতে বসেছে।'

হেমাঙ্গদাদুর সোজা উত্তর, 'গোল্লায় যাবে কেন বড়োবাবু, টুপু তো উচিত কাজই করছে।'

'এটা উচিত কাজ! তার পক্ষে শোভা পায়? সরকার কি আপনাদের চেয়ে কম বোঝে! সরকারের রাস্তা, যা খুশি করবে। গাছ লাগাবে, কাটবে, আবার গাছ লাগাবে, গাছ না লাগিয়ে গড়ের মাঠও করে দিতে পারে। সবটাই সরকারের মরজি।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'অবশ্য ঠিক না। অমল ফোন করেছে, টুপু যেন ঝামেলার মধ্যে না থাকে।'

টুপু দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছে।

'থাকলে কী হবে?'

'পুলিশ আসবে! মারদাঙ্গা হবে। ধরে নিয়ে যাবে। তারপর জামিনে খালাস করে আনতে হবে। অমল বিপদে-আপদে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাকে চটিয়ে লাভ আছে?'

'মুশকিল, টুপু না থাকলেও প্রতিরোধ হবে। এলাকার মানুষেরাই বাধা দেবে। গাছ কাটতে দেবে না।'

ইস, টুপুর যে কী দরকার ছিল! 'এই মেয়ে, এদিকে শোন!'

'আমাকে বকছ কেন বাবা, আমি কী করেছি?'

অহিভূষণ খাটে শুয়ে সব শুনতে পাচ্ছেন। একবার উঠে গিয়ে যে বড়োপুত্রকে তড়পাবেন, তারও সাহস হচ্ছে না। সামনে পড়ে গেলেই বলবে, 'আপনার আশকারাতেই টুপুর মাথাটি গেছে। নিজের ভালোমন্দ পর্যন্ত বোঝে না। এখন নিন, ঠ্যালা সামলান।'

টুপু গুটি গুটি দাদুমণির ঘরের দিকে এগোতে থাকল। আর পরদিন সকালে উঠে কাগজ হাতে নিয়ে অহিভূষণ অবাক!

প্রথম পাতায় মুখোশের ছবি।

গাছপালার পাশ দিয়ে একটা মিছিল যাচ্ছে। টুপু আগে। ওর মুখে হনুমানের মুখোশ। এই বিচিত্র মিছিল নিয়ে লেখালেখিও শুরু হয়ে গেছে কাগজে।

'টুপু কই রে?'

টুপু দৌড়ে এসে বলল, 'আমাকে ডাকছ?'

'এই দেখ ছবি। কাগজে কী লিখেছে দেখ। লিখেছে, সত্যিই তো, গাছ নিজের মতো বাঁচে, নিজের মতো বড়ো হয়। সে কারও অনিষ্ট করে না। সরকারের মাথায় কেন এটা যে ঢুকল!'

অহিভূষণ টুপুর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'দিদিভাই, শেষরক্ষা কি হবে?'

টুপু কী বলবে! সে তো চেষ্টা করছে। গাছগুলো কেটে ফেললে, দাদুমণি আরও একা হয়ে যাবেন, সে শুধু এইটুকুই বোঝে।

৪

না, শেষরক্ষা বুঝি আর হল না।

সকালেই টুপুর কাছে খবর চলে এল, ওরা আসছে।

টুপু কী করবে বুঝতে পারছে না।

সে দৌড়ে ঝুলবারান্দায় ঢুকে গেল। দেখল, মোড়ের মাথায় দুটো উঁচু ক্রেন, লোকজনের ভিড়, গাঁইতি, কোদাল। বাস, মিনিবাস বন্ধ। পুলিশ জায়গাটা ঘিরে ফেলেছে। টুপু ভ্যাবাচাকা খেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ও দাদুমণি, কী সর্বনাশ, লোকগুলো গাছের ডালে উঠে যাচ্ছে। ডালপালা কেটে দিচ্ছে। ও দাদুমণি, কী হবে!'

তাহলে ওরা এসে গেল! অহিভূষণের বুকটা কেঁপে উঠল।

একটা লোক চোং-মুখে বলে যাচ্ছে, 'আমরা গাছ কাটব না। আমরা গাছ তুলে রাস্তার ধারে ফের লাগিয়ে দেব। সরকার থেকে নোটিশ আছে, গাছ যেন কাটা না হয়।'

অহিভূষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। এইসব বিশাল গাছ তুলে ফের লাগালে বাঁচে! এরা কি আমাদের আহাম্মক ঠাউরেছে! গাছের শেকড়বাকড় ওপড়ানো এত সহজ!

টুপু দৌড়ে নীচে নেমে যাবে ভাবল।

মৃদুল তখন ডাকলেন, 'টুপু, তুমি বাইরে যাবে না। হেমাঙ্গকাকা, সিঁড়ির দরজায় তালা দিয়ে দিন। টুপুকে রাস্তায় বের হতে দেবেন না। গণ্ডগোলের আশঙ্কা আছে।'

তারপরই টুপুকে শুনিয়ে যেন বলা, 'তোদের কথাই শেষ পর্যন্ত সরকার মেনে নিয়েছে। গাছ কাটা হবে না। গাছ তুলে রাস্তার দু-পাশে ফের লাগিয়ে দেওয়া হবে। আর কত আবদার তোদের সহ্য করবে সরকার!'

টুপু কলে আটকা-পড়া ইঁদুরের মতো ছোটাছুটি করছে বাড়ির মধ্যে। দাদুমণির ঘরে ঢুকে দেখছে, ঘর ফাঁকা। কোথায় গেলেন দাদুমণি! শেষে সে ঝুলবারান্দার এক কোনায় দেখল দাদুমণি দাঁড়িয়ে আছেন। গাছে উঠে যারা ডালপালা ছেঁটে দিচ্ছিল, তাদের গালিগালাজ করতে করতে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন দাদুমণি। আর থরথর করে কাঁপছেন।

অহিভূষণ চোখে অন্ধকার দেখছেন।

'টুপু, টুপু।'

'এই তো, আমি।'

দাদুমণি হাওয়ায় হাত তুলে একজন অন্ধ মানুষের মতো চারপাশে যেন কিছু খোঁজাখুঁজি করছেন। 'কী হল তোমার! এই তো আমি। এই যে,' তারপর আর কী করে টুপু, দাদুমণির হাত মাথায় রেখে বলল, 'আমি, বুঝতে পারছ না! চোখে দেখতে পাচ্ছ না আমাকে! আমি টুপু।'

দাদুমণি কোনোরকমে যেন দেওয়াল ধরে ধরে টুপুকে ভর করে ঘরে ঢুকে আর সত্যিই পারলেন না। পড়ে গেলেন মেঝেতে।

টুপু চিৎকার করে উঠল, 'মা, বাবা, শিগগির এসো। দাদুমণি পড়ে গেছেন। তুলতে পারছি না। দাদুমণির কিছু হয়েছে।' বলেই ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল।

সেই থেকে অহিভূষণ বিছানায়। নড়তে পারেন না, পাশ ফিরতে পারেন না। টুপু সুযোগ পেলেই শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে। আর চোখের জল ফেলে। গাছগুলোর কেটে ফেলার আতঙ্কে দাদুমণি সেই যে অন্ধকারে ডুবে গেলেন, আর যেন আলোর মুখ দেখবেন না।

ডাক্তার সব শুনে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, 'মাথার জানলাটা বন্ধ রাখবেন খুলবেন না। শক থেকে হয়েছে।'

সেই থেকে মাথার কাছের জানলাটা বন্ধ।

টুপুর কেন জানি মনে হয়, জানলাটা খুলে দেওয়া দরকার। এমনিতে কিছু দেখতে পান না বোধ হয়, কথাও বলতে পারেন না, জানলাটা খুলে দিলে তাকে দেখতে পাবেন। তাকে দাদুমণি চিনতেও পারেন না।

সে ফিসফিস করে বলে, 'দাদুমণি, আমি টুপু।'

দাদুমণি তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। মনে হয় কিছু তাকে বলতে চান। মাঝে মাঝে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

সে মায়ের কাছে গিয়ে আবদার করে, 'দাও না মা, জানলাটা খুলে।'

কিন্তু জানলা খুলে যদি দেখেন, গাছপালা কিছুই নেই। পাখিও উড়ছে না, এমনকী একটা শুঁয়োপোকাও ঘরে এসে ঢুকছে না, তবে দাদুমণি যে আরও কষ্ট পাবেন। সে কেমন ভাবতে গিয়ে বোকা হয়ে যায়।

টুপুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার মা বললেন, 'দেব। ভালো হয়ে উঠুক, দেব। তুমি স্কুলে যাও।'

সে স্কুলে যাওয়ার আগে দাদুমণির ঘরে ঢুকে রোজকার মতো বলল, 'স্কুলে যাচ্ছি। ভালো হয়ে থেকো। দুষ্টুমি করবে না। মার কথা শুনবে।'

সে স্কুল থেকে ফিরেই দাদুমণির ঘরে ঢুকে যাবে। দাদুমণিকে স্কুলের খবর দেবে। আন্টিরা তাকে খুব ভালোবাসেন, বলবে। আন্টিরা খুব খুশি। গাছপালার জন্য তার মায়া-মমতার কথা স্কুলে চাউর হয়ে যাওয়ায় সবাই তাকে চেনে। স্কুলের দারোয়ান পর্যন্ত তাকে 'টুপুদিদি' 'টুপুদিদি' করে। কিন্তু ওরা তো জানে না, তার মন ভালো নেই। গাছপালা তুলে ফেলায় সে কী কষ্ট পেয়েছে, দাদুর কষ্ট যে কী, একমাত্র সে-ই বোঝে।

স্কুল থেকে ফিরে দাদুমণির সঙ্গে আপনমনে কথা বলারও অভ্যাস গড়ে উঠেছে। তার মনে হয়, তিনি সারাদিন তারই প্রতীক্ষায় থাকেন। তার কাছেই সব খবর পেতে চান। কথা না বলতে পারলে কী হবে, তার কথা দাদুমণি খুব আগ্রহের সঙ্গে শোনেন। তার মনে হয়, তিনি সব বুঝতেও পারেন।

'জান দাদুমণি, গাছগুলো সব তুলে ফেলেছে। গাছগুলো তুলে রাস্তার ধারে ফেলে রেখেছে। ডালপালা সব কাটা। গাছের কী কষ্ট, না? বড়ো বড়ো গর্ত করা হচ্ছে। গাছগুলোকে বসিয়ে দেওয়া হবে। দেখবে, একটা গাছও তোমার মরবে না।'

বাবা কী শুনতে পেয়ে ডাকলেন, 'টুপু, শোনো।'

আজ মা-ও অফিস যাননি। বাবাও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছেন। আমেরিকার পিসিকে বাবা ফোনে সব খবর দিয়েছেন। কী খবর দিয়েছেন, তা অবশ্য সে জানে না। সে কাছে থাকলে কেউ দাদুর সম্পর্কে কোনো

কথাই বলেন না। সে বুঝতে পারছে না কিছু। বাবা অফিস থেকে ফিরেই রোজ বাথরুমে ঢুকে যান। আজ তাও গেলেন না। মা টেবিলে নিবিষ্টমনে একের পর এক চিঠি লিখে চলেছেন। হেমাঙ্গদাদু চুপচাপ তাঁর ঘরে বসে আছে।

দাদুমণি কি আজ মরে যাবেন!

সঙ্গেসঙ্গে বুক ঠেলে কান্না উঠে আসছিল টুপুর। বাবা তো কখনো তাকে দাদুমণির ঘর থেকে এভাবে ডেকে নিয়ে আসেন না! সে খুবই ঘাবড়ে গেছে।

বাবা সোফায় হেলান দিয়ে বসে। একবার মায়ের দিকে তাকালেন কী ভেবে। মা বাবার দিকে কিছুতেই তাকাচ্ছেন না। মায়ের যেন এই মুহূর্তে বাবার কোনো কথা শোনারই আগ্রহ নেই। বাবা কী ভেবে, তার দিকে তাকালেন, 'তুমি যাও টুপু। ছাদে গিয়ে খেলো গে।'

টুপু গেল ঠিক, তবে ছাদে নয়। দরজার আড়ালে

বাবা বলছেন, 'নার্সিংহোমে গেলে বাবা যে ক-দিন বাঁচতেন তাও বাঁচবেন না। টুপু না থাকলে তিনি কী নিয়ে বাঁচবেন বোঝো না! তোমার অসুবিধে হয় ভেবেই তো দিনে-রাতের লোক রেখে দেওয়া হয়েছে। হেমাঙ্গকাকা তো বাবার ঘর থেকে নড়ছেনই না।'

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দাদুমণির কত কথা, তাঁর কথাবার্তা মনে হলেই সে এখন ফুঁপিয়ে কাঁদে।

'কী রে টুপু, জুতো পরলি না! জুতো না পরলে পায়ের আঙুল ফাঁক হয়ে যায়। ঠান্ডা লাগে। খালি পায়ে থাকিস কী করে!'

'তুমি কিচ্ছু জান না দাদুমণি। সবসময় জুতো পরলে পা রোগা হয়ে যায়, জান? পায়ে ঘা হয়, জান!'

দাদুমণির কী হাসি!

'হাসছ কেন?'

'কে বলল, জুতো পরলে পা রোগা হয়ে যায়?'

'আমি জানি।'

দাদুমণির কী আফশোস। 'তুই সব জেনে বসে আছিস!'

তারপর বলতেন, 'রাস্তার মাঝখান বরাবর কতদূর এক সুন্দর অরণ্য সৃষ্টি করেছিল মানুষ, মানুষই তা নষ্ট করে দিচ্ছে।'

আবার বলতেন, 'এই রাস্তায় ট্রাম লাইন না বসালেই কি চলত না! সারা শহর জুড়ে কেবল ইট কংক্রিট।'

পৃথিবীর কোথায় কী অরণ্য আছে, কোথায় সেই আমাজন অরণ্য, দাদুমণি ম্যাপ দেখিয়ে কতদিন বুঝিয়েছেন। বলেছেন, 'গাছপালার মধ্যে মানুষ বাঁচে। মানুষ বলো, কীটপতঙ্গ বলো, পোকামাকড়, সবই সে বাঁচিয়ে রাখে।'

ছাদের টবে, বারান্দায়, যেখানে যতটুকু ফাঁকা জায়গা পেয়েছেন দাদুমণি, কেবল গাছ, নাহয় বনসাই।

সে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কত কিছু যে ভাবছে! তখনই ফের বাবা কী বলছেন, দরজার আড়াল থেকে টুপু কানখাড়া করে শুনছে।

'এত বুঝিয়েছি, দেখুন বাবা, আপনি অহেতুক কষ্ট পাচ্ছেন। গাছগুলো উপড়ে ফেলা হচ্ছে কে বলল! ভাবলাম, বিপদ কেটে গেছে। খাচ্ছেন, কথা বলছেন, বোঝালে যদি বোঝেন! না, ভস্মে ঘি ঢালা। কিছুতেই মানতে রাজি না। এক কথা, এত বড়ো গাছ উপড়ে নিলে বাঁচে! এ কি চারাগাছ? কত দূর কোথায় তাদের শেকড়বাকড় চলে গেছে। ডালপালা মেলে দিয়েছে আকাশে। বাবা রিফিউজি ছিলেন, এর চেয়ে বেশি হয়তো ভাবতেও পারেন না।'

হেমন্তে পাতা ঝরে গেছে। শীতে শুকনো পাতা ওড়াউড়ি করেছে। গ্রীষ্মে হলুদ-লাল ফুলে শহরের এই একটুকু জায়গায় প্রকৃতি উজাড় করে দিতে চেয়েছে সব। গাছ যে কথা বলে, তখন নাকি তিনি তা টের

পেতেন।

মায়ের এক ধমক। 'রাখো তোমার বাজে কথা। ছিটগ্রস্ত মানুষকে নিয়ে আমার হয়েছে যত জ্বালা! যখন-তখন অফিস কামাই করতে আমি পারব না। সেরে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখছি না।'

টুপু বুঝতে পারছে না, বাবা কেন তাকে চুপিচুপি দাদুমণির ঘর থেকে ডেকে আনলেন, কেনই-বা ছাদে গিয়ে খেলা করতে বললেন। দাদুর শিয়রের জানলাটা খুলে দিলে হয়। কিন্তু এখন যে দাদু খাটে শুয়ে কিছুই দেখতে পাবেন না। গাছ থাকলে তো তার ডালপালা থাকবে। গাছই নেই, হাওয়ায় ডালপালা ওড়াউড়ি করবে কী করে!

বাবা একদিন ধমকও দিয়েছিলেন, 'টুপু, শোনো।'

সে কাছে গেলে বাবা বলেছিলেন, 'দাদুকে কেন বলতে গেছ, রাস্তাটা খোঁড়াখুঁড়ি করে নষ্ট করে দিল। ওসব বোলো না, দাদু শুনলে কষ্ট পান।'

তখনই সে দরজার আড়াল থেকে শুনতে পেল মায়ের কথা। বাবাকে মা বোঝাচ্ছেন।

'শোনো, আমরা কেউ সারাদিন বাড়ি থাকি না। কিছু যদি হয় টুপু একা পড়ে যাবে। হেমাঙ্গকাকারও মাথা ঠিক নেই। কর্তাবাবুর অসুখে তাঁর নাকি মাথায় কিছু নিচ্ছে না। কিছু হলে টুপু ভয় পেতে পারে।'

'তার মানে?'

'মানে সোজা। নার্স, আয়া কী করবে! ভয় পেয়ে টুপুর কিছু একটা হলে আমি যাব কোথায়! আমি অরুণের সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের নার্সিং হোমের খ্যাতি আছে। যে ক-দিন বাঁচেন, ওখানেই থাকুন।'

টুপু দরজার আড়াল থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, 'না, দাদুমণি নার্সিং হোমে যাবে না। দাদুমণি বাড়িতেই থাকবে।'

টুপু যে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে, ওঁদের বুঝতে অসুবিধে হল না।

'নাও, হল তো, মেয়েটা কী ভাবল!' টুপুর বাবার আফশোস!

'ভাবুক। যা করছি ওর ভালোর জন্যই করছি। এত গোঁ মেয়ের! এত সেয়ানা! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে!'

টুপুর বাবা জানেন, রাগলে টুপুর মা ছিন্নমস্তা হয়ে যান। শোভন-অশোভন কিছুই মাথায় থাকে না। মেয়েটার চুল ধরে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দেবেন। তার আগেই হয়তো টুপু ছুটবে তার নিরাপদ জায়গায়। দাদুর খাটের তলায় গিয়ে বসে থাকবে। কিন্তু আজ সে তার নিরাপদ জায়গায় নাও যেতে পারে। দাদুমণির জন্য তার মাথা ঠিক নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে পারে।

কিন্তু টুপুকে খুঁজতে এসে তাঁরা তাকে দরজার আড়ালে পেলেন না।

কোথায় গেল!

সামনে হেমাঙ্গকাকা।

'টুপু কি বাবার ঘরে?'

তারপর খোঁজাখুঁজি। কোনো ঘরে নেই, ছাদে নেই। পাশের বাড়িতে নেই। একা সে কোথাও যায় না। তবু অহিভূষণের খাটের তলায় গিয়ে একবার উঁকি দিলেন টুপুর বাবা। নেই।

মেয়েটা কি টের পেয়ে গেছে, তার বাবা, মা প্রকৃতই নিষ্ঠুর।

ওঁরা রাস্তায় নেমে গেলেন। দোকানিদের জিজ্ঞেস করলেন, টুপুকে তারা দেখেছে কি না!

হেমাঙ্গকাকাও বসে নেই। তিনিও ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছেন। কিছুটা হেঁটে যেতেই দেখলেন, টুপু একটা গাছের গুঁড়িতে বসে আছে। সদ্য গাছটা লাগানো হয়েছে। ডালপালা নেই। শুধু একটা বিশাল কাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে গাছের।

'তুই এখানে টুপু?'

গাছটার দিকে তাকিয়ে টুপু যেন কিছু খুঁজছে।

'এই টুপু, কী রে, কী দেখছিস?'

টুপু কিছু বলল না। ছুটে আবার কিছুটা গেল।

হেমাঙ্গ বলছে, 'আরে তোর কী হল! বড়োবাবু খুব রেগে গেছেন। এত সাহস তো ভালো না! একা বের হয়ে এলি!'

টুপু ঠিক সেই আর-একটা গাছের কাছে, গাছগুলো ওপড়ানো হয়েছিল। গাছগুলো গর্ত করে লাগিয়েও দেওয়া হয়েছে। তবে গাছ একটাও বাঁচবে বলে মনে হয় না। টুপু গাছের কাণ্ডে কী খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হেমাঙ্গ এবার জোরজার করেই টুপুকে ধরে নিয়ে গেল।

বাড়ির কাছে গেলে, টুপু হেমাঙ্গর হাত ছাড়িয়ে নিজেই ছুটে গেল বাড়ির ভেতর। বাবা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে।

'এই তো টুপু। টুপু এসেছে। কোথায় গিয়েছিলি! এ কী রে, কোনো কথা বলছে না। বিচ্ছু মেয়ে রে বাবা।'

সোজা সে তার দাদুমণির ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, 'জান দাদুমণি গাছগুলো সব লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলোয় আবার ডালপালা মেলবে, না দাদুমণি!'

অহিভূষণ টুপুকে দেখলেন চোখ মেলে। গাছের খবর, রাস্তার খবর টুপুই তাঁকে এখন দেয়। তিনি তাঁর হাতে-পায়ে জোরও পান টুপু কাছে এলে, কথা বললে।

টুপু ফের বলল, 'তুমি ভালো না হয়ে উঠলে, কে আমাকে গাছের নীচে বেড়াতে নিয়ে যাবে!'

একদিন টুপুর বাবা দেখলেন, অহিভূষণ টুপুর হাত ধরে খাট থেকে নামার চেষ্টা করছেন।

টুপুর বাবা ঘাবড়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'এই টুপু, এ কী হচ্ছে? করবী, দেখো এসে তোমার মেয়ের কাণ্ড।'

'বা রে, আমার দোষ কী! কাল থেকে দাদুমণি বারান্দায় বসার জন্য বায়না করছে, এই টুপু, আমার হাত ধর। বারান্দায় যাব। ধর দিদিভাই। এমন বললে কেউ না ধরে পারে!'

টুপুর বাবা অবাক হয়ে মেয়ের সাহস দেখে কী বলবেন ভেবে পান না।

অহিভূষণ নির্বাক। অসাড় জিভ। তাও নেড়েচেড়ে কথা বলার চেষ্টা করলে গোঁ-গোঁ শব্দ ছাড়া কিছু বোঝা যায় না। আসলে টুপু বোধ হয় মিছে কথা বলছে। দাদুমণিকে বারান্দায় নিয়ে দেখাতে চায়, সত্যি, গাছগুলো আবার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। গাছগুলো বেঁচে গেলে দাদুমণিও তার ভালো হয়ে উঠবেন, এটা কি টের পেয়েছে টুপু! তাহলে আর নার্সিংহোমে যেতে হবে না এমনও ভাবতে পারে। শিশুরা কি অনেক কিছু আগে থেকেই টের পায়!

তিনি বললেন, 'বাবার নামে তোর মিছে কথা বলতে আটকায় না! বাবা তো কথাই বলতে পারেন না। বাবা কী করে বলবেন, বারান্দায় যাবেন?'

মৃদুল তাঁর বাবাকে বললেন, 'এটা কী করছিলেন আপনি? টুপু কি পারে? পড়ে-টড়ে গেলে কী হত! চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আর একটু ভালো হয়ে উঠুন, তখন আমি, নাহয় আপনার বউমা বারান্দায় নিয়ে যাব।'

বুড়োমানুষটা টুপুর এত কথা বোঝেন, অথচ পুত্রের কথা একদম বুঝতে পারেন না। টুপু কাছে থাকলেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

বাবা তাকে মিথ্যুক বলায় টুপুর খুবই অভিমান হয়েছে। সে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর অভিমানে ফেটে পড়ার আগে অহিভূষণের সামনে গিয়ে প্রায় ধমকের গলায় বলে উঠল, 'দাদু, তুমি বলোনি, বারান্দায় যাবে, বলোনি? কী, চুপ করে থাকলে কেন? আমি মিছে কথা বলেছি, বলো! আমার কী দোষ, কেবল সবাই আমাকে দুষছে।'

মৃদুল কী আর করেন! তিনি মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন। আদর করলেন। তারপর বললেন, 'দাদুমণি বলুক-তুমি বলবে, না এখন হবে না। কী, বলবে তো? দাদুমণি পড়ে-টড়ে গেলে তুমি কষ্ট পাবে না?'

দু-হাতে চোখ মুছতে মুছতে দাদুমণির দিকে তাকিয়ে টুপু বলল, 'তুমি আমাকে বারান্দায় নিয়ে যেতে কখনো বলবে না। কখনো না। কিছু হলে সব দোষ আমার।'

অহিভূষণের চোখ কেমন নিথর হয়ে আছে।

'চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি। টুপু, আয়ামাসিকে বলো, একটা ইজিচেয়ার পেতে দিক।'

অহিভূষণ নড়লেন না। বসে থাকলেন।

'ধরব?' বলে মৃদুল অহিভূষণের কোমরের কাছে হাত নিয়ে গেলেন।

অহিভূষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মধ্যে কোনো সজীবতাই যেন নেই। নড়বার ক্ষমতা নেই। শরীর যেন অসাড়। কেবল গোঁ-গোঁ করে কী বলার চেষ্টা করছেন।

টুপু বলল, 'তুমি ধরে নিয়ে গেলে যাবে না বলছে।'

'তুই থাম তো। না বুঝেসুঝে যা মনে আসছে বলছিস।'

টুপু ভেবে পেল না, দাদুমণির কথা বাবা বুঝতে পারছেন না কেন! দাদুমণি সবই ঠিকঠাক বলছেন। দাদুমণি জানেন গাছগুলো লাগানো হয়ে গেছে। তারপর থেকেই তিনি উঠে বসতে পারছেন। টুপু আজ সকালে মিছে কথাও বলেছে।

'জান দাদুমণি, লাউডগা সাপটা না একটা গাছের গর্ত থেকে উঁকি দিয়ে আমাকে দেখল। কী বলল, জান? বলল, তোর দাদুমণিকে মন খারাপ করতে বারণ করিস। গাছের গোড়ায় আমি আছি। গাছ মরে গেলেই হবে! সাপটা না জিভ দিয়ে আমার পাও চেটে দিল।'

টুপুর এমনই বিচিত্র ধারণা, পাখি, প্রজাপতিরা আবার উড়ে আসবে। পাখিরা ওড়াউড়ি করবে। এসব কথা সে যখন বলে, দাদুমণি হাত তুলে তাকে আদর করতে চান। দেওয়ালের ছবিগুলোর দিকে তখন তিনি তাকিয়ে থাকেন।

টুপুর বাবা অফিস যাওয়ার সময় বললেন, 'বাবার শরীর যেন আজ স্পঞ্জ করে দেওয়া হয়। বাসু ডাক্তার বলেছেন, এখন তিনি যা খেতে চান তাই দিতে।'

কিন্তু কী খেতে চান, তাই তো কেউ বোঝে না। টুপু ছাড়া আর কেউ তাঁর কথাও বোঝে না। টুপু কি সত্যি বোঝে বাবার কথা?

তিনি এবার কী ভেবে টুপুকে বললেন, 'জিজ্ঞেস কর তো তোর দাদুমণির কী খেতে ভালো লাগে।'

টুপু দৌড়ে গেল। আবার ফিরেও এল সঙ্গেসঙ্গে।

'পলতা পাতার শুক্তোনি করে দিতে বলল।'

মৃদুল করবীকে ডেকে বললেন, 'বাবাকে পলতা পাতার শুক্তোনি করে দিতে বলো। যদি দুটো খান। এখন নাকি খাওয়া খুব দরকার।'

করবী বিস্ময়ের গলায় বললেন, 'এত সব করে দেওয়া হয়, কিছুই মুখে দিতে চান না। পলতা পাতার শুক্তোনি দিয়ে খাবেন, তবেই হয়েছে।'

আর আশ্চর্য, দেখা গেল পলতা পাতার শুক্তোনি দিয়ে তিনি সত্যিই তৃপ্তির সঙ্গে ভাত ক-টা খেয়ে ফেলেছেন।

আরও আশ্চর্য, অহিভূষণ যেদিন নিজেই হেঁটে খাওয়ার টেবিলে চলে গেলেন। টুপু হাত ধরে নিয়ে এসেছে। টুপুর ভরসাতে এভাবে উঠে আসা ঠিক হয়নি, টুপুরও উচিত হয়নি নিয়ে আসা। কিছুটা গম্ভীর থাকায়, টুপু নিজেই তার দোষখণ্ডনের জন্য বলল, 'দাদু যে বলল, আজ টেবিলে খাবে। তাই তো ধরে নিয়ে এলাম। আমি তো বলেছি, তুমি কবে ভালো হবে, কবে যাবে রাস্তায়? না হাঁটলে চলে!'

টুপু আজকাল সুযোগ পেলেই বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। ফুটপাথ ধরে ছোটে। তার মনে হয়, পাখপাখালি উড়ে এলেই গাছে পাতা আসবে। সাপটা গাছের গুঁড়িতে বাসা বাঁধলেই ফুল আসবে। টিকটিকি, শুঁয়োপোকা গাছ বেয়ে উঠে গেলেই গাছ বেঁচে থাকার জন্য ছটফট করতে থাকবে।

টুপু রোজই পালিয়ে যায়। কিন্তু কোনো সুখবর আনতে পারছে না। অহিভূষণ ব্যাজার মুখে বিছানায় বসে থাকেন।

সেদিনও টুপু যাচ্ছে। খুব সকালে ঘুম থেকে কেউ ওঠে না। হেমাঙ্গদাদু সিঁড়ির কোলাপসিবল গেট খুলে দেন। দুধ, ডিম, পাউরুটি দিয়ে যায় একটা লোক। গেট খুললেই টুপু হেমাঙ্গদাদুর পেছনে, তার খুব তাড়া, হেমাঙ্গদাদু তার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় এসে নামে। 'একটু দাঁড়াও' বলেই দৌড়োয়। তারপর ফিরে আসে। গাছের কাণ্ডগুলো দাঁড়িয়েই আছে। ভেতরে কোনো প্রাণের সাড়া নেই।

দেখতে দেখতে পুজোর মাসও এসে গেল।

টুপুর নিজেরও মনখারাপ। গাছগুলো কি সত্যি তবে আর পাতা মেলবে না! রোজই খুঁজেছে, একেবারে যেখানে গাছগুলোর মাথার ডাল কেটে কালো কালো কীসব মাখিয়ে রেখেছে, তার নীচে যদি দুটো কিশলয় বের হয়। কিছুই বের হচ্ছে না। সে যে তার দাদুমণিকে কথা দিয়েছে-

কার্তিক মাসও এসে গেল। অগত্যা সে একদিন ফিরে এসে আবার মিছে কথা বলল, 'এসেছে।'

অহিভূষণ বললেন, 'সত্যি এসেছে!'

'হ্যাঁ, কী সুন্দর পাতা। ছোটো ছোটো কুঁড়ি মেলে দিয়েছে। বারান্দায় এসো না, এসো, দেখবে।'

অহিভূষণ বললেন, 'ধরতে হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব।'

টুপু জানে, বারান্দা থেকে গাছগুলো আর দেখা যায় না। তবু দাদুমণি যদি নিজে হেঁটে আসতে পারেন! সে মিছে কথা বলেছে ঠিক, তবে তার দাদুমণি ভালো হয়ে উঠছেন। কিন্তু যদি টের পান তিনি, সব মিছে কথা, তখন, তখন...

টুপু আর ভাবতে পারে না।

সে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছে। দাদুমণি ভালো হয়ে গেলেই নিজে হেঁটে চলে যেতে পারবেন।

সে বলল, 'ভগবান, তুমি গাছগুলোক বাঁচিয়ে দাও।' রাস্তায় যাওয়ার সময় সে নানা দেবদেবীকে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণামও করে। হেমাঙ্গদাদু ঠিক লক্ষ রাখেন। রাস্তায় একা বের হতে তার ভয় হয় না।

একদিন সকালে বেশ শিশির পড়েছে। গাছের গোড়ায় ঘাসও গজিয়েছে। সে একেবারে সামনের গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াতেই মনে হল পায়ে বরফ ঠান্ডা, কেউ চেটে দিচ্ছে যেন তার পা।

নীচে তাকাতেই সে আতঙ্কে লাফিয়ে উঠল। সেই সাপটা। সোনালি সাপ। চেরা জিভে তার পা চেটে দিচ্ছে। সে লাফিয়ে উঠতেই মুখটা গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। আর তখনই দেখল, গাছের ডালে দুটো কুড়ি। পাশাপাশি সবুজ ছোট্ট পাতা। সে আনন্দে কিছুক্ষণ বাক্যহারা। গর্তের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'দাদুমণি কী খুশি হবে!' সে দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দাদুমণির খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'দাদুমণি, ও দাদুমণি, সোনালি সাপটা আজ জিভ দিয়ে চেটে দিয়েছে। তুমি যাবে না? তুমি দেখবে না? গাছে পাতা এসেছে, তুমি যাবে না, তুমি দেখবে না?'

'গাছে কুঁড়ি এসেছে! সত্যি বলছিস?'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি, তোমাকে ছুঁয়ে তিন সত্যি করলাম।'

সেদিনই বিকেলে টুপুর বাবা দেখলেন, অহিভূষণের ঘর ফাঁকা। টুপুও নেই। সারাবাড়ি তোলপাড়। হেমাঙ্গদাদু এসে খবর দিল, 'দাদু-নাতনি মিলে কোথায় যে বের হলেন!'

'কী বলছ হেমাঙ্গকাকা? বাবা ঘর-বার হতে পারেন না।'

'দেখলাম চোখের ওপর। আমাকে পাত্তাই দিল না টুপু। বাধা দিতে গেলে কর্তাবাবু লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করলেন আমাকে।'

টুপুর মা, বাবা, এবং প্রতিবেশীরা বের হয়ে দেখলেন, অদূরেই টুপুর হাত ধরে অহিভূষণ দাঁড়িয়ে আছেন। গাছগুলোর ডালে ডালে তন্নতন্ন করে কিছু যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সবাই ছুটে যেতে চাইলে টুপুর বাবা বাধা দিলেন। টুপুর মাও ছুটে যেতে চাইলে হাত ধরে বললেন, 'যাবে না। বাবাকে নিয়ে টুপু গাছপালা দেখতে বের হয়েছে। দেখুক। বাবা আমাদের কাছে একটা গাছ, টুপুর কাছে বাবা মানুষ। আর গাছগুলো বাবার কাছে মানুষের শামিল। বাবা আমাদের এবার সত্যিই ভালো হয়ে যাবেন।'

আজব দেশে বুমবাই

এমন একটা মজার পৃথিবীর মানুষ রাঙাজেঠু ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল বুমবাইর। মা এল না ঝুপি এল না। বাবা রাগ করে তাকে একা নিয়েই চলে এসেছে। তাও রাঙাজেঠুর স্ট্রোকের খবর না পেলে বাবা এখানে কোনোদিন আসতে পারে বিশ্বাসই হয় না। আসবে কী করে! তার স্কুল ছুটি হলে হয় পুরী, নয় দার্জিলিং। একবার বাবা তাদের নিয়ে দিল্লিতে গেছিল। সেখান থেকে আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন হয়ে ফিরেছে। বড়োদিনের ছুটিতে মামার বাড়ি কলকাতায়। কিন্তু মাকে কিছুতেই রাজি করানো যায়নি। রাঙাজেঠু বছরে দু-বছরে গেলেই এককথা, 'বউমা, সবাইকে নিয়ে আমার ওখানে ক-দিন থেকে এসো। ভালো লাগবে।' মার বিশ্বাসই হয়নি, শহর থেকে ক্রোশ দুই দূরে রাঙাজেঠু এমন একটা মজার পৃথিবীর মানুষ।

শীতকাল। সামনে জানালা। কোন সকালে তার ঘুম ভেঙে গেছে। কত সব পাখি ওড়াউড়ি শুরু করে দিয়েছে। জেঠু বলেছে, কোনটা কী পাখি চিনিয়ে দেবে। কীটপতঙ্গের নাম পর্যন্ত।

সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

পাশে বাবা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। অত সকালে উঠতে দেখেই বলল, 'কীরে, উঠে পড়লি যে! রোদ উঠুক।'

'আমি পাখি দেখব বাবা।'

'ঠান্ডা লেগে যাবে। রোদ উঠুক। পরে উঠিস।'

আর এসময় দরজায় টোকা। কেউ ডাকছে, 'আংকল।'

বুমবাই আর স্থির থাকতে পারে না। দু-দিন হল সে এখানে এসেছে বাবার সঙ্গে। এসেই দেখেছে কীসব বিশাল কাণ্ডকারখানা! রাঙাজেঠুর বড়ো ছেলে কোন মার্কিন মুল্লুক থেকে হাজির। জেঠুর স্ট্রোকের খবরে তার ছোটো ছেলে থেকে যেখানে যত আত্মীয় সব হাজির। রাঙাজেঠুর বড়ো ছেলেকে সে বড়দা ডাকে। বড়দার মেয়ে অরু। সুন্দর পরীর মতো সোনালি চুলের মেয়েটার সঙ্গে তার ভারি বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বড়ো ঠান্ডা পড়েছে। শীতে সে বড়ো কাবু। ফুল সোয়েটার গায়ে গলিয়ে বলল, 'যাই অরু। দাঁড়া।'

তারপরই বুমবাই ভারি অস্বস্তিতে পড়ে গেল। অরুণিমা ঠিক একটা পাতলা লতাপাতা আঁকা ফ্রক গায় দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। এত শীতেও সে কোনো সোয়েটার গায়ে দেয় না। ভারি অবাক লাগে তার।

অরুণিমার বাংলা কথা শুনলে হাসি পায়। মেমবউদি 'ভালো আছি' 'কী সোন্দর' এমন দুটো-একটা বাংলা বলতে পারে। বুমবাই বলেছে, 'বড়োবউদি, তুমি কী! সোন্দর বলবে না, সুন্দর বলবে।' অরুরও তাই। সারাদিন সে অরুণিমাকে শিখিয়েছে, 'রাঙাজেঠু আমার বাবার মামাতো ভাই।'

অরু বলেছে, 'মামতা বাই।'

'ওহো নো নো। মা...মা...তো ভা...ই। বল।'

অরুণিমা বলেছে 'মা'...বুমবাই বলেছে, 'মা'...অরুণিমা বলেছে, 'তু'...বুমবাই বলেছে, 'তু হবে না, তো, তো বল।' অরুণিমা বলেছে...'তো'...

'তাহলে কী হল!'

'মামতো।'

ধুস। বুমবাই ইংলিশ মিডিয়ামে প্রথম ভরতি হবার সময় দিদিমণিরা ভেঙে ভেঙে যেভাবে ইংরাজি উচ্চারণ শেখাত, ঠিক সেভাবে সারাটা দিন অরুণিমাকে 'রাঙাজেঠু বাবার মামাতো ভাই' শিখিয়েছে। কিন্তু একটা জায়গায় সে বড়ো কাবু। শীতে তাকে ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দিতে হয়, অরুণিমা কোনো গরম জামাই গায়ে দেয় না।

সে বলেছে, শীত করে না।

'নো সিত।'

'নো শীত বল।'

'নো ছিত।'

'ইস তুই কীরে! শী...ত। কোল্ডকে আমরা শীত বলি। শীত বল।'

'সিত।'

'তোর বংশে কে সিত বলে জানি না। তুই যে কী! তুই আমার বড়দার মেয়ে, তুই ছিত বলবি! ইস সবাই শুনলে কী হাসাহাসি না করবে!'

'হাসা হিসি! হাসা হিসি কী!'

'তুই একটা বুদ্ধু!' হাসাহাসি শুনে বুমবাই খেপে গেছিল-'আমার কাছ থেকে যা তুই!' বুমবাই ইংরাজিতেই কথাটা বলেছিল। 'তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না!' হিসি বলতে কী বোঝায়, সেটা অরুণিমাকে কী করে বোঝাবে! বাংলা ভাষা এত মারাত্মক বুমবাই অরুণিমাকে বাংলা শেখাতে গিয়ে টের পেয়েছে। রাঙাজেঠু ইজিচেয়ারে শুয়ে না ডাকলে সে এ-কাজের ভারই নিত না! রাঙাজেঠুর একমাত্র বংশধর শীতকে ছিত বললে খারাপ লাগবে না! হাসিকে হিসি বললে খারাপ লাগবে না! সে কী জানত এমন একটা বিপাকে পড়বে! সকালে সে রাঙাজেঠুর পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'কই জেঠু, তুমি যে বললে, কোনটাকে কী পাখি বলে চেনাবে; বলতে, আমার বাড়িতে গেলে দেখতে পাবি, কী সব বিশাল আম-জাম গাছ আমার বাবা-কাকারা লাগিয়ে গেছেন, কত সব পাখি উড়ে আসে, কত সব রঙিন প্রজাপতি...'

তখনই রাঙাজেঠু কেমন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। বলেছিল, 'অরুটা বাংলা কিন্তু বোঝে। সব বোঝে না। বাংলা উচ্চারণ ঠিক নেই। তুই ওকে নিয়ে কোনটা কী গাছ, আমরা কে কার কী হই, বাড়িতে যারা আমাকে দেখতে এসেছে, তারা ওর কে হয়, আমরা কে কাকে কী ডাকি, বুঝিয়ে দে। ওর সঙ্গে বাংলায় কথা বলবি। না বুঝতে পারলে ইংরাজিতে কী বলে বলবি। অরু ঠিক তখন সব বুঝতে পারবে। মাটির সঙ্গে বংশের সঙ্গে সম্পর্কে গড়ে না উঠলে, ও তো একসময় একা হয়ে যাবে। যা, আগে এ-কাজটা কর, তুই ক্লাস সিক্সে পড়িস, ইংরাজি মিডিয়ামে, তোদের সেন্ট জেভিয়ার্সের কত নাম, তাঁর নামে স্কুল। অমন স্কুলের ছাত্র তুই। তুই পারবি।'

কাল সারাটা দিন জেঠুর সাম্রাজ্য অরুকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। কোনটা কী গাছ চিনিয়েছে। কিন্তু বাংলা উচ্চারণ শেখাতে গিয়ে এত বড়ো বিপাকে পড়বে বুঝতেই পারেনি।

সেই অরু কোন সকালে উঠে পড়েছে। তার ঘরের দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে সোয়েটার পরে বের হবে-কিন্তু সে জানে সোয়েটার পরলে অরুটা হাসে। ওর হাসি দেখে টের পায়, 'তুমি আংকল ভেরি ওল্ড ম্যান।' অরু ভারি মিষ্টি স্বভাবের। কেবল লাফায়। ছোটে। অরু জ্ঞান হবার পর এখানে এই প্রথম এসেছে। আট-দশ বছর আগে একবার বড়দা বউদিকে নিয়ে এসেছিলেন। বাবার কাছে শুনেছে, তখন রাঙাজেঠু কলকাতার বাড়িতেই থাকতেন। ছোড়দা আর রাঙাজেঠু। বাড়িতে মহাদেব আর রান্নার লোক ছাড়া কেউ থাকত না। ছোড়দা চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাবার পরই জেঠু বোধ হয় আর কলকাতার বাড়িতে একা থাকতে পারছিলেন না। তিনি তাঁর বাবা-কাকাদের পরিত্যক্ত আবাসে এসে উঠেছিলেন। বাড়ির গৃহদেবতার জন্য মন্দির বানিয়েছেন। দেবোত্তর সম্পত্তি সব। পতিত পড়েছিল।

সে বাবাকে প্রশ্ন করেছে, 'দেবোত্তর সম্পত্তি কী বাবা!'

বাবা তাকে দেবোত্তর সম্পত্তি কী বুঝিয়ে দিয়েছে।

বুমবাই বলেছিল, 'পতিত পড়েছিল মানে!'

বাবা বলেছিল, দেখার লোকজন ছিল না। আমার সব মামাতো ভাইয়েরা এক-একজন এক-এক মুল্লুকে। কার সময় আছে এত দেখাশোনা করে। রাঙাদাই শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়িতে কী ভেবে ফিরে এলেন। বুঝলি বুমবাই, দেশ ভাগের পরই আমার মামারা সব এখানে চলে এসেছিলেন। দেশের জমিজমা বাড়িটা বিক্রি করে এক লপ্তে দেড়শো বিঘা জমি কিনেছিলেন মামারা। সব জমিই ঠাকুরের নামে কেনা হয়েছিল। রাজার পতিত জমি, বনজঙ্গল ছিল জায়গাটা। বড়ো সস্তায় জমি কিনে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছিলেন। পাকা বাড়ি নয়। সব মাটির বাড়ি। উপরে টিনের চাল।'

স্ট্রোকের খবর পেয়ে বুমবাই বাবার সঙ্গে যখন রেলগাড়িতে আসছিল, তখনই বাবা তাকে সব বলেছে। তার মনে হয়েছিল, জেঠুর বাড়িটা হবে মিকি-মাউসের বাড়ির মতো। জেঠুর বাড়িতে পৌঁছোতে রাত হয়ে গেছিল। আবছা আলো-অন্ধকারে সব স্পষ্ট ছিল না। ইটের ঘরবাড়িই মনে হয়েছে। সকালে উঠে বুঝেছে, আসলে ঠিক ইটের নয়, পাকা মেঝে, দেওয়াল মাটির, রং করা। গেরিমাটি রঙের। ছোটো ছোটো কাঠের জানালা-ঘরের পর ঘর। মাথার উপরে টিনের ছাউনি দেখা যায় না। রঙিন ঘাসের বড়ো বড়ো টাইলস বসিয়ে ছাদের মতো করে নেওয়া হয়েছে।

রাঙাজেঠুর ঘরটা সবচেয়ে বড়ো। খাট পাতা। সারি সারি কাচের আলমারি। আর রাজ্যের সব বই। তার মনে হয়েছিল, মা এলে এত বই দেখেই ঘাবড়ে যেত! বাপরে বাপ! একটা লোকের, এত বই লাগে! টেবিলের পাশে একেবারে আধুনিক বাতিদান সোফাসেট। বেতের চেয়ার সাদা রঙের। সামনের লম্বা বারান্দায় বেতের চেয়ারগুলো পড়ে থাকে।

পরের ঘরটা লম্বা। পাশে বাথরুম। লাগোয়া একটা ঘরের দেওয়াল ইটের। মাথায় জলের ট্যাংক। ঘরে ঘরে বেসিন, হাত-মুখ ধোওয়া যায়। বড়ো বাথরুম। বাথরুম বাড়ির দু-দিকে দুটো। একটা কাজের লোকদের, একটা রাঙাজেঠুর নিজস্ব। বড়ো ফ্রিজটা রাখা হয়েছে, কাঁঠালতলার ঘরের দিকটায়। সেটা সে বোঝে রান্নাবাড়ি। একা মানুষ অথচ বেঁচে থাকার জন্য এমন এলাহি কাণ্ড। বুমবাইকে কিছুটা বোকা বানিয়ে দিয়েছিল।

সে বাবাকে বলেছিল, 'এত ঘর দিয়ে কী হয় বাবা! জেঠু একা!'

বাবা তাকে বলেছে, 'একা কোথায়! কত লোক বাড়িতে দেখছিস। তোর পিসিরাই তো এক ডজনের কাছাকাছি-তাও দেখছি, অনেকে আসেনি। সবাই একসঙ্গে বাড়িতে এসে উঠলে, কেউ কোনো অসুবিধা ভোগ না করে, রাঙাদা তার জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এই যে তুই আমি এক ঘরে, তোর দাদারা এক-এক ঘরে, পিসিরা এক-এক ঘরে, রান্নাবাড়ির দিকটাই লপ্তে লপ্তে খাবার ডাক পড়ছে, বাড়িটা এত বড়ো না হলে সবাই থাকত কোথায়, উঠত কোথায়!'

বুমবাইর তখন কী যে ক্ষোভ মার উপর! মার ধারণা, তার ভাইয়েরাই সব রাজালোক। বাবার আত্মীয়েরা সব প্রজালোক। দরজা খোলার আগে সে সাত-পাঁচ ভাবছিল। সোয়েটারটা গায়ে দেওয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না।

উফ কী শীত। শহরে এত শীত লাগে না। পাড়াগাঁয়ে শীত বুঝি বেশি। বুমবাই খুব প্যাঁচে পড়ে গেছে। তারপরই মনে হল, বাইরে বের হয়ে সামনের আম গাছতলায় দৌড়ে গেলে কিংবা মাঠের মধ্যে নেমে গেলে শীত করবে না। সকালটায় সে আজ ভাবল সরাক্ষণ দৌড়ঝাঁপ করবে, দৌড়ঝাঁপ করলে শরীর গরম থাকে। সোয়েটার না পরেই সে দরজা খুলে দিল।

আর সেই মেয়ে সামনে! সোনালি চুল, বব করা। পাতলা রেশমের উপর জরির কাজ করা ফ্রক। মুখে সেই সরল হাসি। ওর পাশে জলি, মলি, বাবলু, অপু, দীপুরা। অরু সবার ঘরের দরজায় ডেকে যেন এখানে হাজির। সে বের হয়ে যেতেই বাবার গলা-'এই বুমবাই, সোয়েটার গায়ে দিলি না!'

'না!'

'আরে ঠান্ডা লাগবে।'

'না লাগবে না।' বলেই ওদের সঙ্গে দৌড়ে বের হয়ে গেল।

বুমবাই বুঝেছে, ছোটোদের মধ্যে সেই সবার বড়ো। তার কথাই শেষ কথা। অরু পর্যন্ত তাকে সমীহ করে। অরুই একমাত্র মেয়ে যে সবাইকে আংকল কিংবা আন্টি বলে। আজও তাকে আংকল বলে ডেকেছে। সে ভিতরের লম্বা করিডোর দিয়ে যাবার সময় বলল, 'অরু, আবার তুই আংকল বলছিস! তুই কীরে! কাকা ডাকবি। বুমবাই কাকা, একশোবার বললেও দেখছি তোর কিছু মনে থাকে না। মাথায় কি তোর গোবর পোরা আছে!'

অরু বলল, 'কাকা।'

'বল, বুমবাই কাকা।'

'বোমবাই কাকা।'

'বোমবাই না। বুমবাই।'

এই চলে সারাদিন। বারান্দায় এসে দেখল রাঙাজেঠু ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। গায়ে মোটা সুতির কম্বল জড়ানো। পাশে মেমবউদি টি-পট থেকে লিকার ঢেলে জেঠুর চা দিচ্ছে। বড়দা একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে, ডালে পাতায় কী যেন খুঁজছে। ছোড়দা বড়দার কাছ ছাড়া হচ্ছে না। দু-দিন ধরেই দেখেছে যেখানে বড়দা, ঠিক সেখানে ছোড়দা। বড়দাকে না দেখতে পেলেই কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ছে।

'এই বুমবাই, বড়দা কোথায় গেল রে!'

বড়দারও এককথা, 'এই বুমবাই, ছোটন গেল কোথায়!'

সে বোঝে, আসলে বড়দা-ছোড়দা এখন এখানে রাঙাজেঠুর কাছে চলে এসে, তার আর ঝুপির মতো হয়ে গেছে। ছোট্ট হয়ে গেছে। কথায় কথায় দু-ভাইয়ে তুমুল তর্ক-বড়দা বলবে, 'আমি আর ফিরছি না। বাবা যাই বলুক।'

ছোড়দা বলবে, 'আলবত ফিরবে। বিদেশে পড়ে থাকবে! বাবাকে দেখে বুঝছ না, কেমন একা হয়ে গেছেন! ওখানে প্রাচুর্য আছে মানি। কিন্তু প্রাচুর্যই তো সব নয়। মনের দিক থেকে দেউলিয়া হতে হয়। জীবনে কিছুটা অনটন থাকা চাই। হাতের মুঠোয় সব পেয়ে গেলে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা মরে যায়।'

বড়দা বলবে, 'মোটেও না। ওটা তোর ভুল ধারণা ছোটন। তোকে এত করে বললাম, আমার সঙ্গে চল-গেলি না। নোংরা রাজনীতি চলছে। শুনেছি একটা এম.এল.এ. পর্যন্ত তোদের নাকি আজকাল ধমকধামক দেয়। অশিক্ষিতের রাজত্ব।

বুমবাই অবাক হয়ে যায়। বড়দা-ছোড়দা দু-জনই একসময় কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যায়! একজন বলবে,-'তুই কিছু জানিস না।'

অন্যজন বলবে, 'তুমি সব জেনে বসে আছ।'

তারপর দু-ভায়ে তুমুল তর্ক।

'তুমি আমার সঙ্গে কোনো কথা বলবে না!'

'তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস তো ভালো হবে না!'

বুমবাই তখন চুপিচুপি গিয়ে রাঙাজেঠুকে খবর দেয়, 'জান জেঠু, বড়দা আর ছোড়দা না বাঁশঝাড়ের ওদিকটায় ঝগড়া করছে।'

'যা বলগে, আমি দুটোকেই ডাকছি।'

বুমবাইর তখন কাজ ছুটে যাওয়া। বুমবাইর সঙ্গে সঙ্গে সবাই তখন ছুটতে থাকে। কাঁঠালতলা পার হয়ে বড়ো একটা পুকুর, শান-বাঁধানো ঘাট। ঘাটে বাবা বঁড়শি ফেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে। ফাতনায় চোখ। বুমবাই যে তার দলবল নিয়ে ছুটছে বাবা দেখতেই পায় না। বুমবাইর ভারি মজা লাগে। এখানে এসে সবাই কেমন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। তার বাবা পিসিরা সবাই। পিসিরা কামরাঙা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। হাতে লম্বা কোটা। মগডাল থেকে একটা-দুটো পাকা কামরাঙা পাড়ছে, আর কে ওটা নেবে, ধরবে এই নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে।

'বড়দা, রাঙাজেঠু তোমাকে ডাকছে।'

বড়দা তখন বলবে, 'এই ছোটন, চল, বাবা ডাকছে।'

'আমাকে ডাকছে না। তোমাকে ডাকছে। তুমি যাও।'

বুমবাই তখন হেসে ফেলে। জেঠুকে দু-জনই দেখছি যমের মতো ভয় পায়।

সে বলল, 'ছোড়দা, তোমাকেও ডাকছে।'

'আমাকে ডাকবে কেন আমি কী করেছি!'

'বলল যে, দুটোকেই ডাক।'

বুমবাইর মনে হয় যেন জেঠু দু-জনেরই কান মলে দেবে। বলবে, 'আবার ঝগড়া শুরু করলে। তোমাদের নিয়ে দেখছি আমার অশান্তির শেষ নেই।'

বড়দা বলবে, 'যা বলগে, যাচ্ছি।'

'যাচ্ছি না! এক্ষুনি যেতে বলেছে।'

বড়দার কেমন কাঁচুমাচু মুখ।-'এই ছোটন, বাবা ডাকছে। চল।'

'তুমি যাও।'

'বারে, তোকেও যে ডাকছে!'

'আমাকে ডাকেনি!'

'এই বুমবাই, দু-জনকেই ডেকেছে না!'

'হ্যাঁ। বলল, দুটোকেই ডাক। তোমরা ঝগড়া শুরু করেছ শুনে ডাকছে।'

'কে বলল, আমরা ঝগড়া করছি!'

'বারে তোমরা ঝগড়া করছিলে না!'

'কখন ঝগড়া করলাম!'

'সে আমি জানি না। জেঠু তোমাদের ডেকে দিতে বলল।' বলেই বুমবাই এক দৌড়। কেউ তাকে শাসন করে না। সকাল বেলায় বাবা ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়েছিল। সে সোয়েটার গায়ে দেয়নি বলে বাবা তটস্থ।-'বুমবাই, ঠান্ডা লেগে যাবে-দেখছ রাঙাদা কাণ্ড। তোমার নাতিন পাতলা ফ্রক গায়ে দেয়, শীত করে না, বুমবাইরও নাকি শীত করে না। অরু শীতের দেশের মানুষ, তার ঠান্ডা লাগতে নাই পারে, তাই বলে তুইও!'

সে দূর থেকেও শুনতে পায়। রাঙাজেঠু বলছে, 'সেটা বুমবাই বুঝবে। তোর এত মাথাব্যথা কেন বুঝি না। ছেলেমানুষ, তোর আমার মতো শীত লাগবে কেন? বাইরে বের হয়ে একদণ্ড স্থির থাকছে না, শরীর

এমনিতেই গরম হয়ে যায়। ও নিয়ে তোমার মাথাব্যথার দরকার নেই। বউমা-দেবুকে চা দাও।' একটু থেমে রাঙাজেঠু বলেছিল, 'মুখ ধুয়েছিস!'

বাবা একেবারে তখন বুমবাই। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না! বারান্দার পরেই ক-টা সূর্যমুখী ফুলের গাছ। তাতে বড়ো বড়ো ফুল। বুমবাইরা তার নীচে এসে গেছে-শুনতে পাচ্ছিল, রাঙাজেঠুর গলায় ধমকের সুর। 'এত বেলা করে ঘুম থেকে উঠিস-শরীর ভালো থাকবে কী করে! বেশি ঘুমোলে জানিস তো রক্ত ঠান্ডা মেরে যায়। তোরা যে কী হলি! সূর্যোদয়ের আগে বিছানা ছাড়তে হয় জানিস না! না ছাড়লে পরমায়ু কমে। যা, হাতমুখ ধুয়ে নে। বউমা, চা দাও।'

এই সব মজা মা তার দেখতে পেল না। বাবা গোমড়া মুখে ঘরে চলে গেছে। বুমবাইকে শাসন করতে না পেরে খেপে আছে। আর জেঠু এমন ধমক লাগাল যে সত্যি যেন বাবা মহা অপরাধ করে ফেলেছে। হাত-মুখ ধুয়ে এসে গোমড়া মুখেই সামনের বেতের চেয়ারে বসে বলল, 'দাও বউমা চা দাও।'

বাবা বকলে সে যেমন গুম মেরে টেবিলে খেতে বসে, বাবাও তেমনি গুম মেরে আছে। আসলে বাবা বুঝতে পারে জেঠুর সামনে তাকে শাসন করার অধিকার বাবার নেই।

বাবা তার কেমন একেবারে খোকা হয়ে গেছে। বড়দা ছোড়দাও। কেউ আগে যেতে চাইছে না। এ ওকে ঠেলে দিচ্ছে।

বুমবাই গম্ভীর গলায় ফের বলল, 'তোমরা দাঁড়িয়ে থাকলে কেন! যাও।' আসলে এরা চলে না গেলে সে, অরু এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ছুটতে পারবে না। এমন একটা গাছপালা বনজঙ্গল নিয়ে এদিকের জায়গাটা যেন জেঠু তাদের জন্যই বানিয়ে রেখেছে। বাঁশঝাড়, তারপর শ্যাওড়া গাছের জঙ্গল, মণীন্দ্রকাঁটার জঙ্গল। এবং এই জঙ্গলে কত সব প্রজাপতি, শীতের অলস রোদে সব মাখামাখি। পরম এক উষ্ণতার ছবি। অরুর কত রকমের প্রশ্ন, 'বুমবাইকাকা, আমাকে ফড়িং ধরে দাও।' আধা ইংরেজি, আধা বাংলায় কথা বলছে। সবটা বলতে পারে না। অরু সবটা বলতে না পারলে নিজেই লজ্জায় পড়ে যায়। বুমবাইর কাছে জেনে নিতে চায় কী ভাবে সে বলবে।

বড়দা-ছোড়দা কেমন ভীতু বালকের মতো পুকুরের পাড় ধরে হাঁটছে। এদিকটায় দু-দুটো পুকুর। একটাতে সব বড়ো মাছ। আর একটাতে জিয়োল মাছ-এই যেমন কই শিঙি মাগুর। জেঠু বলেছে, 'দেখবি বিকেলে তোকে মাছ কী করে ধরতে হয় শিখিয়ে দেব।' তাকে জেঠু একটা ঘরে নিয়ে-কত রকমের বঁড়শি দেখিয়েছে। '-এই যে বঁড়শিটা দেখছিস, এটায় কই মাছ, এটায় শিঙি মাগুর।' চার-পাঁচটা হুইলের ছিপ। জেঠু নাকি বিকেলে মাঝে মাঝে বসে মাছ ধরে। মাছ ধরায় নাকি দারুণ উত্তেজনা।

বিকেলেই সে যখন জেঠুর সঙ্গে ছিপ নিয়ে যাচ্ছিল তখন বুঝতে পেরেছিল, সত্যি কী মারাত্মক ব্যাপার। মহাদেবদাদু বোলতার চাক ভেঙে এনে রেখেছে। বাড়িতেই সব। পিঁপড়ের ডিম। গাছের মগডালে উঠে মহাদেবদাদু চিৎকার করছিল, সরে যাও ভাই-বোনেরা। মহাদেবদাদুটা সবার নাম মনে রাখতে পারে না। পারবে কী করে-তারা সাত-আট জন সমবয়সি, একসঙ্গে স্নান, মহাদেবদাদু পুকুরে নিয়ে গিয়ে কী করে ডুব দিতে হয় শিখিয়েছে। ডুব দিতে না জানলে সাঁতার শেখা যায় না। অরুকে, তাকে, বাবলুকে সাঁতার শেখানোর দায়িত্ব মহাদেবদাদুর। দাদু বলেছে পাঁচ-সাত দিনেই সেটা হয়ে যাবে।

শীতের সময় বলে গাছের পাতা ঝরা শুরু হয়েছে। জোর হাওয়া দিলে গাছের পাতা উড়তে থাকে। সারা বাড়িটায় ঝরা পাতার খেলা। সকালে মনসাদাদার একটাই কাজ-গাছের নীচে সব পাতা ঝাঁটা দিয়ে ডাঁই করা। যত গাছ তত তার পাতা। একেবারে ঝরা পাতার পাহাড়। গোয়ালবাড়িটা পেছনে। শান-বাঁধানো লম্বা চত্বর। মাথায় টালির ছাউনি। মাঝখানে শান-বাঁধানো গোরুর জাবনা দেবার আট-দশটা গামলা। মনসাদাদার ওই একটাই কাজ। সকালে গাছের নীচে, বিকেলে গোরুর ঘরে। সন্ধ্যায়, গোবর ডাঁই করা। বিশাল একটা গর্ত, প্রথমে সব ঝরা পাতা ঝুড়িতে করে এনে বিছিয়ে দেয়। যেখানে যত গাছ আছে, তার নীচ থেকে ঝরা পাতা তুলে আনে-জেঠু কিছুই বলে না। যেন যে যার মতো নিজের কাজ করে যাচ্ছে। বুমবাই কোনটার মজা আগে

লুটবে ভেবে পায় না। সব কিছুই তার কাছে বিস্ময়। বড়ো একটা ঢোলের মতো মাদুলি গলায় মনসাদাদার। কেন এটা, সে একবার প্রশ্ন করেছিল-মনসাদাদা বলেছিল, 'তা তেনারা হাঁটাহাঁটি করেন রাত হলে। গলায় পরে আছি। সাহস হয় না তেনাদের কাছে আসতে।'

'তেনারা কারা!'

'তেনারা!' নিজের বুকে থুথু ছিটিয়ে দেয় মনসাদাদা।

'বলো না, তেনারা কারা! তুমি কী মনসাদাদা, কেবল তেনারা তেনারা করছ!'

'ওই হল গে মানে, বোঝলেন না, বাড়িটায় আমরা একা থাকি! ব্যাটা মহাদেবটা ভূত পোষে!'

'একা কোথায়! মহাদেবদাদু ভূত পুষবে কেন?'

'ও রাঙাকর্তার কথা কন। তেনার এসবে বিশ্বাস কম। মহাদেব যে ভূতের ওঝা বিশ্বাসই করে না।'

'ওঝা, ভূত, কী যে বলছ না!'

'ভূতপ্রেতে খাবে ব্যাটাকে। ব্যাটা মরবে।'

'কী বলছ! বাড়িটাতে ভূতপ্রেত থাকে?'

'বারে, মানুষ থাকবে, তেনারা থাকবেন না। যাবেন কোথায়! পুকুরপাড়ের বড়ো শাল গাছটা আছে না, ওখানে তেনারা দল বেঁধে থাকেন!'

তা পুকুরের পাড়ে শাল, শিমুল, পলাশ এমন সব কত না গাছ। শীতের সময় পুকুরটায় একফোঁটা রোদ ঢোকে না। জল যেন বরফ হয়ে থাকে।

বড়ো পুকুরের পাড়ে কোনো গাছ নেই। সারাদিন পুকুরের জল রোদ পায়। শান-বাঁধানো ঘাট। এই ঘাটে জেঠু শানের উপর রোদে বসে তেল মাখেন। জিয়োল মাছের পুকুরটার কথাই তবে মনসাদাদা বলছে। তার পাড়ের গাছপালাতেই ভূতেরা থাকে। তা ঠিক, সে ভেবে পায় না, একটা পুকুরের পাড়ে কোনো গাছ নেই, না নেই বললে ভুল হবে, আছে, সারি সারি নারকেল গাছ। অন্য কোনো গাছ নেই। আর ছোট্ট পুকুরটার পাড়ে এত গাছ কেন! ভূত পুষতেই পারে মহাদেবদাদু।

সে জেঠুকে বলেছিল, 'ও জেঠু, এত গাছ কেন?'

জেঠু বলেছিল, 'জিয়োল মাছ ঠান্ডায় বাড়ে। দেখছিস মাছ কেমন গাবাচ্ছে!'

তা দেখার মতো বটে! সারা পুকুরের জলে হঠাৎ ঝড় বয়ে যায় যেন, এক কোনায় কোথাও একটা মাছ গাবান দিল তো খই ফোটার মতো সারা পুকুরটা নড়ে-চড়ে বসল। জেঠুর এককথা, 'বুঝলি কিছু!'

'কী বুঝব!'

অরু জেঠুর কোঁচা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। অরু বোধ হয় এসবের কোনো মর্মই বুঝতে পারে না। অরু যে দেশটায় থাকে, সেখানে ডিজনিল্যান্ডের কত সব বিচিত্র খবর আছে মানুষের-কিন্তু অরুর মুখ-চোখ দেখে মনে হয় এমন আজব দেশের খবর সে কোনোদিন পায়নি। দু-দিন ধরেই লক্ষ করছে, অরু এত সব দেখতে দেখতে কেমন বোকা বনে গেছে। সব আত্মীয়স্বজন, তাঁদের পোশাক-আশাক, তার দাদুর আচরণ সবই কেমন অদ্ভুত। তার বাবা পর্যন্ত এখানটায় এসে সব কথায় বলছে, 'ডাকব তোমার দাদুকে!' আর অরু মাঝে মাঝে সাড়া না দিলে, বড়দার হাঁক, 'বাবা দেখো অরু সাড়া দিচ্ছে না! কোথায় গেল!'

তখনই রাঙাজেঠুর গলা পাওয়া যাবে-'কোথায় যাবে, কোথাও আছে। এই দিদিভাই, তুই কোথায় রে!' দিদিভাই ডাকলে অরু যেখানেই থাক, সাড়া না দিয়ে পারে না।-'যাই দাদু।'

জেঠুর তখন এককথা, 'কী হল, ওই তো সাড়া দিচ্ছে।' আর দৌড়ে এসে জেঠুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লে দু-হাতে জেঠু বুকে তাকে জড়িয়ে ধরেন। আর আদরে আদরে পাগল করে তোলেন। তখন তার যে কী হিংসে হয় না! মাঝে মাঝে বুমবাই দেখতে পায় রাঙাজেঠুর চোখ দুটো জলে চিকচিক করছে। জেঠুর জন্য ওর তখন ভারি কষ্ট হয়।

আর অরু যেই আদর খেয়ে বুমবাইর কাছে ছুটে আসবে তখনই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে।

'এই তোর সঙ্গে আড়ি।'

'আড়ি! হোয়াট আড়ি!'

'আড়ি মিনস নো টক। নো কথাবার্তা।'

অরু হেসে গড়িয়ে পড়ে।-'বুমবাইকাকু বোবা।'

'আমি বোবা!'

'বোবা।'

'আবার আমাকে বোবা বলছিস!'

'কথা বলতে না পারলে বোবা হয় না!'

'কথা বলতে পারি না কে বলল?'

'এই যে বললে কথা বলবে না।'

আর তখন বুমবাইর রাগ কেমন জল হয়ে যায়। অরু আড়ি কী বোঝেই না! আড়ি না বুঝলে, তার সঙ্গে আড়িও করা যায় না। সে পড়ে যায় মহাফাঁপরে। অরুকে নিয়ে ঘুরতে না পারলে, ছুটতে না পারলে কেমন এক জীবনের মহারহস্যের খবর থেকে বঞ্চিত। সেই পারে না অরুর সঙ্গে আড়ি করতে। এমন একটা সরল সুন্দর হাসিখুশি মেয়ের সঙ্গে আর যাই করা যাক আড়ি করা যায় না।

এখন তারা যাচ্ছে মাছ ধরতে।

বুমবারই হাতে একটা ছোটো ছিপ, অরুর হাতে ছিপ। জেঠু সবার হাতে ছোটো ছোটো ছিপ দিয়েছেন। সঙ্গে মহাদেবদাদু। সকালে উঠেই সে দেখতে পায় মহাদেব দাদু কোত্থেকে বিশাল একটা তাজা রুই মাছ এনে রান্নাবাড়ির বারান্দায় ফেলে রেখেছে। মাছটা লাফাচ্ছিল। মেমবউদি অরু মাছ খেতে জানে না। কাঁটা মাছ খায় না। ওদের জন্য ক-টা পাবদা মাছ। তাও তাজা ঝকঝকে রুপোর পাতের মতো। জেঠু গজগজ করেছে, মাছের কাঁটা বেছে খাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে, তার নাতিনটা সে সুখ টেরই পেল না। জেঠুর এককথা, বড়োটা অমানুষ, ছোটোটা গোঁয়ার। মেয়েটাকে কাঁটা বেছে মাছ পর্যন্ত খাওয়াতে শেখায়নি! কী যে হবে! মহাদেবকে বলেছে, 'মাছ ভেজে রাখবি। কী করে কাঁটা বেছে খেতে হয় শিখিয়ে দেব।' আর অরুকে নিয়ে বুমবাই এবং সবাইকে নিয়ে তিনি যখন খেতে বসেন, অরু ঠিক জেঠুর পাশটায় বসে। অরু চামচ দিয়ে খেতে চায়-জেঠু বলবে, 'না হাত দিয়ে খাও। দেখো নিজের হাতে খাওয়ার মধ্যে কত আনন্দ।-এই দেখো, মাছের কাঁটা কী করে বাছতে হয়। দেখলে তো, এবারে খাও। ভাত সব পড়ে যাচ্ছে কেন! তোর মা-বাবা ভাতখাওয়াটাও পর্যন্ত শেখায়নি! কী যে হবে!' যেন জেঠুর জীবনে অরু ভাত মেখে খেতে পারে না বলে মহা বিপর্যয় নেমে এসেছে। বুমবাইর দিকে তাকিয়ে বলবে, 'দেখ তো বুমবাই, বাবলু, অপুরা কেমন ভাত মেখে খাচ্ছে।'

অরু তখন নিজেই জেঠুর হাত সরিয়ে বলবে, 'আমি পারব। তুমি দেখো না।' অরুও চায় না, সবাই দেখুক ভাত মেখে খাবার ব্যাপারে সে খুব আনাড়ি, কারণ অরু জানে, পরে তাকে সবাই খেপাবে। অরু সবার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কেমন নিজেই ডাল দিয়ে ভাত মাখে। শুকতোনি দিয়ে ভাত মাখে। অরুটা একদম ঝাল খেতে পারে না।

মহাদেবদাদু অরু আর মেমবউদির জন্য শুধু আদাবাটা আর জিরা দিয়ে ঝোল করে দেয়। তারপর টক, তারপর ঘরে পাতা দই। জেঠু নিজে বিশেষ কিছু খায় না। দুপুরে, রাতে জেঠু ছোটোদের সবাইকে নিয়ে খেতে বসেন। জেঠুর তেল ঝাল সব বারণ। তার জন্যও একপ্রস্থ আলাদা রান্না। বুমবাইর কেমন তখন আর খেতে ইচ্ছে করে না। জেঠু কিছুই খায় না! অথচ জেঠু তাদের বাড়ি গিয়েছিল, একটা বড়ো এনামেলের হাঁড়িতে কই মাছ নিয়ে।

কই মাছ কাটা নিয়ে মার কী সে বিড়ম্বনা! তার এখনও দৃশ্যটা ভাবলে হাসি পায়। মাছগুলো হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দিতেই টুপটাপ ফুল ফোটার মতো ফুটছিল, ঝরছিল। সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা তুলতে

গেলেই আঁচড়।
এদিকে জেঠু তাদের বসার ঘরে বসে পত্রিকা ওলটাচ্ছিলেন। বাবা অফিসে। হঠাৎ দেখেন একটা কই মাছ তাঁর পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিচ্ছে। ওদিকে যে রান্নঘরে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে জেঠু টের পাবেন কী করে!
কাজের মেয়েটা মার হাতে রাশি রাশি ডেটল ঢালছে। মার বিরুদ্ধে জেঠুর এমনিতেই অভিযোগের অন্ত নেই-'এ কী বউমা, সকালে উঠেই ছেলেটাকে ডিম সেদ্ধ পাউরুটি দিচ্ছ। ওতে শরীর টেঁকে! এ কী বউমা, কী চেহারা হয়েছে বুমবাইর! খেতে চায় না বললেই হল। রোজ এক খাওয়া কার ভালো লাগে।' কই মাছ নিয়ে না আবার কত রকমের অভিযোগ উঠবে-'তোমার বাবা-মা কই মাছ খায়নি কখনো?'
মা মুখ বুজে জ্বালা সহ্য করছে, মুখ ফুটে একদম ঃউ ঃআ করছে না। জেঠু ভিতরে ঢুকে হতবাক। সারা ঘরে কই মাছগুলি হেঁটে বেড়াচ্ছে। যেন তাদেরই ফ্ল্যাট। বুমবাইরা বাড়তি মানুষ।
জেঠু আর কী করেন। ত্রাতার ভূমিকায় নেমে পড়লেন।
একটা করে কই মাছ ধরেন, আর বলেন, 'এই দেখো, এভাবে। মাথার দিক থেকে হাত দেবে। কানকো চেপে ধরো জোরে। ব্যস, সব জারিজুরি শেষ।'
জেঠু কাজের মেয়ে ফুলদিকে ডেকে বলেছিলেন, 'দেখি বঁটি!'
বঁটি পাবে কোথায়! ফ্ল্যাটে সব ছুরি কাঁচিতে কাজ। তরকারি কাটা, পেঁয়াজ কাটা সব খচ খচ করে মা রান্নাঘরের বেসিনের পাশে টাইলসের উপর রেখে কাটে। কাটা পোনা ছাড়া খাওয়া হয় না। একটা বঁটি যে ছিল না, তা নয়। তবে তার কোনো কাজ নেই। বঁটিটা রান্নঘরের একপাশে গোমড়ামুখে পড়ে থাকে।
বঁটিতে ধার নেই।
বালিতে ঘষে ধার তুললেন জেঠু।
কই মাছ কী করে কাটতে হয় শিখিয়ে দিলেন জেঠু। তারপর দুটো কলাপাতার মধ্যে মাছগুলি সরষে বাটা, নুন, কাঁচালঙ্কা, আদা বাটায় মেখে সাজিয়ে আবার কলাপাতায় ঢেকে গরম ভাত খানিকটা ঢেলে মাছগুলি চাপা দিলেন। ভাতে সেদ্ধ কই খাওয়ালেন সবাইকে।
আঃ, সে কী স্বাদ!
বাবা অফিস থেকে এসে দেখলেন মা হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছে।
বাবা মাকে সেদিন মাছ বেছে খাইয়েও দিয়েছিলেন। জেঠু আবার দেখে না ফেলে সে জন্য শোবার ঘরে বাবা থালায় ভাত বেড়ে মাছের বাটি নিয়ে পালিয়ে যখন খাওয়াচ্ছিলেন, তখন ঝুপির কী হাসি! তারও হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু জেঠুর কাছে বসে থাকার নির্দেশ ছিল। জেঠুর কাছে ছবি আঁকতে বসলে, তিনি ছেলেমানুষের মতো উবু হয়ে বসে তার ছবি আঁকা দেখেন। ছবি আঁকা, জেঠুকে পাহারা দেওয়া দুই কাজ একসঙ্গে।
বাবা বলেছিলেন, 'তুমিই পার জেঠুকে আটকে রাখতে। যাও, জেঠুর ঘরে। ছবি আঁকতে বসে যাও। নাহলে এদিকে এসে পড়তে পারেন।'
জেঠুকে আটকে রাখার মোক্ষম অস্ত্র ছবি আঁকা। সে যতক্ষণ ছবি আঁকবে, জেঠু এক-পা নড়বে না।
'হল না। লেজটা ঠিক হয়নি। দেখ।'
দু-টানে পাখির লেজ, গাছ, ফুল, ফল, নদী সব এঁকে বলবেন, 'কী দেখলি, কেমন হল!'
সে সত্যি অবাক হয়ে যায়।
সেই জেঠু ওদের নিয়ে বিকেলে আজ মাছ ধরতে যাচ্ছে। বড়ো বড়ো আম গাছের ছায়া পার হয়ে বাঁশ বাগানের একপাশে পুকুর। কত সব গাছ, আর পাখির কিচিরমিচির শব্দ। জেঠু বলে যাচ্ছে-
'এরা হল সাত ভাই চম্পা পাখি। ওই যে দেখছিস ঝুপ করে পুকুরের জলে ডুবে গেল পাখিটা, ওটা মাছরাঙা পাখি।'
অরু বলল, 'কী সোন্দর।'

জেঠু বলল, 'বুমবাই, কী শেখালি? সোন্দর বলছে।'

'ওর হবে না জেঠু। হাসাহাসিকে হাসাহিসি বলে!'

'হবে। আমার কাছে থাকলে হবে। সব হবে। মাছ ধরায় আনন্দ কী দেখ।' বলেই জেঠু তার জায়গায় গেলে মহাদেবদাদু একটা মোড়া পেতে দিল। একটা বালতি ঢাকনা দেওয়া। কলাপাতায় পিঁপড়ের ডিম। জেঠু বলল, 'দিদিভাই, আমার পাশে এসে বোস।'

মহাদেব দাদু অরুর বঁড়শিতে পিঁপড়ের ডিম গেঁথে দিচ্ছে।

বুমবাই বলল, 'আমারটা।'

'সবাইকে দিচ্ছি।'

জেঠু ছিপ ফেলতে না ফেলতে ফাতনা কাত করে নিয়ে গেল। আর টেনে তুলতেই লাল বুকওয়ালা বিশাল কই মাছ একটা।

জেঠু বলছে, 'বুমবাই, টান টান। দেখ ফাতনা টানছে।'

সেও টানতে গিয়ে আর তুলতে পারছে না।

অরুটা বঁড়শি ফেলে তখন লাফাচ্ছে।

'ও জেঠু! উঠছে না।'

ছিপের ডগা বেঁকে গেছে। জলের নীচে ঘূর্ণি উঠছে। বুমবাইর কেমন ভয় ধরে যাচ্ছে। জেঠু বলে যাচ্ছে, 'টান টান। আহা পড়ে যাচ্ছিস কেন!'

অরু এসে বুমবাইর ছিপ ধরে ফেলল। আসলে বুমবাই টের পায় যেন এই কালো জলের গভীরে কোনো অপদেবতা বাস করে। তাই বঁড়শিটা টেনে রাখতে পারছে না। সে জোর হারিয়ে ফেলেছিল। কী সাংঘাতিক জোর। জেঠু উঠে এসে ছিপটা ধরে ফেলল। বলল, 'দেখ। দেখলি! এটা ফলি মাছ। কত বড়ো দেখেছিস!'

বুমবাই বলল, 'কী জোর জেঠু!'

'হবে না। প্রাণের দায়। জোরে ছুটছে, তুই টানছিস। মাছটা জলে লেজ বাঁকিয়ে রাখছে। ভারী লাগছে। ভাগ্যিস পড়ে যাসনি।'

মাছটা লাফাচ্ছিল।

বুমবাই দেখল, জেঠু আর মাছটার দিকে তাকাচ্ছে না। নিজের ফাতনার দিকে তাকিয়ে বলছে, 'জানিস, ফাতনা নড়লেই টের পাই, কী মাছ ভিড়েছে।' বুমবাইর অত সব শোনার সময় নেই। সে এত বড়ো একটা মাছ জলের নীচ থেকে তুলে এনেছে- আহা মা থাকলে বুঝতে পারত, ঝুপিটা এলে কী না লাফাতে পারত এখন-যেমন অরু লাফাচ্ছে। কখনো বসছে। মাছটা হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে। আর মাছটা লাফ দিলেই ছুটতে গিয়ে উলটে পড়ে যাচ্ছে অরু। জেঠুর বাড়িতে এত মজা! ঝুপি এলে কী না মজা হত!

জেঠু নির্বিকার। বুমবাইর দিকে না তাকিয়েই বলছে, 'মাথাট চেপে ধর। দেখবি নড়তে পারবে না।'

অরু কাছে এলে এক ধমক লাগাল বুমবাই।-'সর। সুন্দর বলতে পারে না! হিসি বলে! তুই বঁড়শি থেকে মাছ খুলবি! তাহলেই হয়েছে!'

অরু সব কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না। ফ্রক কোমরে তুলে উবু হয়ে বসে মাছটার লাফঝাঁপ দেখছে। একটু ঠান্ডা হলেই হাত দিতে যাচ্ছে। বিশাল একটা কাজের দায় এখন বুমবাইর কাঁধে। মাছটাকে বঁড়শি ছাড়িয়ে বালতিতে রাখতে হবে। অরু বাবলু অপুরা কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। মাছটার চারপাশে ঘিরে বসেছে। যেন পালাতে না পারে।

জেঠু বলে যাচ্ছে, 'শিং মাছগুলো তো দেখছি বড়ো জ্বালাচ্ছে। গিলবেও না, চারপাশে কেবল ঘোরাঘুরি করছে।'

কী বলে! বুমবাই মাছটা ফেলে এসে বলল, 'কোথায় শিং মাছ দেখি!'

'দেখবি কী করে! জলের নীচে দেখা যায়?'

'তুমি টের পাও কী করে!'

'ফাতনা কীভাবে নড়ছে দেখছিস?'

তা সে দেখছে। একটু তলিয়ে নিয়ে গিয়েই ছেড়ে দিচ্ছে। জেঠু বার বার হেঁচকা মেরেও মাছ আটকাতে পারছে না।

বুমবাই বলল, 'ভারি পাজি তো।'

জেঠু বলল, 'দুষ্টুমি করছে। চুউপ। কথা বলিস না। মাগুর মাছ। খাবে।'

বুমবাই অবাক হয়ে যায়। ফাতনাটা দু-বার ভাসল ডুবল, তারপর তলিয়ে গেল। জেঠু টেনে তুলছে-বুমবাই চিৎকার করছে, 'ওরে বাবা, অ অরু, দেখ এসে, জেঠু টেনে তুলতে পারছে না।' বিশাল একটা মাগুর মাছ ছিপটায় আটকে গেছে। পাড়ে এনে ফেললে, কট কট করতে থাকল।

সে লাফিয়ে ধরতে গেলে বলল, 'পারবি না। কাঁটা মারবে।' আর সে দেখল, কী অনায়াসে জেঠু মাছটার মাথা চেপে বঁড়শিটা বের করে আনল। তারপর মাথাটা মুঠো করে ধরে বালতিতে রেখে ঢাকনা দিয়ে দিল! মাছটা ভেতরে জোর লাফাচ্ছে। মনে হচ্ছিল বালতি উলটে দেবে। বুমবাই ঢাকনাটার উপর বসে থেকে বলল, 'জেঠু আর ফেলতে পারবে না!'

'ফলি মাছটা খুলতে পারলি?'

'পারছি না।'

মহাদেবদাদু এগিয়ে যাচ্ছিল-জেঠুর এককথা-'না, না, বুমবাই, মাছ ধরতে শিখতে হয়, খুলতে শিখতে হয়, রাখতে শিখতে হয়। এসব জীবনে দরকার। না জানলে, জীবনে একা হয়ে যেতে হয়। দেখছিস না, আমাকে-বাড়িটা ছেড়ে কোথাও গিয়ে পাঁচ-দশ দিনের বেশি থাকতে পারি না!'

আর একসময় বুমবাই দেখল, চুপিচুপি বড়দা-ছোড়দাও ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসে গেছে। এ কীরে বাবা, সব ছেলেমানুষ হয়ে গেলে! পিসিরা, বউদিরা সবাই মজা দেখতে পুকুরপাড়ে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হচ্ছে। বড়দা-ছোড়দা মাছ ধরায় এত পটু সে কখনো জানত না।

জেঠুর এককথা, 'মহাদেবটা মহা শয়তান। বয়স হলে মানুষের অসুখ-বিসুখ বাড়বে। সামান্য মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলাম-ব্যাটা হইচই বাধিয়ে লঙ্কাকাণ্ড করে ছেড়েছে।'

বুমবাইর মনে হল, মহাদেবদাদু এই লঙ্কাকাণ্ড না করলে জেঠুর বাড়ি তার আসাই হত না। এত বড়ো বাড়ি, সামনের মাঠটায় শ্যালো বসিয়ে জেঠু বিঘের পর বিঘে ধান চাষ করছে। এক-এক খণ্ড জমি না, যেন সবুজের সমারোহ।

বেগুন খেতে ঢুকে গেলে তার কেমন আর বের হতে ইচ্ছে হয় না। কত রকমের বেগুন হয় সে জেঠুর বাড়ি না এলে টেরই পেত না। গাছে নীল ফুল, কোনোটা ছোটো, বড়ো, লম্বা, গোল গোল কত রকমের। ঝুড়ি নিয়ে মনসাদাদা বেছে বেছে সব তুলছে। আলুর জমি ধরে দৌড়োলে ছইয়ের ভিতর থেকে হাঁক শুনতে পায়, 'কারা যায়!' সেই লোকটা! যে ওই ছোট্ট ঘরটায় সারাদিন বসে থাকে। রাতেও। শীতের সকালে সে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসে। রোদ পোহায়। কখনো আলে আলে হাঁটে-পোকামাকড় খোঁজে। ওই কাজই তার। আর জল দেবার সময় মেশিন চালিয়ে বসে থাকে। ভক ভক করে জল ওগলায় মেশিনটা।

বুমবাই কেমন তাজ্জব হয়ে যায়-দূরে বাদশাহি সড়ক, সেখানে উঠে গেলেই বাস, ট্রাক, রিকশা সব শহরমুখী-সেখানে ঠিক সে যেখানে থাকে, তাদের মতো সিনেমা হল, অফিস, কাছারি, কারখানা, ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন সব হরেক রকমের মজা! এখানে এলে সিনেমা থিয়েটার ক্রিকেট সব ভুলে যেতে হয়। এবাড়ির মানুষগুলোর মুখে থিয়েটার বাইস্কোপ ক্রিকেটের কোনো কথা নেই। জেঠুকে সে বলেছিল, 'তুমি রবি শাস্ত্রীর নাম জান জেঠু?'

'সে কে?' মুচকি হেসে প্রশ্ন করেছিল তাকে।

'এ রাম, জেঠু রবি শাস্ত্রীর নাম জানে না!'

জেঠুর এতে কোনো ভাবান্তর দেখা যায় না। জেঠুর এককথা, 'লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ছেলে বুঝি!'

'ধুস, তুমি না জেঠু!'

'আমি কী!'

'তুমি কিচ্ছু জান না!'

জেঠু বলেছিল, 'জেনে কী হয়? তোর রবি শাস্ত্রী জানে, এমন নিরিবিলি জায়গায় তোর জেঠু নিজের মতো বেঁচে আছে!'

'ওর কী দরকার জানার!'

'আমার কী দরকার!'

'বা-কত বড়ো ক্রিকেটার!'

'এই অরুণিমা, তুই জানিস রবি শাস্ত্রীর নাম!'

অরু কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

জেঠুর মুখে হাসি, 'অরু যখন জানে না, আমার জেনে লাভ নেই।'

অরুণিমা নাই জানতে পারে। মার্কিন মুল্লুকে থাকলে লোক বোকা হয়। দেশের খবর রাখে না। কত কিছু হচ্ছে, অরু জানেই না। বড়দাকেও দেখেছে, অনেক খবর রাখে না দেশের। কেমন সে এখন ভারি বিজ্ঞ ভাবে। কিন্তু জেঠু তার এত জানে, আর এই খবরটা রাখে না!

বুমবাই মনে মনে রেগে কাঁই। তার এত বড়ো প্রিয় ক্রিকেটারের নাম জানে না জেঠু! এ কীরে বাবা!

সে বলেছিল, 'জান, এবারে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ান ডে ক্রিকেটে, চ্যাম্পিয়ন অফ দি চ্যাম্পিয়নস হয়েছে। কত দামি গাড়ি উপহার পেয়েছে।'

জেঠু বলেছিল, 'তাই নাকি! আমি তো কোনো খবর রাখি না বুমবাই!'

'তুমি খবরের কাগজ পড় না?'

'না।'

'তবে কী পড়। এত বই বাড়িতে! তুমি কী পড়?'

'কোন গাছে কী সার দিলে কত বড়ো লেবু হতে পারে বইগুলি পড়ে জানি।'

বুমবাই হতবাক হয়ে যায়। সে তো ক্রিকেটের সময় সারাদিন টিভি-র সামনে থেকে নড়তেই চায় না। সে তো বিকেল হলেই ক্রিকেট খেলতে যায় পার্কে। তার ব্যাট আছে। তার টিম আছে। তার স্বপ্ন সে বড়ো হয়ে রবি শাস্ত্রী হবে। কিন্তু জেঠু তার নামই জানে না। জেঠুকে অবাক করে দেবার মধ্যে তার একটা আনন্দ আছে। জেঠু ছবি আঁকা পছন্দ করে। জেঠুর জন্য সে সারা বছর ছবি এঁকে খাতা ভরে রাখে। এই নিয়ে মার সঙ্গে বাবার মন কষাকষি। মা বলে, 'তোমার দাদাটি বুমবাইর মাথা খাচ্ছে। কিছু বললেই বলবে, জেঠুর জন্য ছবি আঁকছি। ডিসটার্ব করবে না। বোঝো!'

আসলে সে জীবনে এমন কিছু হতে চায়, জেঠু শুনে বলবে, 'হ্যাঁ, বুমবাই আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে।'

অবশ্য সম্প্রতি সে রবি শাস্ত্রী হবে ভেবে ফেলেছে। তার নিজেরও মতি স্থির থাকে না। মৃদুলকাকা এলে যখন মুখে মুখে ছড়া বানায়, তখন মনে হয় সে বড়ো হয়ে মৃদুলকাকার মতো মুখে মুখে ছড়া বানাবে। আবার যখন টিভি-তে একটি ছোট্ট সুন্দর মেয়ে রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে তখন মনে করে সেও করবে। কখনো নায়ক, কখনো খেলোয়াড়, কখনো শিল্পী হতে চায়। আসলে জানেই না সে কী হতে চায়!

সে বলেছিল, 'জেঠু, তুমি না কিচ্ছু জান না।'

জেঠু হেসে বলেছিল, 'আমি যা জানি, তোর রবি শাস্ত্রী তা জানে?'

তাও তো ঠিক। জেঠুর মাছ ধরা থেকে বুঝেছে, জেঠু কত পটু, জেঠুর খেত বাড়ি বাগান দেখে বুঝেছে, জেঠুর চাষ-আবাদে কত আগ্রহ। জেঠুর বড়ো বড়ো জার্সি গোরুগুলি দেখে বুঝেছে, একটা গোরু একাই কত

দুধ জোগাতে পারে। এখানটায় সে কেমন হেরে যায়। জেঠু কি ইচ্ছে করে এই স্বেচ্ছা নির্বাসন বেছে নিয়েছে! অথচ সে ভেবে পায় না, জেঠু কেন তার কলকাতার এত বড়ো বাড়ি ফেলে এমন একটা অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে। প্রতিবেশীরা সবাই নাকি মেমবউদিকে দেখার জন্য ভিড় করেছিল, 'আমাদের নুটুর বউ। দেখি মুখখানা। নুটুর মেয়ে! এ তো ছোট্ট সরস্বতী ঠাকুরুন!

তা ছোট্ট সরস্বতী ঠাকুরুনই বটে।

অরুর মহা উল্লাস। সে একবারও যেখানে থাকে তার কোনো খবর বুমবাইকে দেয়নি! দেবে কী, সেই আকাশ সমান উঁচু বাড়ির বিশাল ফ্ল্যাটের খবর কে জানতে চায়। অনেক উপর থেকে নীচের মানুষগুলিকে ডল পুতুলের মতো লাগে দেখতে। গাড়ি করে সকালে স্কুলে, চারটায় ফিরে আবার সেই খাঁচা। শনি-রবিবারে বাবা-মা সে কোথাও দূরের বনাঞ্চলে চলে যায়। কিংবা কোনো সমুদ্রের ধারে। বাবা-মার সঙ্গে জাঙ্গিয়া পরে সমুদ্রে স্নান-তারপর সি-বিচে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা। বড়ো একঘেয়ে জীবন। এখানে কোনো নিয়ম নেই। যে যার মতো ঘুরছে ফিরছে, খাচ্ছে-অরু ফিসফিস করে বলেছে, 'ড্যাডি না চুরি করে কামরাঙা খাচ্ছিল।'

বুমবাই অবাক!

'চুরি করে!'

'হ্যাঁ। নুন দিয়ে গাছতলায় বসে বাবা আর কাকা খাচ্ছিল। আমি যেতেই মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল।'

'উঠে দাঁড়াল কেন?'

'বারে, আমি খেতে চাই যদি।'

'খেলে কী হবে!'

'বাবা যে বারণ করেছে। টক। খেলে অসুখ করবে।'

বুমবাই তক্ষুণি অরুর হাত ধরে টানতে টানতে জেঠুর ঘরের দিকে নিয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জান জেঠু, বড়দা-ছোড়দা কামরাঙা খাচ্ছিল।'

'ইস, মহা জ্বালা হল দেখছি। এত করে বলি, এসব সহ্য হবে না, তবু খাচ্ছে! স্বভাব পালটে গেছে। ডাক দেখি দুটোকে। খেলে জ্বর-ফর না হয়।'

বুমবাই আর অরু লাফিয়ে হাজির।

'তোমাদের ডাকছে!'

'কে?'

'জেঠু।'

'কেন? আমরা কী করেছি?'

'কী করেছ জানি না! ডাকছে। 'বলেই অরুর হাত ধরে বেলগাছের নীচ দিয়ে ছুট লাগাল।

কিন্তু যাবে কোথায়!

জানালায় বসে জেঠু ডাকছেন, 'বুমবাই, অরু, শোন।'

সাঁঝ লেগে গেছে। সারা বাড়িটায় আলো জ্বলতেই কেমন একটা পরিদের দেশ হয়ে গেল। যেখানে যেটুকু অন্ধকার, সব সরে গেল। বিশাল সব আম-জামের গাছের ভিতর জেঠুর বাড়িটা সত্যি মিকি-মাউসের মতো দেখাচ্ছে।

বুমবাই ঘরে ঢুকে বলল, 'বড়দা-ছোড়দা আসছে।'

'তোরা বোস। সবাইকে ডাক।'

বুমবাই বলল, 'আমরা ধানের জমিতে যাব জেঠু।'

'সেখানে কেন?'

'বুড়ো লোকটা বলেছিল যেতে।'

'বুড়ো লোকটা মানে?'

'ওই যে ছোট্ট ঘরটায় থাকে!'

'অ, হরমোহন। ওকে বুড়ো লোকটা বলছিস কেন? মোহনদাদু ডাকবি। বুড়ো লোক বলতে হয়? বুড়ো আবার কে হতে চায়। মনে কষ্ট পাবে না! ওখানে কী আছে?'

'বলল, জ্যোৎস্না রাতে সে আমাদের নিয়ে ধানের জমিতে ঘুরবে!'

'ঘুরবে কেন?'

'কারা নাকি সব নেমে আসে?'

'কারা!' বলেই হা হা করে হেসে উঠল জেঠু। 'ওই সব তাঁরা! তা তাঁরা, আমার বাবা-কাকা। কেউ তো বেঁচে নেই। মোহন বলেছে, তাঁরা নাকি রাতে এই ঘরবাড়িতে নেমে আসেন। তা আসতেই পারেন। সে না হয় কাল রাতে দেখা যাবে। আমিও নাহয় তোদের সঙ্গে থাকব।'

তখনই বড়দা-ছোড়দার গলা পাওয়া গেল, 'আমাদের ডেকেছেন!'

'হ্যাঁ ডেকেছি। বোস। এই বুমবাই, সবাইকে ডাক।'

সবাইকে বলতে বোঝে বুমবাই, তার সব সমবয়সিদের জেঠু ডাকতে বলছে।

সে এক লাফে বের হয়ে গেল। ডাকল সবাইকে। ভিতরে এসে বলল, 'আসছে।'

'তোর রবি শাস্ত্রীর বাবার নাম কী রে?'

সে গড়গড় করে বলে গেল। খেলার কাগজে সে রবি শাস্ত্রীর চোদ্দো পুরুষের খবর জেনেছে। বাবার নাম, দাদুর নাম সব।

সে রবি শাস্ত্রীর বাবার নাম বলল।

একে একে সবাই এসে ঘরের চারপাশের চেয়ারে বসে পড়ছে। দু-একজন পিসি, ছোটো বউদি পর্যন্ত।

'রবি শাস্ত্রীর দাদুর নাম?'

বুমবাই তাও বলে দিল। সে যে কত জানে জেঠুকে বলে অবাক করে দিতে চাইছে।

জেঠু বলল, 'ভালো ভালো! বুমবাই কত জানে।'

বুমবাই দেখল তার বাবাও হাজির। তার কৃতিত্বে বাবার মুখ উজ্জ্বল।

সহসা জেঠু কেন যে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, 'তোমার মাতামহের কী নাম বুমবাই!'

বুমবাই ধপাস করে জলে পড়ে গেল! মাতামহের নামটা সে জানে না। এমন বে-ইজ্জত হতে হবে সে বুঝতেই পারেনি!

জেঠু বলল, 'রবি শাস্ত্রীর চোদ্দো গোষ্ঠীর নাম মাথায় রেখেছিস, নিজের মাতামহের নামটা আলগা হয়ে গেল!'

বুমবাই এটা কত বড়ো অপরাধ, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল। বাবা কেমন যেন খুবই বড়ো সংকটে পড়ে গেছে।

'তুই তোর পিতামহের নাম বল দেখি।'

বুমবাই সেটা অবশ্য জানে। তার কারণ, সে বড়ো হবার মুখে ঠাকুমা তাকে দাদুর কত সব সরস গল্প করেছে। ঠাকুরমার বারো বছর বয়সে বিয়ে। ঠাকুরদার বয়স তখন চল্লিশের উপর। দোজ বর। কুলীন বামুন। বুমবাই পিতামহের নাম বলে কিছুটা হালকা বোধ করল।

'নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নয়, বলবি স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মৃত ব্যক্তির আগে স্বর্গীয় কথাটা ব্যবহার করতে হয়।'

অরু জেঠুর পাশে বসে আছে। জড়িয়ে। বুমবাইর খুব হিংসে হচ্ছিল। জেঠু অরুকে কোনো প্রশ্ন করছে না।

এবারে সে দেখল, 'জেঠু অরুর দিকে তাকাচ্ছে।'

অরুকে বলল, 'তুমি তোমার পিতামহের নাম জান?' জেঠুই যে তার পিতামহ!

অরু ঠিক বুঝতে না পারায় জেঠু চমৎকার ইংরেজিতে বলল, 'আই মিন ইয়োর গ্র্যান্ডফাদার।'

অরু হাসতে থাকল। আসলে অরু এসবের কোনো গুরুত্বই বোঝে না!

জেঠু এবার বড়দার দিকে তাকাল। বলল, 'অরু দেখছি তার উৎসের খবর রাখে না নুটু।'

'না না রাখে। মানে!'

'মানে আবার কী! তোমার মেয়ে মার্কিন মুল্লুকের এত খবর রাখে আর আমার ভালো নামটা সে জানে না। আমার একমাত্র বংশধর।'

'না জানে। এই অরু, বল! হাসছিস কেন?'

'দাদু নিজের নাম জানতে চায়!'

আসলে অরু ভাবতেই পারে না, দাদু বলতে পারে, তার নাম কী!

'বল!'

অরু দেখল বাবার মুখ কেমন পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে।

অরুর কেমন কান্না পাচ্ছিল, বাবার মুখ দেখে। দরজার ওপাশে মা দাঁড়িয়ে।

বুমবাই দেখল জেঠু একে একে সবাইকে প্রশ্ন করছে। কেউ কেউ পিতামহ পর্যন্ত বলতে পারছে-তারপরই আটকে যাচ্ছে। তার পিসি পিসেমশাইরা সব জাঁদরেল সরকারি অফিসার, অথবা পাবলিক সেক্টরের কেউ ডিরেক্টর, কেউ চিফ অথচ এরা কেউ পিতামহের নামের পর আর বেশিদূর কিছু জানে না। সারাক্ষণ অরুর সঙ্গে বাংলার চেয়ে ইংরাজিতেই কথা বলতে আগ্রহী। কেউ কেউ আবার বাংলাও ভালো বোঝে না। হিন্দি ছাড়া কথা বলতে পারে না। হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলে। বুমবাইর তখন ভারি হাসি পায়।

জেঠুর প্রশ্ন সবার কাছে এবার-'এদের যে দেখছি তোরা শেকড় আলগা করে দিচ্ছিস! জানিস এর পরিণতি কী ভয়াবহ। নিজের রুট কোথায় যদি না জানে তবে এরা কী হয়ে যাবে বুঝতে পারিস! আজকাল যে শুনি স্কুল থেকেই ছেলে-মেয়েরা ড্রাগ এডিকটেড হয়ে যাচ্ছে তার কারণ কী জানিস?'

সবাই চুপচাপ।

মহাদেবদাদু এসে হঠাৎ এক ধমক-'তোমার এত দায় কীসের। ডাক্তার কী বলে গেছে! কেবল সারাদিন প্যাচাল। সকাল থেকে দেখছি। এখন তো একটু শুয়ে থাকতে পার চুপচাপ।'

বড়দা ছোড়দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা যাও। কেউ থাকবে না এঘরে। থাকলেই বকবক করবে। বিকেলে এত করে বললাম, মাছ ধরার দরকার নেই-না তার লাতিন এয়েছেন! বুমবাই এয়েছেন। মাছ ধরার কী মজা না জানলে বুঝবে কী করে, কেন একটা মানুষ এভাবে একা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। গাছের

ছায়ায় ঘুরে না বেড়াতে পারলে জানবে কী করে, কেউ না থাকলে, গাছ ফুল ফল পাখি প্রজাপতি থাকে- এদের ভিতর জীবনকে খোঁজো-আমি ছাই এ-সব কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না বাপু। গাছগুলি নাকি, তোর বাপ-কাকাদের সব আত্মা। গাছগুলি নাকি, বাপ-কাকারা যে এখানে বেঁচে ছিলেন তার সাক্ষী!'

বুমবাই দেখল জেঠু কেমন এক ধমকে কাবু-বলল, 'আমি কী প্যাচাল পাড়লাম! তুই বল ব্যাটা তোর পিতামহের নাম কী! এত যে তড়পাচ্ছিস আমায় উত্তর বল! আমি প্যাচাল পাড়ি!'

'জানি, বলব না!'

'বলতে হবে। না বললে বুঝব ব্যাটা তোর শেকড়ও আলগা।'

মহাদেবদাদু বোধ হয় সবার সামনে হারতে রাজি না। বলল, 'ঈশ্বর শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হালদার।'

'প্রপিতামহের নাম?'

'ঈশ্বর শ্রীযুক্ত নগেনচন্দ্র হালদার।'

'বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম?'

'ঈশ্বর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু হালদার।'

'অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম?'

'বলব না। জানি। বকবক বন্ধ করবে কি না বলো।'

জেঠু সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহাদেব জানে। মহাদেব একা হয়ে যায়নি। তার ছেলেরা-মেয়েরা সব এক-এক জায়গায়। তবু সে জানে, তার উৎস কোথায়। তোরা জানিস না।'

বড়দা বলল, 'আমি জানব না কেন?'

'তুমি জানলেই চলবে! তোমার যেটি থাকছে, তাকে কে শেখাবে! তোমরা সব আমার কৃতী সন্তান! হ্যাঁ, এই কৃতী সন্তান! যে সে বাপঠাকুরদার সম্মান রাখতে জানে না! মহাদেব, এই ব্যাটা, বলে দে, আজ আমি জলগ্রহণ করব না।'

মহাদেবদাদু পড়ে গেল মহা ফাঁপরে। বলল, 'ওরা শেখাবে। বলল তো, শেখাবে!'

'শেখাবে! দেখবি!'

এবার জেঠু বড়দাকেই প্রশ্ন করল, 'দেখি তুমি মনে রেখেছ কি না!'

জেঠু এক-এক করে বলে গেল! বড়দা মাথা গোঁজ করে উত্তর দিয়ে গেল।

জেঠু এবার ছোড়দাকে বলল, 'তোর মনে আছে আমাদের সাত পুরুষের নাম! অরুকে নিয়ে এটা আট পুরুষ চলেছে।' বড়দাকে ফের বলল, 'আমার পূর্বপুরুষ কে ছিলেন, অরুকে আমি সব শিখিয়ে দেব। দেখবে, ওখানে গিয়ে ওপাট তুলে দেবে না। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে জেনে নেবে মনে রেখেছে কি না!' বড়দাকে সতর্ক করে দিল জেঠু।

বড়দা বলল, 'তোমার নাতিন যা দুরন্ত।'

'দুরন্ত হবে না, মেনিমুখো হবে তোদের মতো। চুরি করে কামরাঙা খাচ্ছিলি! এত করে বলেছি, সহ্য হবে না, ধাত তোদের পালটে গেছে, তবু দু-ভাইয়ে চুরি করে টক কামরাঙাগুলি খেলি!'

'কখন কামরাঙা খেলাম!'

'ফের মিছে কথা!'

বুমবাই দেখল বড়দা ওর দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। তারপর বড়দা তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একেবারে বিচ্ছু বানিয়েছ কাকা।'

'বিচ্ছু হবে কেন! জানিস ও কী সুন্দর ছবি আঁকে।' জেঠু তড়পে উঠল।

এরপর বুমবাইর কী যে আনন্দ-সে দৌড়োয়, সে বুঝেছে জেঠুর কথার উপর কথা নেই।

তখন সে আর অরু, সঙ্গে অপু বাবলুরা বাড়িটার চারপাশে লুকোচুরি খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর সকাল বেলায় ডেকে দেয় মহাদেবদাদু।

বুমবাই উঠেই অবাক।

কী শীত! আর তার মধ্যে জেঠু নিজে দাঁড়িয়ে সবাইকে গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছেন আর বলছেন, 'খেজুরের রস, খা। শীতের সময় খেলে শরীর গরম থাকে।'

বুমবাইর দাঁত কনকন করছিল। এক চুমুক খেয়ে বলল, 'আর খাব না।'

অরু সবটা খেয়ে ফেলল। অরুর কি দাঁত কনকন করছে না! বাবলু অপুরা খাচ্ছে তেতো গেলার মতো।

জেঠুর এককথা, 'যে দিনের যা, খেতে হয়। প্রকৃতি মানুষের জন্য যা যা লাগে সব তার ভাঁড়ারে মজুত করে রেখে দেয়। খেতে হয়। খেলে দীর্ঘায়ু হয় মানুষ।'

কিন্তু বুমবাই ভেবে পায় না, এই বুড়ো লোকটার এত সকালে কোথা থেকে উদয়। সে ফেলেও দিতে পারে না। অরুর শীত না করলে তার শীত করবে কেন, অরুর দাঁত কনকন না করলে তার করবে কেন! সে আর বলতে পারল না, খাব না। কোনোরকমে সবটা খেতেই মনে হল, ভারি মিষ্টি সুস্বাদু-সে বলল, 'আমাকে আর এক গ্লাস।'

বড়দা অরুকে বলছে, 'তোর মাকে ডাক।'

মেমবউদি অনেক রাতে ঘুমিয়েছে। এত সকালে ওঠার অভ্যাস নেই। কিন্তু বড়দা আর জেঠুর ভালো লাগার মধ্যে কিছু একটা আনন্দ খুঁজে পায় মেমবউদি। বুমবাইর মনে হয়, যে ক-টা দিন এখানে থাকা, মানুষটা যা পছন্দ করে করে যাওয়া। মেমবউদি রস খেয়ে বলল, 'নাইস।'

জেঠুর মুখে সে কী তৃপ্তির হাসি।

বড়দা বলল, 'খেজুর গাছ চেন?'

মেমবউদি মিষ্টি হেসে বলল, 'না!'

অরুকে বলল, 'তুই চিনিস?'

অরু বলল, 'না।'

বুমবাই খেপে গেল, 'এই তোকে দেখালাম না, পুকুরপাড়ে দুটো লম্বা কাঁটাওয়ালা গাছ। বললাম না, খেজুর গাছ।'

বড়দা বিকেলেই মেমবউদিকে বাড়ির খেজুর গাছ দেখাতে নিয়ে গেল। বুমবাই, অরু, ছোটো বউদি, পিসিরা সঙ্গে। বুড়ো লোকটা গাছের নীচে বসে আছে। পরনে ট্যানা কানি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পেট শ্রীঘটের মতো। সরু লিকলিকে হাত-পা।

বড়দা বলল, 'কী নাম তোমার?'

'বিন্দেশ্বর।'

'শীতে কষ্ট পাও দেখছি!'

'তা পাই বাবু।'

সবাই পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে-লোকটা তরতর করে গাছ বেয়ে উপরে উঠে গেল। কোমরে ঝোলানো পাতলা হেঁসো। ছপ ছপ করে গাছের পাতলা মাখনের টুকরো খসিয়ে ফেলল কিছুটা। তারপর হাঁড়িটা পেতে রাখল। টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ছে।

মেমবউদির চোখে অপার বিস্ময়।

মেমবউদি দৌড়ে বাড়ি চলে গেল। সঙ্গে বুমবাই। বুমবাইকে একটা ওভারকোট দিয়ে বলল, 'বুড়ো মানুষটাকে দেবে।' বুমবাই কোটটা কাঁধে ফেলে ছুটে যাচ্ছে। আশ্চর্য ঘ্রাণ কোটে-সে এমন একটা কোট বড়ো হয়ে বানাবে ভাবল। এই কোট গায়ে দিলে, বুড়ো লোকটাকে কেমন না জানি দেখাবে! কিন্তু আরও আশ্চর্য বুড়ো লোকটা কিছুতেই কোটটা নিল না। বলল, 'ও গায়ে দিয়ে বের হলে লোকে খেপাবে। তা ছাড়া ওটা কী করে পরতে হয় জানি না।'

বড়দা দেখিয়ে দিল, 'এভাবে পরতে হয়।'

বুড়োর এককথা, 'ও হয় না। ও পরা যায় না। বাবু, ও গায়ে দিলে কুটকুট করবে হাঁটতে গেলে আছাড় খাব। যাও ক-টা দিন পরমায়ু আছে, তাও যাবে।'

ছোড়দা পার্স বের করে কুড়িটা টাকা দিয়ে বলল, 'চাদর কিনে নিয়ো।'

ছোড়দার কাছ থেকে টাকাও নিতে চাইল না।

বুমবাই দৌড়ে এসে জেঠুকে বলল, 'জান জেঠু সেই লোকটা না, ওভারকোট নিল না! জান জেঠু সেই লোকটা না টাকা নিল না।'

জেঠু বলল, 'ওকে আবার কে টাকা দিতে গেল?'

'ছোড়দা।'

'কী মুশকিল। হাতে এত টাকা ও নেবে কেন? নিলেই থানায় নিয়ে যাবে। ওভারকোট পেলে তো কথাই নেই। ওর ভাই দফাদার। দু-শরিকে বনিবনা নেই। টাকার গন্ধ পেলেই, ফণিশ্বর বলবে টাকা! কোথায় পেলে! দাও। না দিলে থানায় যাব। ব্যস, হয়ে গেল। একবার চোরের দায়ে ধরা পড়ে মার খেয়েছে। থানার নামে বিন্দেশ্বর কাবু।'

বুমবাই আরও অবাক, বিন্দেশ্বর নিজেই হাজির। জেঠুকে নালিশ দিচ্ছে, 'কর্তা আমারে টাকা দেয় ক্যানে, আমারে পিরান দেয় ক্যানে! আমারে ধইরে নেইয়ে গ্যালে কী হব্বে কর্তা!'

'না নেবে না। তুই যা। এই মহাদেব একে দিয়ে দে।'

মহাদেব দাদু ওকে একটা কাঠায় করে চাল ডাল নুন তেল দিয়ে বলল, 'বেগুন খেত থেকে তুলে নিয়ে যা।'

বুমবাই ভেবে পেল না, বুড়ো লোকটা ওগুলো নিয়ে কোথায় যাবে।

জেঠু বলল, 'মাথায় ছিট আছে। বুড়ো হয়ে গেছে। কেউ নেই। নিজের উঠোনে সাঁঝ লাগলে নাচে একা একা।'

'কোথায় থাকে জেঠু?'

'কাঁচা রাস্তার ওপাশে।'

বুমবাই অরুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাবি? বুড়োর বাড়িটা দেখে আসব।'

কোথা থেকে মহাদেবদাদু যেন লাফিয়ে পড়ল, 'কোথায় যাবে! বিন্দার কাছে! খবরদার। যাবে না। ওর কাগা নেত্য বগা নেত্য দেখলে ঘোর লাগবে চোখে। ছাগল গোরু ভেড়া বানিয়ে রাখবে, তখন আমরা তোমাদের খুঁজে পাব না। ব্যাটা পারে না হেন কাজ নেই।'

জেঠু কোনো কথা বলছে না। বারান্দার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে। বুমবাই জেঠুর পরামর্শ চায়। মহাদেবদাদু ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু লোকটার লম্বা নাক, ছোট্ট থুতনিতে ক-গাছা সাদা দাড়ি, বকের মতো হেঁটে যাওয়া, সবটাই রহস্য। কাগা নেত্য বগা নেত্য কী ঠিক বুঝল না। ভূতের ওঝা-টোজা হবে। চুল খাড়া, শরীরে খড়ি ওঠা, প্রায় যেন জ্যান্ত ভূতের সামিল-কিন্তু লোকটা তাকে যাবার সময় যে বলে গেল, তারা সবাই গেলে, সে সীতা হরণের পালা গাইবে।

বুমবাই যেই দেখল, মহাদেবদাদু কাছে নেই অমনি জেঠুর কানের কাছে ফিসফিস গলায় বলল, 'জেঠু, কাগা নেত্য বগা নেত্য কী!'

জেঠু হেসেছিল। বলল, 'বিন্দা নাচে। একা থাকলে নাচে। লোক দেখলে নাচে। মোগা নাচ। ওটা একধরনের লোকনৃত্য। লোকনৃত্য বুঝিস!'

বুমবাই বলল, 'নাচে মানে?'

'লোকনৃত্য বুঝিস কি না বল!'

বিষয়টা ঠিক তার বোধগম্য হল না! সে কি ক্রিকেট, ছবি আঁকা ছাড়া কিছু বোঝে না! সে বলল, 'কাগা নেত্য কী, বলো না জেঠু!'

'কাক সেজে নাচে।'

'লোকটা কাক সাজতে পারে?'

'মুখোশ আছে। কাকের মুখোশ, বকের মুখোশ পরে নেয়। তারপর আপন মনে নাচে।'

'নাচে কেন?'

'কী করবে। সারাদিন ওর এখন আমার বাড়িতে ওই একটা কাজই আছে। লোকজন বাড়ির পাশ দিয়ে বড়ো কেউ তার যায় না। বাড়িটা ওর ধানের গোলার মতো। ঘুলঘুলি আছে। ঘুলঘুলি দিয়ে ভিতরে ঢুকে যায় রাতে। চারপাশে উঠোন। সেই উঠোনে সে নাচে।'

'ওর নাচ দেখেছ?'

'দেখব না! অতিষ্ঠ করে মারে। মহাদেবের ভয়ে কাক বক সেজে আর আসে না। আসে না ঠিক না, আসে। ফাঁক বুঝে আসে। মহাদেব বাড়ি নেই, কোথাও গেছে শুনলে গুঁড়ি মেরে জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসে!'

বুমবাইর কী যে হয়! সে আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করল না। দৌড়ে ভেতর বাড়ির দিকে ঢুকে গেল। পা-টা বড়ো চুলকাচ্ছে। বসে পা চুলকে নিল। আর এদিক-ওদিক খুঁজছে। অরুণিমাকে পেয়ে গেল গোয়ালবাড়ির পেছনে। অরুণিমা অপু কোঁচড়ে গাঁদা ফুল নিয়ে মালা গাঁথছে। সে ডাকল, 'শোন অরু।'

অরু কাছে গেলে বলল, 'যাবি?'

'কোথায়!'

'নাচ দেখতে যাব। সবাই যখন দুপুরে দিবানিদ্রা, বুঝলি না, ভোঁস ভোঁস'- বলে নাক টেনে চিৎপাত হয়ে পড়ে বিষয়টা বোঝাতেই অরু হেসে গড়িয়ে পড়ল। 'আংকল, তুমি একটা জোকার।'

'ঠিক আছে, শোন। এদিকে আয় অপু। আমরা একটা জায়গায় যাব। মহাদেবদাদু জানবে না। চুপিচুপি। মনে থাকবে তো! কেউ জানবে না। জানলে যেতে দেবে না।'

বুমবাই এই জেঠুর দেশে এসে কত কিছু দেখে গেল, শহরে গিয়ে মাকে বলতে না পারলে স্বস্তি পাবে না। এমন ভাবে বলবে, যাতে মা নিজেই পুজোর ছুটিতে জেঠুর দেশ-বাড়ি দেখার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। এত কাছে একটা লোক মুখোশ পরে নাচে, রাম-রাবণের সাজে, অশোক বনে সীতা, মন্দোদরীর মন্দ কপাল, আবাগির বেটি, আমার মা সীতা জননী, আরও সব নানা রকমের গান গলায় থাকে। কেউ নাচ দেখতে চায় না। কারণ নাচ দেখিয়ে হাত পাতার অভ্যাস। এক দু-পয়সা। তার বেশি নেয় না। তবে বয়েস হলে যা হয়, বেশিদূর হেঁটে যেতে পারে না-কাছাকাছি তেমন বাড়িঘরও নেই, নিজেই একা নাচে। খাওয়া-পরার দায় জেঠুর। এখন সে নির্ভাবনায় নাচতে পারে। কর্তার বাড়িতে নাচতে পারে না। একবার নাচ শুরু করলে শেষ করতে চায় না। মহাদেবদাদু লাঠি নিয়ে তখন তেড়ে যায়। কোমরে খেজুরের ডাল দিয়ে পুচ্ছ বানায়, যখন দৌড়োয়, পুচ্ছ সব খসে পড়ে। বুমবাই নিজেই হা-হা করে হেসে উঠেছিল-জেঠুর কাছ থেকে সব শোনার পর।

এমন একটা মজার দেশে এসে কাগা-বগার নেত্য না দেখে যায় কী করে! অরুটাও তার স্কুলের বন্ধুদের বলতে পারবে, একটা লোক পাখি সেজে নাচছিল। কী সোন্দর নাচ! অরু এখনও সুন্দর বলতে পারে না। কেবল সোন্দর বলে। বুমবাইর এটা বড়ো একটা আফশোস থেকে গেল।

বুমবাই বলল, 'আমি বকুলগাছটার নীচে বসে কুক কুক শব্দ করব।'

'কখন!'

'মহাদেবদাদুর দিবানিদ্রার সময়।'

আসলে এখানে আসার পর সবাই খোলামেলা, পিসি বউদি সবাই। একটা ভয় ছিল, সাপখোপের। শীতের সময় বলে তারও ভয় নেই। জেঠু বলে দিয়েছে, ক-টা দিন ওদের মতো থাকতে দাও। বেশি শাসন ভালো না। এতে শিশুদের আত্মনির্ভরতা কমে যায়। দেখুক সব। নিজের চোখে দেখুক। বাবা কাকারা বড়দা ছোড়দা

বউদি পিসিরা নিজেরা নানা জায়গায় চলে যাচ্ছে। বড়দার গাড়ি, তায় ড্রাইভার, যখন-তখন হুসহাস সবাই বের হয়ে পড়ছে-এ এক আনন্দ যদিও-যেন সবাই স্বাধীন। বুমবাইদের মতো ছোটো যারা আছে, তাদের দেখার দায়িত্ব মহাদেবদাদুর। আর কেউ কোনো খোঁজখবর রাখতে সাহস পায় না। অরু কোথায় একবার বলতেই জেঠু বলেছিল, 'তুমি দেখছি নুটু, অরু ছাড়া পৃথিবীতে কিছু বোঝ না। একটু হাত-পা মেলে ঘুরে বেড়াক। সবসময় মেয়েটার তুই পিছু লেগে থাকিস!'

জেঠুর ভয়ে কেউ বেশি ডাকাডাকি করতে সাহস পায় না। জেঠুর এককথা, 'প্রকৃতিই সব শিখিয়ে দেয়। কখন ঘরে ফিরতে হয় বলে দেয়। কখন কী তার দরকার বুঝিয়ে দেয়। আমরা প্রকৃতি থেকে দূরে সরে গেছি বলে, বড়ো অল্প আঘাতেই হায় হায় করে উঠি।'

'সুতরাং এই কথা থাকল। কুক-কুক।'

'মনে থাকবে।'

অপু দীপু বাবলু অরু সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। গোয়াল বাড়ির পেছনে গম্ভীর কথাবার্তা বুমবাইর। বুমবাই একবার অরুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোকে নেব না ভাবছি!'

'কেনু কেনু?'

'এই কেনু কেনুর জন্য। কেন হবে। বল সুন্দর।'

অরু বলল, 'সুন্দর।'

'আবার বল সুন্দর।'

অরু বলল, 'সুন্দর।'

'দশ বার বল। একবার ভুল হলেই নেব না।' আর আশ্চর্য অরু ঠিক দশ বারই সুন্দর উচ্চারণ করল।

শীতের দুপুরে বুমবাই সহসা দেখল গাছের ডালে কী একটা ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করেছে। বিশাল গাব গাছ, গভীর অন্ধকার ডালপালার জঙ্গলে। বাড়ির পেছনে গাছটা। ওর কেমন ভয় ধরে গেল। কিন্তু সে ভয় পেলে অরু ভয় পাবে, অপু ভয় পাবে। সবাই ভয় পাবে। ভয় পেলে তাকে এরা মানবে কেন! জেঠু বলেছে, 'ভয় পেতে নেই। ভয় পাবার আগে দেখবে ভয়টা কীসের।' বুমবাই কাউকে ভয় পায় না। ভূত ছাড়া ভয় পাবার মতো আর কী আছে জানে না। ভূতের সঙ্গে তো আর মারামারি করা যায় না। রাতে সে একা বের হতে ভয় পায়। দিনের বেলাতেও কোনো ফাঁকা জায়গায় একা সে যেতে পারে না। কিন্তু এখানে আসার পর সে ফাঁকা জায়গা পেলেই ছুটতে চায়। কারণ জেঠু বলেছে, ভূত বলে কিছু নেই। থাকতে পারে না। সব মনের বিকার থেকে হয়।

এ-সব সাত-পাঁচ ভাবতেই দেখল একটা লেজ ঝুলছে। ভূতের আর যাই থাক, লেজ থাকবে বিশ্বাস করতে পারে না। তারপর দেখল বিশাল একটা বাঁদর গাছ থেকে, লাফ মেরে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে গেল। সবাই ভয়ে কাঁটা। এখানে আসা তক কেউ এ জীবটিকে দেখেনি! সে চিৎকার করে ডাকল, 'জেঠু, হনুমান!'

জেঠুর সাড়া পাওয়া গেল না। মহাদেবদাদু ছুটে এসেছে।

'কী হল!'

'হনুমান।'

মহাদেবদাদুর এককথা, 'তুমি হনুমান। হনুমান না হলে এই দুপুরে কেউ টোটো করে ঘুরে বেড়ায়।'

অরু বলল, 'মাংকি!'

মহাদেবদাদু মাংকি শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। 'কী সব বিশ্রী কথা, মাংকি কী আবার।'

বুমবাই বুঝতে পারে মহাদেবদাদু রেগে গেলে সারাক্ষণ পিছু নেবে তাদের। মাংকি বুঝতে না পারলে ভাববে ঠাট্টা করা হচ্ছে। সে বলল, 'হনুমানের ইংরেজি মাংকি!'

'ওসব আমি বুঝি। আমাকে বোঝাতে হবে না। সব বাড়ি চলো।'

অরু বুমবাইর দিকে তাকাল।

বুমবাই বলল, 'তবে ওই কথা থাকল।'

মহাদেব দাদু বুঝতে পারল না, কী কথা থাকল তাদের!

শীতের বেলা পড়ে আসে।

কেমন গাছপালা সব নিঝুম। বাড়িটা থেকে তারা বেশ দূরে চলে এসেছে। ও-দিকে জেঠুর ধানের জমি, শ্যালো বন্ধ এখন। একটা সড়ক চলে গেছে পাকা রাস্তার দিকে। বাঁ-দিকে নাবাল জমি। চাষ-আবাদ হয় না। খড়ের বন। বনের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবার একটা রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল। বুমবাইর মনে হল, এই রাস্তা ধরে গেলেই বিন্দেশ্বরের বাড়ি সোজা উঠে যাওয়া যাবে।

একটা খটকা মনের মধ্যে উঁকি দিল বুমবাইর। কাঁচা রাস্তা তো এটাই। কিন্তু এখানে কোনো বাড়িঘরই নেই। মানুষজন নেই। শুধু দেখল একপাল হনুমান কলাইর জমিতে বসে কচি ডগা ছিঁড়ে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে শীতের পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছিল। কোথাও জঙ্গলের মধ্যে ছাতার পাখি কিচিরমিচির করছে। সাদা বকের ঝাঁক উড়ে এসে বসল পাশের জলাটায়। আর মাথার উপর কী বিশাল আকাশ। শীতের এক আশ্চর্য উষ্ণতা থাকে এসময়-বুমবাইর ভয় পেলে চলবে না, এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, 'কাগা-বগার নেত্য দেখতে হলে এ পথটাতেই ঢুকতে হবে। তোরা ভয় পাবি না তো?'

অপু বলল, 'কী জঙ্গল!'

বাবলু বলল, 'বুমবাইদা, তুমি ঠিক জান তো...'

বুমবাই তো আর না জেনে ছোটো হতে পারে না! সে বলল, 'আলবত জানি।' বুমবাই কত সব দুঃসাহসিক অভিযানের কথা গল্পের বইয়ে পড়েছে। সেই যে এক ম্যান্ডেলার গল্প জেঠু তাকে বলেছিলেন, সেই গল্পটার কথাও তার মনে পড়ে গেল। কত রাতে ম্যান্ডেলার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই কোন এক পাহাড়ি উপত্যকায় ম্যান্ডেলা আর তার মা থাকে। ম্যান্ডেলার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। উপত্যকা থেকে নেমে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে এসে ম্যান্ডেলা দাঁড়িয়ে থাকত, যদি বাবার জাহাজ ফিরে আসে! দিন যায় আসে না।

জেঠুর গল্পে ওই এক মজা, দিন যায় আসে না বলেই চুপ মেরে যায়।

'তারপর কী জেঠু!'

'তারপর আর কী! মানুষের আশা তো অপূর্ণ থাকে না। ম্যান্ডেলা রোজ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত, বাবা কেন আসে না। আমাদের বাবা ছাড়া আর কেউ নেই!'

বুমবাইর ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে যায়। জেঠুর পায়ের কাছে গুঁড়ি মেরে উঠে আসত। প্রশ্ন করত, 'ম্যান্ডেলার বাবা ফিরে এসেছিল?' বাবা না থাকলে কেউ থাকে না, ম্যান্ডেলার জন্য ভারি কষ্ট হত! সে চাইত, ম্যান্ডেলার বাবা ফিরে আসুক।

জেঠু তখন বলত, 'ওর বাবা ফিরে এসেছিল কি না জানি না। আমাদের জাহাজ তো বন্দরে দু-একমাসের বেশি নোঙর ফেলে থাকতে পারত না। কত দেশে যেতে হবে। কত মালপত্র জাহাজে। তবে শুনেছি, ম্যান্ডেলাকে একটা পালক দিয়ে গেছিল।'

'কে দিল পালকটা?'

'এক ভারতীয় জাদুকর। নাম জাদুকর বসন্তনিবাস। একটা পালক আর রুপোর ঘণ্টা।'

'রুপোর ঘণ্টা কেন?'

'ম্যান্ডেলার একটা পোষা বাচ্চা ক্যাঙারু ছিল। নাম হাইতিতি। পালকটা চুলে গুঁজে দিলেই ম্যান্ডেলা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত। যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারত। সঙ্গে থাকত হাইতিতি। ওর গলায় রুপোর ঘণ্টা বাজত ডুং ডাং। উপত্যকার মানুষেরা আকাশে ঘণ্টাধ্বনি শুনলেই বুঝতে পারত সেই মেয়েটা আকাশে ভেসে চলে যাচ্ছে। বাবার খোঁজে সে যেখানে যত দ্বীপ আছে উড়ে যেত, যেখানে যত দেশ আছে সে উড়ে যেত।'

জেঠুর কাছে এমন গল্প শোনার পর, সে নিজেও কতদিন স্বপ্ন দেখেছে, একটা পালক তার শিয়রে কে রেখে গেছে। পালকটা পরে সেও উড়ে যাচ্ছে ভিন গ্রহে। সঙ্গে ম্যান্ডেলা আর হাইতিতি।

খড়ের বনে ঢুকে গিয়ে আজ বুমবাইর মনে হল, সেই ম্যান্ডেলাই তার সঙ্গে আছে। অরুকে দেখার পর বারবারই মনে হয়েছে, উপত্যকার সেই মেয়েটি। যেন বাচ্চা পরি।

খড়ের বনে ওরা সেই সরু পথ ধরে হেঁটে যেতে থাকল। ওদের দেখা যাচ্ছে না। ওরাও বাইরের কিছু আর দেখতে পাচ্ছে না। ঘাসের জঙ্গল এত উঁচু যে, এক চিলতে আকাশ বাদে আর কিছু তাদের চোখে পড়ছে না। বুমবাই ভয় পেয়ে গেলে সবাই ভয় পেয়ে যাবে। তবে সে ভয় পাচ্ছে না। সঙ্গে যে আজ তার সত্যিকারের ম্যান্ডেলা রয়েছে। সে অরুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই অরু, ভয় করছে না তো!'

'না আংকল, একদম ভয় করছে না!'

তখনই অপু নাক টেনে বলল, 'ওফ, কী গন্ধ রে বাবা!'

বুমবাইও গন্ধটা পাচ্ছে। বিশ্রী গন্ধ! জন্তুজানোয়ারের গায়ের গন্ধের মতো। সার্কাসে বাঘের খাঁচার কাছে গেলে বুমবাই একবার নাক কুঁচকালে বাবা বলেছিল, 'বাঘের গায়ের গন্ধ। শিকারিরা এই গন্ধ শুঁকে টের পায় কাছে কোথায় তেনারা আছেন।'

বুমবাই জানে, জেঠুর পৃথিবীতে খরগোশ, কাঠবেড়ালি, ভোঁদড়, শেয়াল আছে, আজ হনুমানের পালও দেখতে পেল। বাঘ আছে বলে তো জানে না। বাঘ থাকলে জেঠু ঠিক বলত। তবু কেন যে ভয় করছে।

আফ্রিকার জঙ্গলে এমনি ঘাসের বনে শুনেছে সিংহরা থাকে-সুন্দরবনের বাঘেরা ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। এখন যে দৌড়ে পালাবে তারও উপায় নেই। ঘাসের জঙ্গলে জন্তুজানোয়ারের চলাফেরার রাস্তা থাকে। মনে হয় মানুষের চলাফেরার রাস্তা-কোনো একটা বইয়ে সে এমনও পড়েছে। এই রাস্তা এখানে-সেখানে বেঁকে গেছে-আবার সামনে আর একটা এমন রাস্তা, গোলকধাঁধার মতো, কোনদিকে দৌড়ে গেলে কাঁচা রাস্তায় উঠে যাবে, জেঠুর ধানের জমি দেখতে পাবে বুঝতে পারছে না।

কিন্তু জেঠু বলেছে বিপদে দিশেহারা হতে নেই। মানুষ সব পারে। বাঘকেও মানুষ আজকাল পোষে। 'বর্ন ফ্রি' সিনেমাতে দেখেছে। আফ্রিকার জঙ্গল দেখেছে। ওড়িশার জঙ্গলের খইরিকে নিয়ে কত ছবি বের হয়েছে কাগজে। দিশেহারা সে হবে কেন! বলল, 'পচা গন্ধ। ও কিছু না। কোথায় কী মরে পড়ে আছে কে জানে। শিগগির পা চালিয়ে হাঁট।'

তারপরই হাঁকল, 'ও বিন্দেশ্বর, তোমার বাড়িটা কোথায়?'

আর তখন জঙ্গলের ভেতর কোথা থেকে বের হয়ে এল বিন্দেশ্বর। একেবারে একটা কাকলাসের মতো মাথা বের করে বলল, 'বাবুসকল, আমি আপনাগো পিছু পিছু হাঁটতাছি।'

বুমবাইর দম বন্ধ হবার মতো অবস্থা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কোথায় কত দূরে চলে এসেছে সবাইকে নিয়ে বুঝতে পারছিল না। সবাই যে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দেয়নি সেটাই রক্ষা। বিন্দেশ্বর নেংটি পরে কখন পিছু নিয়েছে জানে না। উপরে নীচে গোনাগুনতি তিনটে দাঁত মুখে। আর সব দাঁত ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে তার। তাকে ডাকতেই সে হাজির। বিন্দেশ্বর কি আসলে সেই জাদুকর বসন্তনিবাস! জেঠু কি বসন্তনিবাসকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরেছিল। বসন্তনিবাসকে কি জেঠু এই জঙ্গলের মধ্যে বিন্দা বানিয়ে রেখেছে। জেঠু জাহাজে কাজ করত একসময়। কত দেশ ঘুরেছে, কত বিচিত্র মানুষের গল্প বলেছে। বসন্তনিবাস নাকি জেঠুর জাহাজেই কাজ করত। জাহাজ বন্দরে নোঙর ফেললে বসন্তনিবাস পরত একটা আলখাল্লা, পায়ে সোনালি নাগরা, মাথায় পরত পালকের টুপি, আলখাল্লার লম্বা পকেটে থাকত হরেক দেশের আজব খেলনা। একটা বেড়ালের ছানা পকেট থেকে সব সময় উঁকি মেরে থাকত। জাহাজ থেকে নামলেই বন্দরে সব শিশুরা জড়ো হত তার চারপাশে। সে তাদের হাতে টফি দিত। প্লাস্টিকের খেলনা দিত, যে যা হাত পেতে চাইত সবই পেয়ে যেত।

বিন্দাও যেন তেমনি। কী করে টের পেয়েছে তারা খড়ের বনে হারিয়ে গেছে। এটা কোনো জাদুবিদ্যা জানা থাকলেই সম্ভব। বিন্দাকে দেখে সে কেমন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। সে যে ভয় পেয়ে গেছিল বলল না। সে যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল বলল না। একেবারে লায়েক ছেলের মতো বলল, 'তোমার বাড়িটা কোনদিকে। তুমি যে বলে এলে কাগা-বগার নেত্য দেখাবে-আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে এসেছি।'

'বাবুসকল, কী দয়া আপনাগো। বড়ো ভালোবাসেন দেখছি বিন্দাকে। আপনার জেঠার বান্দা আমি। সারাদিন নেত্য দেখাব বলে ঠিক করে রেখেছি। রং গুলে রেখেছি, শোলার মুখোশ বানিয়েছি। আপনারা ক-জন?'

বুমবাই গুনে বলল, 'আমরা সাত জন।'

বিন্দা বলল, 'হয়ে যাবে।'

বকের মতো ঠ্যাং ফেলে সে হাঁটছে। আর রাজ্যের সব আজগুবি কথা। সে বলল, 'আপনার জেঠাবাবু বিশ্বাস করে না বনটায় বাঘ আছে।'

'এখানে বাঘ?'

'বাঘের কী দোষ বলেন, খেতে না পেলে গাঁয়ে গেরামে উঠে আসবে। তবে কারও অনিষ্ট করে না। পোষা বাঘ।' বলেই সে হাতে তালি বাজাল। আর দেখল, একটা বাঘের বাচ্চা ওর পায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বলল, 'সারা দিনরাত এরাই আমার বাবুসকল সঙ্গী।'

তারপর বলল, 'এই পেরনাম কর।'

ছোট্ট বাচ্চা বাঘটা দু-পায়ে খাড়া হয়ে গেল। হাত জোড় করল।

বাঘের বাচ্চাটার গা থেকে বোটকা গন্ধ বের হচ্ছে। বিন্দার পায়ে পায়ে তবে বাঘটাও আসছিল! জেঠু বলত, 'বসন্তনিবাসের কাণ্ডই ছিল অদ্ভুত। চোখে দেখিনি। তবে শুনেছি, বন্দরে বসন্তনিবাস ইচ্ছে করলে বেড়ালটাকে বাঘ বানিয়ে ফেলতে পারত। জাদুকররা পারে না হেন নাকি কাজ নেই!'

বিন্দাই তবে বসন্তনিবাস। বুমবাই কেমন অবাক চোখে দেখতে থাকল বিন্দাকে।

বিন্দা বলল, 'কী আনন্দ। কী আনন্দ। কাগা-বগার নেত্য দেখতে এয়েছেন আমার বাবুসকলেরা। পরিদিদি, ডর লাগছে না তো!'

অরু বলল, 'না না। তুমি তো দাদুর খেজুর গাছ কেটে মিষ্টি রস বের কর। এত বড়ো একটা গাছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধুর রস বের করা জাদুকরের পক্ষেই সম্ভব।'

একবার যেতে যেতে বুমবাইর ইচ্ছে হল বলে, বসন্তনিবাস, তুমি কি বলতে পার, ম্যান্ডেলা তার বাবার খোঁজ পেয়েছিল কি না? তুমি যে তাকে একটা পালক দিয়ে এসেছিল! হাইতিতিকে রুপোর ঘণ্টা।

বিন্দা বলল, 'কত পালক আছে দেখবেন। সব জড়ো করে রেইখে দিইছি। বাবুরা আসবেন-কী আনন্দ, কী আনন্দ! গাছের ডালে বইসে আছি, দেখি বাবুসকল খড়ের বনে ঢুইকে গ্যাল। কী আনন্দ, কী আনন্দ!'

বিন্দার বাড়িতে পালকও আছে। বুমবাই ভাবল সে একটা পালক চেয়ে নেবে। সে কেন, সবাই। ম্যান্ডেলার মতো সেও যে আকাশে কত রাতে স্বপ্নে উড়ে গেছে। ভেসে গেছে। বাতাসে ভেসে যাওয়ার মজাই আলাদা। পালকের কথা ভাবতেই বিন্দা ঠিক টের পেয়ে গেল একটা পালক চাই তার।

বিন্দা ঝোপজঙ্গল ভেঙে পথ করে দিচ্ছে। গাছের ডাল, কাঁটাঝোপ, ফণিমনসার জঙ্গল পার হয়ে আর একটা জঙ্গলে ঢুকে অবাক। সবুজ ঘাস আর মাঠের মতো। কোনো বাড়িঘর নেই। পাশেই বড়ো বিল। লাল শালুক ফুলে বিলের জল রঙিন হয়ে আছে। বিলের পাড়ে দু-তিনটি বড়ো কাঠের বাক্স। অনেক দূরে শহর থেকে পাকা সড়ক চলে গেছে।

অরু বলল, 'এটা তোমার বাড়ি? ঘর কই?'

বুমবাই বলল, 'এ তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে এলে!'

বাঘের বাচ্চাটা লাফাচ্ছে। একলাফে কাঠের বাক্সের উপরে গিয়ে বসে পড়ল। কোথা থেকে দুটো হনুমান, একটা বেজি উঠে এল।-এ কেমন লোক রে বাবা! বুমবাই অপুরা কেমন দিশেহারা!

একদিকে শাল গাছের জঙ্গল! বড়ো বড়ো শাল গাছ। নিরন্তর পাতা ঝরছে। বাক্সতে কী আছে কে জানে। মহাদেব দাদু বলেছে, ব্যাটা সব পারে। মানুষকে গোরু-ছাগল বানিয়ে রাখতে পারে। বুমবাইর মনটা খচখচ করছে। বিন্দা কী বুঝতে পেরে বলল, 'আমি নাচি, আমার আর কোনো দোষ নাই বাবুসকল।' বলেই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। সাঁজ লেগে গেছে। বাড়িতে খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। কিন্তু এমন একটা অচেনা জায়গা থেকে তারা যাবেই বা কী করে!

আরে এ তো আরও বিস্ময়। সব বুঝতে পারে বিন্দা। বলল, 'ডর নাই বাবুসকল। আমরা নাচতে নাচতে বাবুর মহল্লায় চলে যাব। আমার বাপঠাকুরদার ইজ্জত আছে না! আমি কোনো আকাম-কুকাম জানি না বাবুসকল।' বলেই সে কাঠের তাপ্পি মারা বাক্স দুটো খুলে ফেলল। বলল, 'বাড়ি থাকলে মহাদেব ব্যাটা তাড়া করবে, এইখানে চইলে এলুম। দেখেন।' বলেই সে একটা মুখোশ বের করে পরিদির মুখে লাগিয়ে দিল। লাগাতেই পরিদি মানে অরু ময়না পাখি হয়ে গেল। বের করছে সব টেনে টেনে। একটা জোব্বার মতো কী বের করে পরে ফেলল বিন্দা। চকচকে রাংতা লাগানো। জোনাকি পোকা আঠা দিয়ে গাঁথা। জোনাকি পোকাগুলি ওড়ার জন্য ছটফট করছে। আর আগুনের ফুলকির মতো জ্বলে উঠছে। সে বাক্স থেকে আবার কী টেনে বের করতেই দেখল বিশাল একটা ধামসা। গলায় ঝুলিয়ে দুটো কাঠি দিয়ে এমন তালমিলের বাদ্যি শুরু করল যে, পরিদি নাচতে শুরু করে দিল। পরিদি ময়না পাখি, বিন্দার মুখে দৈত্যের মুখোশ, দুটো দাঁত বের হয়ে আছে। কেমন মোহের মধ্যে পড়ে গেছে বুমবাই। বুমবাই কেন, সকলেই।

একটা আজব দেশের বাসিন্দা হয়ে গেলে যা হয়-স্বপ্নে এমন আজব দেশ ঘুরে এসেছে সবাই। এটা স্বপ্ন কি না, তাও বুঝতে পারছে না যেন অপু বাবলুরা। ওরা বলল, 'আমাদের মুখোশ কই। কেবল তুমি আর অরু নাচবে, হবে কেন?'

গলায় ঝোলানো ধামসা। হাতে দুটো কাঠি। এই কাঠিতে কী আশ্চর্য জাদু, বিন্দা কত রকমের বোল তুলছে কাঠিতে।

বুমবাই বলল, 'আমি কী সাজব?'

বিন্দা বাদ্য থামিয়ে বলল, 'সাজেন।' সে হাঁটু মুড়ে বসে গেল। বলল, 'শালপাতা তুলে আনেন।' বুমবাই ছুটে গেল শালপাতা কুড়োতে। জড়ো করে ফেলল গাদা গাদা শালপাতা। শালপাতা দিয়ে বিন্দা কী করবে জানে না। কিন্তু এমন ঘোর লেগে গেছে যে, প্রশ্ন করার মতোও বিচারবুদ্ধি নেই কারও।

বিন্দার কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। মুখোশটা খুলে পাশে রেখে দিল। নারকেল পাতার কাঠি বের করল গুচ্ছের। তারপর শালপাতা সেলাই করতে বসল। নিমেষে বুমবাইর মাপের শালপাতার একটা পোশাক বানিয় ফেলল। পোশাকটা পরতেই মনে হল শরীর কেমন খসখস করছে। পাতার ঘষটানির শব্দ। হাত মেলে দিলে ইগলের মতো পাখনা হয়ে যাচ্ছে। পেছনে ঝুলছে শালপাতার পুচ্ছ। আসলে বিন্দা যে শুধু জাদুকরই নয়, ওস্তাদ কারিগরও, বুমবাই এই প্রথম টের পেল। কত সব সুন্দর মুখোশ বাক্সের মধ্যে। খালি শোলার মণ্ড দিয়ে তৈরি। বুমবাই ইগল পাখির মতো ডানা মেলে দৌড়াচ্ছে। অরুর গায়ে সবুজ রঙের ফ্রক। পায়ে সবুজ মোজা। ময়না পাখির মুখোশ পরে সেও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাবলু অপুরা বলছে, 'আমাকে আগে, আমাকে কী সাজতে হবে?' একে একে বিন্দা সবাইকে একটা করে মুখোশ দিয়ে দিল। পাতার পোশাক বানিয়ে দিল। সে এবারে চায় সত্যিকারের মোগা নৃত্য কারে বলে মানুষজন দেখুক। ব্যাটা মহাদেব দেখুক। তার ধামসা আবার গলায় ঝুলিয়ে দ্রিম দ্রিম বাজনা শুরু করে দিতেই নাচ শুরু হয়ে গেল। হেলেদুলে নাচছে। কা কা করছে কেউ। কেচর মেচর করছে কেউ। যেন দৈত্যটা একদল প্রকৃতির জীব নিয়ে রাস্তায় উঠে যাবে।

তখন রাত হয়ে গেছে। চনমনে জ্যোৎস্না। মহাদেব এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, 'কর্তা ব্যাটা ভেগেছে। এত করে বললাম বদমাশটাকে আশকারা দেবেন না, এখন কী হবে!'

বুমবাইর বাবা, বড়দা, ছোড়দা, পিসি, জেঠি, কাকিরা কান্নাকাটি শুরু করে দেবে আর কি!

মহাদেব বলল, 'আমি থানায় যাচ্ছি। ব্যাটার মোগা নাচ বের করছি। ব্যাটা পারে না হেন কাজ নেই। তুকতাক জানে। নাহলে কখনো হয়, বনবিড়াল, নিশাচর জীব এখন বিন্দার বাড়ি পাহারা দেয়। গিয়ে দেখলাম কেউ নেই। হনুমান দুটোও নেই। বেজিটাও নেই। গোলার মধ্যে কাঠের বাক্স দুটো ছিল, তাও নেই।'

কর্তা কী বলবে বুঝতে পারছেন না। কোথায় গেল! বিন্দা কী একটা আলাদা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখত! বাপপিতামহের ঐতিহ্য রক্ষায় সে কি ওদের নিয়ে দূরের পাহাড়ে চলে যেতে চায়। বুমবাইর জেঠু শুধু বলল, 'বিন্দা কোনো খারাপ কাজ করতে পারে বিশ্বাস হয় না। সে শিশুদের ভালোবাসে। শিশুদের সে কোনো অনিষ্ট করতে পারে না।'

মহাদেব খেঁকিয়ে উঠল, 'আপনার ওই এককথা। ও পারে না হেন কাজ নেই। ব্যাটা ডাকিনীবিদ্যা যোগিনীবিদ্যা সব জানে। নাহলে একটা বনবেড়াল বাড়ি পাহারা দেয়। কে কবে এমন অনাসৃষ্টি কারবার দেখেছে।'

কর্তা বললেন, 'ওটা তো বন থেকে সে কুড়িয়ে এনেছে। বাচ্চা ছিল। ওর কাছে থাকতে থাকতে পোষ মেনে গেছে।'

কিন্তু যা হয়, মহাদেব কারও কথা শোনার পাত্র নয়। ছেলেরা উচাটনে আছে। কিছু বলতেও পারছেন না। খুঁজতে যেতে হয়। বাড়ির সবাই বের হয়ে পড়ল। শ্যালোর ঘর থেকে হরমোহনও উঠে এল। ওরা রাস্তায় নেমে কিছুদূর যেতেই শুনল, দ্রিম দ্রিম বাদ্য বাজছে। শব্দটা এদিকেই এগিয়ে আসছে।

বুমবাইর বড়দা ছুটে এসে বলল, 'বাবা, শোনা যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আমিও শুনতে পাচ্ছি। তোরা এত উতলা হস না। ওর কাগা নেত্য বগা নেত্য সবাইকে দেখাতে না পারলে জীবনে তার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। যে যেমন ভাবে বাঁচতে চায়। মহাদেবটা কেন যে থানায় গেল!'

এদিকেই আসছে।

দূরে খালের ধারে ওদের দেখা গেল। ধামসা বাজাচ্ছে বিন্দা। কাক-বকের ডাক। আজব পোশাক পরে বিন্দা সবাইকে নিয়ে সং বের করেছে।

বুমবাইর জেঠু ইজিচেয়ার থেকে উঠলেন। সামনের উঠোনে বেতের চেয়ার পড়ে আছে সব। তিনি তার পুত্রকে ডেকে বললেন, 'ওগুলো তুলে ফেল। বিন্দা আসছে।'

বুমবাইর এক পিসি এসে খবর দিল, 'দাদা শিগগির এসো। কী কাণ্ড! গা থেকে একটা লোকের আগুন বের হচ্ছে।'

বুমবাইর জেঠু সব জানে। বিন্দা আঠা দিয়ে গায়ে জোনাকি পোকা আটকে দেয়। তারাই জ্বলে। তিনি বললেন, 'জ্বলতে দে। ওরা সব সঙ্গে আছে তো?'

'সবাই আছে। অপু কাক সেজেছে। বাবলু বক!'

'তোরা বোস বারান্দায়। দেখ কী মজা!'

রাস্তায় কিচিরমিচির শব্দ। উঠোনের আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। বিন্দা এসেই হুপ করে লাফিয়ে পড়ল। আর হেলেদুলে নাচতে থাকল। চারপাশের কাক বক ময়না, বোঝার উপায় নেই কে কী সেজেছে! তবে অরুকে চেনা যায়।

সে ছুটে এসেই জেঠুর কোলে উঠে বসে পড়ল।

বুমবাই ইগল পাখি। সে লাফাতে লাফাতে এসে ইগ ইগ করতে থাকল। ইগল পাখি, কথা বলবে কী করে! অরু, জেঠুর কোলে উঠে বসে থাকলে চলবে কেন। সং সেজে সবাই নাচছে। বুমবাই খেপে গেছে অরুর আচরণে!

জেঠু বলল, 'বিন্দা রাগ করবে। যা।'

বিন্দার জন্য ভারি কষ্ট হয় বুমবাইর জেঠুর। সংসারে তার কেউ নেই। ছিল ছোট্ট একটা মেয়ে, সেও মরে গেল। সে এখন এসব নিয়েই থাকে। এটাই তার জীবন। কোন দেশের মানুষ বিন্দা, কোথায় এসে নিজের সেই শৈশবকে ভুলতে পারেনি। কর্তার বাড়িতে এত ছেলেপুলে-বড়ো শখ তার শৈশবের মতো সং সেজে কাগা-বগার নেত্য দেখায়। কিন্তু মহাদেবটা যে কেন থানয় গেল!

বিন্দা পাগলের মতো ধামসা বাজাচ্ছে আর নাচছে। নাচছে কোমর বাঁকিয়ে। হেলেদুলে, এক-পা পেছনে রেখে, সামনে এক-পা, ঘুঙুর বাজছে পায়ে। আশ্চর্য এক জীবনের ছবি, ছন্দ তাল অতীব কৌতূহল সৃষ্টি করে। এমন একটা নির্জন পৃথিবীতে মানুষের জন্য হরেক মজার দরকার। বিন্দা এই মুল্লুকের এমনি এক মজা। রাতে কোন বাড়িতে কখন যে সে উঠে যায় একা, এবং নাচতে থাকে, ইদানিং পয়সা নেয় না, ভিক্ষা নেয় না-সে নাচতে পারলেই খুশি!

বুমবাইর জেঠুর মনে হয় আসলে বিন্দা প্রকৃতির বনজঙ্গলের মতোই সজীব শিল্পী। মাথায় এক-একদিন এক-একরকমের পালা গজায়। আজ সীতাহরণের পালা সে শুরু করেছে, নাচের মুদ্রায় প্রকাশ পাচ্ছিল। শেষে জটায়ু বধ। এবং এ সময়েই কে বলল, 'মহাদেব দাদু ফিরেছে। থানা থেকে পুলিশ আসছে।'

পুলিশের কথা শুনতেই বিন্দার নাচ থেমে গেল। মুখ থেকে খুলে পড়ল মুখোশ। আলখাল্লা খুলে ফেলল। গলা থেকে ধামসা নামিয়ে একেবারে হালকা হয়ে গেল- তারপর সে সব ফেলে জ্যোৎস্নায় নির্জন মাঠের মধ্যে এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পুলিশকে যমের মতো ভয় পায় বিন্দা।

বিন্দা সেই যে গেল আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

বিন্দার খোঁজে জেঠুর ক-দিন নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তাকে আর সত্যি খুঁজে পাওয়া গেল না।

জেঠুর মনমেজাজ খারাপ। বুমবাইর মনে হল জেঠুর জীবনের সঙ্গে বিন্দেশ্বরের কোথায় যেন মিল আছে। এক জীবনে মানুষের সব থাকে। আর এক জীবনে মানুষ সব হারায়। জেঠুর এখন হারাবার পালা।

জেঠু বিন্দেশ্বরের সব মুখোশ ঘরে তুলে দেয়ালে সাজিয়ে রাখল। এক-একটা মুখোশ এক একরকমের। কত যত্ন নিয়ে বিন্দা নিজের জীবনের কথা ভুলে শোলার মণ্ড দিয়ে মুখোশগুলো তৈরি করেছে। এই মুখোশগুলোই ছিল বিন্দার শেষ জীবনের সম্বল। মুখোশের রং আশ্চর্য সজীব। পাতার রস, ফুলের রস মধুতে ভিজিয়ে সে রং বানাত। নীল সবুজ হলুদ লাল, যেখানে যে রং দরকার বিন্দা মুখোশে লাগিয়েছে। কাকের, বকের, দৈত্যের মুখোশ সব।

এক সকালে বুমবাই দেখল জেঠু ময়না পাখির মুখোশের দিকে অপলক তাকিয়ে কাঁদছে। জেঠুকে সে কখনো কাঁদতে দেখেনি। মুখোশটা পরে অরু উঠোনে দুরন্ত নেচেছে। আজই বড়দা, অরু, বউদি চলে যাবে সে টের পেল। গাড়িতে সব তোলা হচ্ছে। অরুকে নিমেষের জন্য জেঠু চোখের আড়ালে যেতে দিচ্ছেন না। দিদিভাই দিদিভাই বলে কেবল পাগলের মতো আদর করছেন। মুখোশটা এখন স্মৃতি হয়ে জেঠুর দেয়ালে শুধু শোভা পাবে।

বুমবাইরও মন খারাপ। আর কেউ তাকে কোনোদিন যেন আংকল বলে ডাকবে না। মাঠে, গাছের ছায়ায়, পুকুরের পাড়ে আর কোনোদিন সে অরুকে নিয়ে ছোটাছুটি করতে পারবে না। লুকোচুরি খেলতে পারবে না। গাড়িটা চলে যাবার সময় অরু হাত নাড়ল। বুমবাই হাত নাড়ল। গাড়িটা যতক্ষণ দেখা গেল বুমবাই জেঠুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। তার আজ কেন এত কান্না পাচ্ছে বুঝতে পারল না। বুমবাই গাছতলায় দাঁড়িয়ে আজ

প্রথম এক আশ্চর্য কষ্ট অনুভব করল অরুর জন্য। সেও গোপনে আজ জেঠুর মতো সারাক্ষণ কেঁদেছে। অরু বলেছে তাকে চিঠি লিখবে বাংলাতে। সুন্দর চিঠি। অরু আর সোন্দর বলে না।

যাবার দিন বুমবাইও জেঠুকে প্রণাম করতে গিয়ে ভ্যাক করে কেঁদে দিল। এখন থেকে জেঠু আবার একা। জেঠু তাঁর আজব দেশে বেঁচে থাকবেন নিজের মতো। পাশে নিজের কেউ থাকবে না। অরুর জন্য তার এখন আর-এক কষ্ট। এটা যে কী কষ্ট নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না। গাড়ির জানলায় বসে সে শুধু শুনতে পাচ্ছে ঝিকঝিক ঝমঝম-রেলগাড়ি দুরন্ত বেগে ছুটছে। তার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। কার জন্য! জেঠু, বিন্দা না অরু ঠিক বুঝতে পারছে না।